দার্শনিক শূন্যবাদ

ও

বাংলা সাহিত্য

ডঃ রামেশ্বর পাল, এম্. এ., পি-এইচ. ডি., সাংখ্যতীর্থ,
"ব্রহ্মবিদ্যা" রচয়িতা।

ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড,
কলিকাতা :: ১৯৭৬

প্রকাশক :
ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড,
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬

মুদ্রক :
শ্রীমানস কুমার চ্যাটার্জী
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স
৭এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-১২

জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺যজ্ঞেশ্বর পাল বি. এ., কাব্যরত্নাকর

স্মরণে

সূচীপত্র

১ম পরিচ্ছেদ ১—৪৩ পৃষ্ঠা

বেদ ও তন্ত্র—১, বৌদ্ধতন্ত্র—৩, উপনিষৎ—৪, বুদ্ধদেব ও পালি-ভাষা—৫, বৌদ্ধ, ন্যায় ও পাতঞ্জল—৬, বোধিসত্ত্ব ও দশভূমি—৭, হীনযান ও মহাযান—৯, সাংখ্যদর্শন—১০, পাতঞ্জল—১১, ন্যায়—১২, নাগার্জুন—১৩, শূন্যমূর্তি দেবদেবীর সৃষ্টি—১৪ বৌদ্ধমতবাদ—১৫, শূন্যতার সংজ্ঞা—১৬, চারিটি বৌদ্ধমত—১৮, নাগার্জুনের বৈশিষ্ট্য—২০, পাতঞ্জল দর্শনে চারিটি শূন্যস্তর—২৭, ষড়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা —৩১, শূন্য হইতে সৃষ্টি—৩৫, প্রতীত্যসমুৎপাদ—৩৬, শূন্যতা ও ও করুণা—৩৬, দেবযান ও পিতৃযান—৩৮, বুদ্ধমূর্ত্তিপূজা—৩৮, কায়সাধনা—৩৯, ষট্চক্র—৪১, বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ—৪১, শূন্যতার স্বরূপ—৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪৪—১২৮

চর্যাপদ

সাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব—৪৪, চর্যার উৎস সাংখ্য—৪৪, আদি গণসাহিত্য —৪৫, দেহকে বৃক্ষকল্পনা—৪৬, সাঙ্খমতই সাংখ্যমত এবং চাটিলই কপিল—৫৪, চর্যাপদে অষ্টাঙ্গযোগ : যম—৬১, নিয়ম—৬২, আসন ৬৩, প্রাণায়াম—৬৪, প্রত্যাহার—৭১, ধারণা (শূন্যতা)—৭৫, ধ্যান (অতিশূন্যতা)—৮৪, সমাধি (মহাশূন্যতা)—১০০, সর্বশূন্যতা—১০৯, পুরুষ ও প্রকৃতি—১২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১২৯—১৩৪

দোঁহাকোষ ও প্রকীর্ণ কবিতা

দোঁহাকোষ—১২৯, প্রকীর্ণ কবিতা—১৩১, হিন্দি পরিচয়ে দাদুর বাংলা কবিতাতে শূন্যবাদ—১৩২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৩৫—১৫৪

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বাউল গান ও বৈষ্ণব সাহিত্য

কৃষ্ণের বাঁশী ও জীবদেহে ষট্‌চক্রে—১৩৫, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বাউল সাধনা—১৩৮, পঞ্চবানের দ্বারা কৃষ্ণ কর্তৃক আহতা রাধা বা প্রকৃতি—১৩৯, ষট্‌চক্রভেদে সহস্রার বা শূন্যত্ব—১৪৫, বাউলগানে শৃঙ্গার সাধনা—১৪৭, চৈতন্য ও বৈষ্ণবদের পরকীয়া সাধনা—১৪৮, সুফীদের পঞ্চস্তর—১৪৯, বৈষ্ণবপদাবলীতে শূন্যত্ববোধ—১৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৫৫—১৭৫

শূন্যপুরাণ ও নাথ সাহিত্য

শূন্য হইতে সৃষ্টি—১৫৫, শূন্য প্রভু ও উল্লুক কর্তৃক সৃষ্টি পত্তন—১৫৬, আদ্যাশক্তির গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম—১৬০, পঞ্চমবেদ—১৬০, নাথ সাহিত্যে শূন্যত্ববোধ—১৬৫, অষ্টাঙ্গযোগের বিবরণ—১৬৬, ছিন্নশক্রনামে পরিচিত নাথযোগিগণ কর্তৃক যোগ-সাধনার অভিনব নূতন অবদান : গ্রন্থিভেদ—১৬৭, নাড়ীভেদ—১৬৯, বায়ুভেদ—১৬৯, নিজকীয়া সাধনা—১৭১, নবচক্রভেদে শূন্যতাপ্রাপ্তি—১৭৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৭৬—১৯১

মঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল—১৭৬, ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা—১৭৮, শিবমঙ্গল—১৭৯, চণ্ডীমঙ্গল—১৮১, পদ্মাপুরাণ—১৮৬, মনসাদেবীর শাস্ত্রীয় পরিচয়— ৮৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৯২—২০৫

ধর্মীয় সাহিত্য

শূন্যত্ব সমর্থনে বামাখ্যাপা—১৯৩, কমলাকান্ত—১৯৫, রামপ্রসাদ—১৯৯, রামমোহন—২০৩, রামঠাকুর—২০৩, রামকৃষ্ণ—২০৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ ২০৬—২৩৪

আধুনিক সাহিত্য

ঈশ্বর গুপ্ত—২০৬, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—২০৭, বঙ্কিমচন্দ্র—২১০, শরৎচন্দ্র—২১১, রবীন্দ্রনাথ—২১৪, বিভূতিভূষণ—২১৬, বিহারীলাল—২১৮, রবীন্দ্রকাব্য—২২১, মোহিতলাল—২৩০, অবধূত—২৩২ উপসংহার—২৩৩

দার্শনিক শূন্যবাদ ও বাংলাসাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

শূন্যতত্ত্ব

বেদ ও তন্ত্র

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার প্রচলন দেখা যায়—একটি বৈদিকধারা এবং অপরটি তান্ত্রিকধারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধারা ও অব্রাহ্মণ্য ধারা—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকীচ (মনু সংহিতার কুল্লুকভট্টের টীকা—২।১)। বৈদিকী সভ্যতার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে এবং অথর্বাঙ্গিরস এর (পরবর্তী যুগে কথিত 'অথর্ববেদ') ভিতরে তান্ত্রিকী সভ্যতার আদিরূপ বিরাজিত বলিয়া মনে হয়। "বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত তান্ত্রিকতার কোন মূলগত সম্বন্ধের পরিচয় নাই, এতদ্ব্যতীত নরবলি অথবা পশু বলিও তান্ত্রিকতার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। যদিও তান্ত্রিকতা মূলে নিম্নস্তরের নানারূপ মন্ত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের পক্ষপাতী, তথাপি উহা ক্রমে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল।"[১]

বৈদিক যুগে আর্য্যঋষিগণ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ভিতরেই এমন একটি শক্তির সন্ধান পাইলেন, যাহার ভিতরে আছে একাধারে রূপ ও অরূপ, ভাব ও অভাব, উৎপত্তি ও নিরোধ, প্রজ্বলন ও নির্বাণ ইত্যাদি। এই শক্তিটির পরিচয় অগ্নিদেবতা, প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর ভিতরেই এই শক্তি তেজোরূপে নিহিত রহিয়াছে এবং ইহাই বিশ্বের মূলীভূত শক্তি—ইহাই ছিল আর্যদের ধারণা। সুতরাং সমস্ত দেবতার সঙ্গে এই অগ্নিদেবতার সংযোগ আছে বলিয়া সমস্ত দেবতার নিকটে আহূত যাগযজ্ঞের দ্রব্যাদি এই অগ্নিই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন এবং সমস্ত দেবতাদের এই অগ্নিই আহ্বান করিতে পারেন। বৈদিক যুগের এই অগ্নিদেবতা বিভিন্নরূপের মধ্য দিয়া উপনিষদের যুগে আর্য

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—তমোনাশ দাশগুপ্ত—পৃ ১৬

ঋষিগণ কর্তৃক শূন্যময়ী প্রকৃতি বা নৈরাত্মাদেবীরূপে অনুভূত হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী যুগে এই ভাবধারা তান্ত্রিকাদি ধর্মের ভিতরে প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শূন্যতার একটি আদি ভাবধারার অনুভূতির পরিচয় আমরা ঋক্‌বেদে পাইয়া থাকি—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ॥
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ।" (১।১২৯।১০)

অর্থাৎ সৎ বা অসৎ বলিয়া কোনও বস্তুর সংজ্ঞা বা অস্তিত্ব আদিতে ছিল না, সৃষ্টি বা সৃষ্টির আধার ছিল না। অস্তিত্ববিহীন গভীর অন্ধকারের কোন আবরণ ছিল না।

সায়নাচার্য তাঁহার বেদের ভাষ্যে অগ্নি শব্দদ্বারা শুধু অগ্নিনামক দেবতাকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু উপনিষদের যুগে এই অগ্নির সপ্তপ্রকার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি। (মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৪)

তন্ত্রশাস্ত্রের উপাস্যা দেবীরূপে পরবর্তী যুগে এই অগ্নিরই কালীরূপ চণ্ডী বা হৈমবতী কিভাবে দৈত্যবিজয়ের পরে দেবগণ কর্তৃক অনুভূত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ 'কেনোপনিষৎ' (৪।১) এ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই নৈরাত্মা শক্তি, শূন্যময়ী প্রকৃতি।

হিন্দুদের তন্ত্র ও বিবিধ যোগশাস্ত্রের ভিতরে যে সকল শক্তি-সাধনার রীতিনীতি দেখিতে পাই, তাহাতে একটি কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই—এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সাধককে মহাশক্তির সাধনায় রত হইতে হয়। "এই শক্তি সর্বনিম্নচক্র বা পদ্ম —মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিনী হইয়া নিদ্রিতা আছে, সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা, দেবী মূলাধারে জাগ্রতা হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত সাধকের কোন স্পন্দনই নাই —দেবীর বা শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় তাঁহার ঊর্ধ্বগতি —এক একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি ঊর্ধ্বে উত্থিত হন—

।র্বোচ্চ স্থানে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমাস্থিতি। শক্তির এক একটি ক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন আনন্দানুভূতির সন্ধান লাভ হইয়া থাকে। এই আনন্দানুভূতির স্পন্দন চরম বিশুদ্ধি এবং পরম পূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চ স্থানে শক্তির স্থিতির সহিত, এই কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির অধ্যাত্মে প্রবেশের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে যাগতন্ত্রাদিতে দেখিতে পাই এই শক্তির উত্থান ও গতি বিচিত্র স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।" ১

বৌদ্ধতন্ত্র

বৌদ্ধতন্ত্রাদিতেও দেখা যায় নাভিদেশে অবস্থিত 'নির্মাণ চক্র' নামক স্থানে সাধকের প্রথমে শক্তির অনুভূতি আসে, তারপর হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্র' ও কণ্ঠে অবস্থিত 'সম্ভোগ চক্র' সাধনা বলে অতিক্রম করিয়া মস্তকে অবস্থিত 'উষ্ণীষকমলে' পৌঁছিয়া মহাসুখ বা 'সহজানন্দরূপ' নিত্যস্বভাব শূন্যতা প্রাপ্ত হন।" "এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধসহজিয়া তথা বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের দেবী, এই জন্যই তিনি সর্বদাই সহজস্বরূপা বা সহজরূপিনী। এই সহজানন্দের মধ্যে শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাত্মরূপিণী বা আদরিনী নৈরামণি॥"২

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুইটি শ্রুতির ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া পরবর্তীকালে যে ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহাই পৌরাণিক ধর্ম (আধুনিক হিন্দুধর্ম)। বৌদ্ধ সমাজের ভিতর ধর্মনৈতিক মতভেদে হীনযানী ও মহাযানী নামে দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিতরে বৈদিক ও পৌরাণিক—এই দুই আদর্শে অনুপ্রাণিত দুইটি দায়ের সৃষ্টি হইল। পরে দেখা যায় যে, এই সকল ধর্মের ভিতরে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে সমন্বয় সাধিত হয়,

১—২ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শশীভূষণ দাশগুপ্ত—৪র্থ অধ্যায়

তাহারই রূপ হিন্দুধর্ম। বৈদিক. তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের ফলেই সর্বপ্রথম নানাবিধ মতকে অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই পথেই বাংলা সাহিত্যের আদি সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। এই সকল সাহিত্যে শূন্যবাদকে বজায় রাখা হইয়াছিল এবং 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ও 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' —এই দুইটি রচনাই বাংলা ভাষাতে লিখিত আদি কবিতা হিসাবে সবজনসম্মত রূপে গৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গান। চর্যাপদের কতকগুলি গানে সহজযানী বৌদ্ধমত এবং কতকগুলির ভিতরে মহাযানী বৌদ্ধমতের প্রত্যক্ষ আলোচনা রহিয়াছে—ইহা অনেকের মত। একজন মাত্র কেহ চর্যাপদগুলি রচনা করেন নাই, রচয়িতা তেইশজন সিদ্ধাচার্যের সকলেই বৌদ্ধ হইলেও বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখাপ্রশাখা, নানামত ও বিবিধ যানের সাধক ছিলেন। কোন কোন চর্যাপদে হীনযান, মহাযান, সহজযান, বজ্রযান ইত্যাদির পরিচয় আছে, আবার সহজিয়া ও তান্ত্রিকমতের সঙ্গে বিভিন্ন যৌগিক সাধনার কথাও চর্যাপদে রহিয়াছে।

উপনিষৎ

বৌদ্ধ নাথসম্প্রদায় প্রভৃতির ভিতরে যেমন শূন্যবাদের সাধনা প্রচলিত তদ্রূপ উপনিষৎ, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রে ও শূন্যবাদ প্রচলিত দেখা যায়। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্'এ বলা হইয়াছে "ওঁ খং ব্রহ্ম" (৫।১।) অর্থাৎ ওঁ ধ্বনি যুক্ত আকাশই ব্রহ্ম কথাটির সংজ্ঞা। "ছান্দোগ্যোপনিষদে"ও এই শূন্যতত্ত্বের বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়— "অস্য লোকস্য কা গতিঃ। ইতি। আকাশ ইতি হোবাচ। সর্বাণি হ ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।" (১।৯) অর্থাৎ আকাশ হইতেই সৃষ্টির গতি, সমস্ত সৃষ্টি আকাশ হইতেই হয় এবং আকাশেই সমস্ত সৃষ্টি বিলীন হইয়া যায়। শূন্যতা হইল নেতি বাচক প্রজ্ঞা

এবং করুণা হইল ইতিবাচক উপায় বা কুশল প্রেরণা। এই শূন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইল, আর তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিচিত্তের সাধনা, বোধিচিত্তের সংজ্ঞা হইল "শূন্যতাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে।" শূন্য ও করুণার অভিন্নতাই হইল বোধিচিত্ত, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত ও শূন্যকরুণাকে নানাভাবে বহু দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। বোধিচিত্তরত তত্ত্বই হইল তন্ত্রের যুগল বা যামলতন্ত্র—ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুন তত্ত্ব, শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী, উপায় নিখিলাত্মক ভগবান। এই ভগবানভগবতী সামরস্যরূপমিথুনতত্ত্বই হইল অদ্বয়বোধিচিত্ততত্ত্ব, প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি লক্ষণা, শূন্যতাই পরম সংহতি, শূন্যতাই বিন্দু, কর্মচোদনারূপে উপায় প্রবৃত্তি লক্ষণ, উপায় পরম প্রকাশ, উপায়ই নাদ তত্ত্ব

বুদ্ধদেব ও পালিভাষা

সাধারণতঃ শূন্যবাদকে নাস্তিকবাদের সঙ্গে একীভূত করিয়া তথাগত ভগবান বুদ্ধকে নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবকে আবার বিষ্ণুর অবতার বলিয়াও পূজা করা হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন কি নাই, ইহা লইয়া বুদ্ধদেব কোন বিচারই করেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব ও নিরুৎসাহী। পরে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম লইয়া নানাবিধ বিচারের সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়াই তিনি প্রচলিত পালিভাষাতেই জনসাধারণের বোধগম্য ধর্মোপদেশ দিতেন এবং সংস্কৃত ভাষাতে অনুবাদ যাহাতে না হয়, তিনি তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন—

'ন ভিকৃখবে বুদ্ধবচনং ভাষয়া আরোপেতব্বং"।

কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণ 'বুদ্ধমূর্তিপূজাবিহীন'

১— ভারতে শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ৪র্থ অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্মকে হীনযান আখ্যাপ্রদান করিলেন—বুদ্ধবচনও সংস্কৃতে অনুদিত হইল—"কারণ যা ভগবান বুদ্ধকে দেবতা বলিয়া পূজা করতে শিখালনা, তা হীনযান বৈ কি। তা নিশ্চিত নিকৃষ্ট মার্গ। আর যে নূতন ধর্ম সৃষ্টি করল সোজাসুজি তাঁকে দেবতা বলে পূজা করতে, তার নাম তাই মহাযান।"১

বৌদ্ধ, ন্যায় ও পাতঞ্জল

বৌদ্ধধর্ম আচরণের ধর্ম—ভক্তির ধর্ম নহে। ব্যক্তিগত সাধনা-ব্যতীত কাহারও মুক্তি হইতে পারেনা এবং মুক্তির জন্য নির্বাণের মধ্যপথ (অর্থাৎ কামসুখেও মত্ত হইবে না—আবার অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধনও করিবে না) অবলম্বন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চারিটি আর্যসত্য গ্রহণ করিতে হইবে—যথা দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। ভারতীয় সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ন্যায়দর্শনও এই বাণীই প্রচার করিয়াছে। সাংখ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, আসুরিনামক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নামক তিনপ্রকার দুঃখদূরীকরণের দৃষ্ট উপায় যাগযজ্ঞাদির সাহায্যে চূড়ান্তভাবে ও চিরকালের জন্য বিফল দেখিয়া সাংখ্যতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।

দৃষ্টে সাহপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ।"১ (সাংখ্যকারিকা)

পাতঞ্জলদর্শনের সমাধিপাদেও এই তত্ত্বই পরিবেশিত হইয়াছে, অনাগত দুঃখকে দূর করিতে হইবে, চিদ্রূপ পুরুষ ও বুদ্ধিরূপা প্রকৃতির পরস্পর পার্থক্যানুভবে অসমর্থ হওয়াই অবিদ্যা বা দুঃখের হেতু—বুদ্ধিবলে যখন পুরুষ নিজের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে, তখনই অবিদ্যা দূর হয়, দুঃখের অবসান হয়, এইরূপে যথার্থ জ্ঞানলাভ বা বিবেকই দুঃখ দূরীকরণের উপায়—মুক্তির পথ—"হেয়ং দুঃখমনাগতম্—১৬, "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ"—১৭, "তদাভাবাৎ

১— নালন্দা পত্রিকা - ৩য় সংখ্যা—১৩৭৩—হে অনন্ত পুণ্য।

সংযোগাভাবো হানং তদ্‌দৃশেঃ কৈবল্যম্‌”—২৫, বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ—২৬।

ন্যায়দর্শনের মতেও অধর্মই দুঃখের হেতু—দুঃখবোধই মানুষের স্বাভাবিক রীতি এবং দুঃখই সাধারণ দ্বেষের বিষয়—“অধর্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাম্‌—১৪৫ (ভাষা পরিচ্ছেদ—শব্দখণ্ডম্‌)

বোধিসত্ত্ব ও দশভূমি

বৌদ্ধধর্মে তিন প্রকার সাধনার প্রচলন আছে—(ক) শ্রাবক—অর্হৎগণের উপদেশ অনুসারে আর্যসত্যের পালন ও ক্লেশ বিমুক্তি (খ) বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বোধিচিত্তলাভ (attainment of enlightenment) এবং (গ) বুদ্ধ—শূন্যতা প্রাপ্তি। এই শূন্যতাপ্রাপ্ত অবস্থা লাভের জন্য বোধিসত্ত্ব সাধককে ও বোধিসত্ত্বভূমিকথিত দশটি ভূমি বা স্তরের মধ্য দিয়া চিত্তকে উর্ধ্বদিকে প্রসারিত করিতে হইবে—

১। প্রমুদিতা—বোধিচিত্তে আনন্দ প্রাপ্তি।

২। বিমলা—বোধিচিত্তের নির্মল ক্লেশবিমুক্তি অবস্থা।

৩। প্রভাকরী—(প্রজ্বলিত অবস্থা) বোধিসত্ত্বের সম্যক্‌ দৃষ্টি-লাভে ধর্মের স্বরূপ অবগতির সহিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ।

৪। অচিষ্মতা—(শিখাময়) বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞারূপ অগ্নির দ্বারা অবিদ্যা বা তৃষ্ণাকে ভস্মীভূত করেন এবং ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম ভাবনায় অনুপ্রাণিত হন।

৫। সুদুর্জয়া—বোধিসত্ত্বের নিকট সমস্ত আসক্তি বা প্রলোভন-রূপ শত্রুর পরাভব।

৬। অভিমুখী—বোধিসত্ত্ব এই ভূমিতে প্রজ্ঞা বা সর্বোচ্চ জ্ঞানের সম্মুখীন হন।

৭। দুরঙ্গম—এই ভূমিতে বোধিসত্ত্ব নির্বাণ লাভের পথপ্রদর্শক হিসাবে যুক্তিসঙ্গত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার ভিতরে

শূন্যতা, অদ্বৈতভাব ও তৃষ্ণামুক্তির সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও জীবের প্রতি অপার করুণা তাঁহাকে সর্বভূতের হিত সাধনে নিযুক্ত করে।

৮। অচলা—স্থিতিলাভ অর্থাৎ পতনের ভয় নাই।

৯। সাধুমতী বা সদিচ্ছা—এই ভূমিতে বোধিসত্ত্বগণ ধর্ম ও ও চরম সত্যবিষয়ক অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন।

১০। ধর্মমেঘ—এই ভূমিতে বোধিসত্ত্ব সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সমস্ত সত্ত্বগণের জন্য মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাভাব লাভ করিয়া বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন—ইহাই শূন্যত্বপ্রাপ্তি।

বোধিসত্ত্বের অন্তরে বোধিচিত্তের উৎপত্তির পরে বোধিসত্ত্বের ঊর্ধ্বগতিকে দেখিতে পাই, যাহা শূন্যতা ও করুণারূপে রূপান্তরিত অবস্থায় ছিল—সেই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মূলাধারচক্রে মিলনের ভিতর দিয়া বোধিচিত্তের ঊর্ধ্বগতি যৌনযোগাভ্যাসের (Sex-yogic process) পথে চলিতে থাকিবে। বোধিচিত্ত চরম স্থিতিতে পৌঁছিবার পর উষ্ণীষকমলে অবস্থিত মহাসুখ (পরমানন্দ) লাভ করেন। এই পরম আনন্দ লাভেই বোধিসত্ত্ব বুদ্ধরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হন।

এই শূন্যময় বৌদ্ধনির্বাণকে দীপনির্বাণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। নির্বাপিত প্রদীপ যেমন কোন পার্থিব বস্তুর ভিতরে, অন্তরীক্ষ-স্তলে অথবা দিগ্‌বিদিকে কোথাও আর তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না—প্রজ্বলনের সহায় স্নেহদ্রব্যের অভাবে জ্বলন্ত অগ্নি যেমন শূন্যতার কোলে শান্তিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কৃতীপুরুষও নিবৃত্তি লাভের পরে পৃথিবীর কোথাও অন্তরীক্ষে বা কোন দিগ্‌বিদিকে অবস্থান না করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া শান্তি লাভ করেন—

"দীপো যথা নিবৃত্তিমভ্যুপেতো নৈরামণিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমিব শান্তিম॥
কৃতীতথা নিবৃত্তিমভ্যুপেতো নৈরামণিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্॥
দিশং ন কাঞ্চিদ্বি দিশং ন কাঞ্চিৎ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি কাঞ্চিৎ ॥[১]

১। অশ্বঘোষ প্রণীত সৌন্দরানন্দ'—১৬।২৮।২৯

পরবর্তী যুগে নাগার্জুনপ্রবর্তিত শূন্যবাদ ইহাকে অবলম্বন করিয়া যে শূন্যত্বের সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, তাহা সৎ ও নহে আবার অসৎও নহে, উহা সৎ বা অসৎকে অতিক্রম করে নাই। উভয়ের মধ্যেই শূন্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই যে শূন্যতার বর্ণনা, তাহা সারবস্তু অর্থাৎ পরমার্থ সত্য; অদাহী, অবিনাশী, অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য শূন্যতাকে বজ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—

"ন সন্ আসন্ নাসদাসন্ ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্, চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং
তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ ॥
দৃঢ়ং সারমসৌশীর্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণং অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা
বজ্রমুচ্যতে ॥"১

হীনযান ও মহাযান

হীনযান সম্প্রদায় শূন্যত্বের সাধারণ সংজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মতে জগৎসত্তাশূন্য এবং সত্তার সঙ্গে যুক্ত বস্তুমাত্রই শূন্য— ইহাই শূন্যত্ব, অন্য কথায় জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী বা ব্যক্তিগত নয়, তাই জগৎ সত্তাহীন। মহাযান সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া মাধ্যমিকগণ এখানে স্থগিত রহিলেন না। তাঁহারা শূন্যতার ধারণাকে চূড়ান্তভাবে সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাঁহাদের মতে শুধু উপযুক্ত বস্তুর শূন্যতা নহে—এমন কি তথাকথিত তথাগত, নির্বাণ বা আকাশ পর্যন্ত শূন্যত্ব সংজ্ঞায় পরিগণিত, কোন শান্ত সমাহিত অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের ইন্দ্রিয় সংযোগের পরিণামের ভিতর শূন্যতার সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তিনটি সংজ্ঞার উপলব্ধি সম্ভবপর হইতে পারে—শূন্যতা (নিরবয়তা), অনিমিত্ত (নিশ্চিহ্নতা) ও অপ্রনিহিত (অনির্ণেয়তা)। এইরূপ চিন্তাধারার ভিতর দিয়া বৌদ্ধধর্মঘোষিত শূন্যতাবিচারে দেখা যায় যে, শূন্যতাই

১। অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ :—পৃ ১৯, ২৩

সমস্ত দৃষ্টবস্তুর আদিরূপ এবং সকলের পক্ষেই এই শূন্যতার উপলব্ধির ভিতর দিয়া বুদ্ধত্ব লাভ সম্ভব।

সাংখ্য দর্শন

সাংখ্যদর্শন বলিতে যষ্টিতন্ত্রকে বুঝায় এবং তাহার সঠিকরূপ এখন দেখা যায় না—এই শাস্ত্রে বেদ বা ঈশ্বরের কোন প্রভাব ছিল না। পরবর্তী যুগে ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিত সাংখ্যকারিকায় বেদকে প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, আবার বেদজ্ঞান হইতে সাংখ্য যে শ্রেষ্ঠ তাহাও বলা হইয়াছে—"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ (সাংখ্যকারিকা২) অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে আতিশয্য ও বিনাশ বিদ্যমান থাকাতে উহা শাশ্বত নহে। সুতরাং কোন দৃষ্ট পদার্থের সাহায্যে যেমন একান্ত ও অত্যন্তভাবে দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব নহে, তদ্রূপ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির দ্বারাও সম্ভব নহে, এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কপিল মুনির মতকে মানিয়া লইতে পারে নাই। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনীতে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব দুইজন সাংখ্যমতাবলম্বী গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কাম্য ছিল শুধু সাংখ্যমতে কৈবল্যলাভ। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদকে বুদ্ধদেব মানিয়া না লইয়া ক্ষণিকত্ববাদ গ্রহণপূর্বক শূন্যবাদকে পরিণতি স্বীকার করিলেন।

কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রকৃতি (অব্যক্ত) ত্রয়বিংশতিতত্ত্ব (ব্যক্ত) এবং পুরুষ (জ্ঞ) এর উপরে এবং পুরুষ বা আত্মার বুদ্ধত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকারের ফলে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, ক্রিয়াশক্তিহীন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীলা অচেতনা প্রকৃতির সংযোগে, যেমন পঙ্গু ও অন্ধের একত্রিত কার্যে চলৎ শক্তি সম্ভব হয়, ঠিক সেইরূপ সৃষ্টি কার্য সম্ভব হয়। ভোগ বা সৃষ্টির ভিতর দিয়া যখন পুরুষের যথার্থ জ্ঞান হয় যে, পুরুষপ্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র, তখন

মিলনের পরিবর্তে বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদের ফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি একান্ত ও অত্যন্তভাবে সম্পাদিত হয়, যদিও সাংখ্যের মতে সমস্তই সৎ, সতের বিনাশ নাই, তথাপি উচ্ছেদকে স্বীকার করা হইয়াছে—এই উচ্ছিত্তির ফল অস্তিত্বহীনতা, শূন্যতা—"যদ্বা যদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" (সাংখ্যসূত্র—৬।৪০)। প্রকৃতির আবরণ মুক্ত পুরুষ অস্তিত্বের অভাববোধে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়।

পাতঞ্জল

পাতঞ্জলযোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের মতকেই অবলম্বন করিয়া উহার ভিতরে 'ঈশ্বর' নামক একটি তত্ত্বকে নিহিত করিয়া সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে ষড়বিংশতি তত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্বকে উল্লেখ করিলেও ঈশ্বরকে সেখানে কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই, ঈশ্বরবাচক প্রণব ধ্বনি ওঁকারের জপ বা ধ্যানের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব এ কথাই শুধু বলা হইয়াছে। উপনিষদেও এই মত ঘোষণা করা হইয়াছে—"ওঁমিত্যক্ষরমিদং সর্বতস্যোপাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙকার এব" (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—১) অর্থাৎ ওঁকার নামধেয় অক্ষরটি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইলে দেখা যাইবে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই সমুদয়ই ওঁ। পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বর সংজ্ঞা বেদান্ত কথিত ব্রহ্মকেও বুঝায় না—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" (সমাধিপাদ—৪) অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই তিনকালে যে পুরুষকে স্পর্শ করে না, সেই বিশেষ পুরুষই ঈশ্বর (ত্রিষপি কালেষু ন স্পৃষ্টঃ—ভোজ বৃত্তিঃ)। পাতঞ্জল দর্শনে যে কোন বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যানকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ধ্যানের অবলম্বন একমাত্র ঈশ্বরই নহেন—"যথাভিমতধ্যানাদ্বা" সমাধিপাদঃ—২৯)। সুতরাং দেখা যায় যে, পাতঞ্জল দর্শন অষ্টাঙ্গ

যোগের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং মুক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়া শূন্যত্বকেই সমর্থন করিয়াছে—" পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি (কৈবল্যপাদঃ—৩৩)।

ন্যায়

কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ও গৌতম রচিত ন্যায় দর্শনের মত দুরূহ শাস্ত্র আলোচনা সহজসাধ্য নহে, সুতরাং আমরা শূন্যবাদের সমর্থন সূচক কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিব। প্রথমতঃ বৈশেষিকন্যায় অভাবকেও একটি পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ গৌতম অদৃষ্টকেই সৃষ্টির মূলাধার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন "পূর্বকৃত ফলানুবন্ধাৎ উৎপত্তিঃ" (ন্যায় দর্শন=৩।২।৬৩)। আবার ঈশ্বরকে কারণরূপে স্বীকৃতি দিলেও, স্রষ্টা স্বীকার করা হয় নাই—"ঈশ্বরকারণং পুরুষকর্মাফলদর্শনাৎ" (ন্যায়দর্শন—৪।১।১৯)। বৈশেষিক দর্শনে দেখা যায় যে অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম পদার্থই নিত্য পরমাণু, তাহারই সংযোগে সংসারের উৎপত্তি "অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবিশেষঃ পরিকীর্তিতঃ (ভাষাপরিচ্ছেদে-প্রত্যক্ষ-খণ্ডম্ ১) অর্থাৎ অবসানে যাহা বিদ্যমান তাহাই বিশেষ পদার্থ—উহা কারণ নহে—"পারিমণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্" (ভাষা পরিচ্ছেদে-প্রত্যক্ষখণ্ডম্)।

উপনিষৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদেও সৃষ্টির মূল অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বের অভাব অর্থাৎ শূন্যতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—"সদেব সোম্য। ইদমগ্র আসীদেমদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈকে আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীদেকমদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ১। কুতস্তু খলু সোম্য। এব (ং) স্যাৎ? ইতিহোবাচ কথমসতঃসজ্জায়তেতি। সত্ত্বেব সোম্য। ইদমগ্র আসীদেকমদ্বিতীয়ম্— (৬।২) অর্থাৎ সৎরূপে এবং অদ্বিতীয় রূপে

সৃষ্টির মূল ছিল বটে, কিন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত নহে। কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে সৃষ্টির মূল এক এবং অদ্বিতীয় এবং অসৎ হইতে সৎ এর সৃষ্টি হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল—অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব? উত্তর হইল সত্তাবিশিষ্ট এবং অদ্বিতীয় অসৎ হইতে সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

নাগার্জুন

নাগার্জুনের মতেও শূন্যতা নাস্তিত্ব বা নিহিলিজম্ নহে, অথবা সত্তাহীন অভাব ও নহে, অবশ্য হীনযানদের মতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। শূন্যতাকে প্রতীত্যসমুৎপাদের সঙ্গে মিল রাখিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ হইতে শূন্যতা ভিন্ন নহে—ইহাই মাধ্যমিকদের মত—

"যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদ : শূন্যতাং তাং পেচক্ষমহে"।১

ভাববস্তু এবং অভাববস্তু—এই দুইটি সম্বন্ধে যখন কোন ধারণা থাকে না, তখনই হয় নির্বাণ—

"ভাবাভাবপরামর্শক্ষয়ে নির্বাণম্ উচ্যতে"২

শূন্যবাদ ও বেদান্ত—উভয়ের মধ্যে দেখা যায় দুইটি সাধারণ তত্ত্ব, সংবৃত্তি সত্যের অসারত্ব ও পরমার্থ সত্যের অসারতা (শূন্যবাদ)। "শূন্যবাদ জগৎসংসারের অস্তিত্ব অর্থাৎ সংবৃত্তিসত্যের অসারতা এবং পরমার্থ সত্যের অনির্বচনিয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বেদান্তেও অনুরূপ ভাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যের অসারত্বতুচ্ছত্ব ও পরমার্থ সত্যের অনীর্বচনীয়তা প্রমাণ করা হইয়াছে। শূন্যবাদীদের নির্বাণ পরিকল্পনাও বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে তুলনীয়। বিজ্ঞানবাদীদের সহিত বেদান্তের বস্তুর অসারত্ব ছাড়াও অন্যদিকে সূক্ষ্ম মিল রহিয়াছে।

১। Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to Hinayana—N. Dutt, Page 214

২। Introduction to Tantric Buddhism—S, B, Dasgupta Page 18

বিজ্ঞানবাদীদের 'আলয়বিজ্ঞান' সমস্ত বস্তুজ্ঞানের মূল। আবার অনির্বচনীয়তা স্বরূপে আলয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ। পরমার্থ সত্যই যেমন এক হিসাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়—আলয় বিজ্ঞানও সেইরূপ। শুধু তাহাই নহে—অনেকে সেই আলয়জ্ঞানকে চিৎস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। বসুবন্ধুর বিংশিকা ও ত্রিংশিকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।"১

"দ্বেসত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা।
লোক সংবৃত্তিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতা।"২

শূন্যমূর্তি দেবদেবীর সৃষ্টি

গৌতমবুদ্ধ সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পান নাই এবং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নিয়া আলোচনা হইতে বিরত ছিলেন, ইহাই শূন্যবাদের মূল তাৎপর্য, জিজ্ঞাস্য যে আজ পর্যন্ত কেহ সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পাইয়াছেন কি? বোধহয় কেহ সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভ করিতে আজও সমর্থ হন নাই—হয়ত সাধকগণ নিজ নিজ জ্ঞান ও কল্পনানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, শীতলা, মনসা প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তিকেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীরূপে প্রচার করিয়াছেন।

শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্মের ভিতরে ও এই দেবদেবীকল্পনার ব্যতিক্রম দেখা যায় না—"বজ্রযোগে সাধক স্থিতিনিষ্ঠ হলে, তাঁর ধ্যানচক্ষুতে এক একটি দেবদেবী জন্ম নেন একথা বজ্রযানীরা বিশ্বাস করেন—সে কথা আগেই বলেছি। এই সকল দেবদেবীদের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—হেবজ্র, বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, মহামায়া, বজ্র-যোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, বজ্রধর, বজ্রভৈরব ইত্যাদি।"৩

১। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পৃ ১৩০

২। চর্যাগীতি—সত্যব্রত দে—পৃ ৮৬

৩। চর্যাপদ—অতীন্দ্রনাথ মজুমদার—পৃ ৫৭

ইহার ফলেই ভারতের বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্মের ভিতরেই বিভিন্ন ধর্মীয় নীতি ও নানাপ্রকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের মতবাদ

গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্মদর্শনের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের ভিতরে বিবিধ রকমের মতবিরোধের সৃষ্টি হইল এবং এই সকল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কয়েকবার ধর্ম-সংঘ আহূত হইয়াছিল। এইরূপ প্রচার আছে যে, বৈশালীতে যে ধর্মসংঘ দ্বিতীয়বার আহ্বান করা হইয়াছিল, সেই সভাতে বৌদ্ধদের ভিতরে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একদল প্রতিবাদী নিজেরা 'মহাসাংঘিক' আখ্যাতে ভূষিত হইলেন। ইহার ফলে প্রাচীন থেরবাদী সম্প্রদায় এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের ভিতরে অত্যন্ত মত-বিরোধের সঞ্চার হয় এবং প্রাচীনতম দল 'হীনযান' এবং প্রতিবাদী সম্প্রদায় 'মহাযান' নামে কথিত হয়, মহাযানীদের পরিকল্পনাতে ত্রিকায় সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা হইল—ধর্মকায়, নির্মাণকায়ও সম্ভোগকায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক রচিত 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ' নামক প্রবন্ধে দেখা যায় এই সকল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ফলস্বরূপ নূতন শূন্যত্বের ব্যাখ্যা এবং শূন্য হইতে দেবতা সৃষ্টির বিবরণ—"বৌদ্ধেরা গুরুভজনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে। আবার মহাযানের পরে বৌদ্ধদের যত যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে সকল দেবতা—দেব ও দেবী, আমাদের দেব দেবীদের মত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন। তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। আপনারা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য, তাঁহারা পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। পাঁচটি স্কন্ধ কি কি? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও

বিজ্ঞানস্কন্ধ। এই সকল কল্পিত দেবতাদের আবার প্রত্যেকের একটি করিয়া শক্তি আছে—যথাক্রমে রোচনা, আর্যতাবিকা, পাণ্ডরা, তারা ও মামক্ষী। শুধু তাঁহারা নহে, উক্ত পঞ্চ দেবতার আবার গণেশ, রত্নপানি, পদ্মপানি, বিশ্বপানি ও মহাকালনামধেয় পাঁচজন বোধিসত্ত্ব বর্তমান। এইরূপে যে পনরটি দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই শূন্যমূর্তি এবং এই সকল শূন্যমূর্তি দেবতা হইতেই অসংখ্য দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী অনাদিপ্রবাহ, ইহার আদি বা অন্ত বলিয়া কিছুই নাই।"

শূন্যতার সংজ্ঞা

B. L. Suzuki রচিত Mahayana Buddhism নামক পুস্তকে এই শূন্যের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওযা যায়। শূন্যতাই তথতা এবং তথতাই শূন্যতা। আমাদের চারিদিকে যে সকল বিশেষ বস্তু দৃষ্ট হয়, ঐ সকল বস্তু ও আমরা নিজেরাও শূন্য, শূন্যতার, শূন্যতা হইতে, শূন্যতার সহিত এবং শূন্যতার ভিতরে।

করুণাকে অতিক্রম করিয়া চিত্ত যেখানে প্রকাশিত হয়, তাহাই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ কর্তৃক বর্ণিত শূন্যতার সংজ্ঞা—'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহে' (৪১পৃঃ) কথিত আছে,—"শূন্যতাকরুণা ভিন্নং যত্র চিত্তং প্রভাষ্যতে। সা হি বুদ্ধস্য ধর্মস্য সংঘস্যাপি হি দেশনা॥"

সর্বধর্মের আধার অদ্বয় নির্বাণের মত। যেখানে নির্বাণ নাই—তাহাই সংসার, যেখানে সংসার নাই—তাহাই নির্বাণ, ইহাই বিলক্ষণহেতু সদ্ভাব। ইহার মতে সংসারপারিনির্বাণবৎ সমস্ত ধর্মগুলিই নির্বাণ—অতএব শূন্যতা, অনুৎপাদ, অদ্বয় ও নিঃস্বভাব—এই চারিটি নির্বাণের লক্ষণ।

শূন্যতা শাশ্বতনিত্য, শাশ্বত উচ্ছেদ বর্জিত লক্ষণযুক্ত দেশের সংসার স্বপ্নবৎ—কর্মের বিনাশ হয় না, অস্তিত্বশীল। আকাশ প্রদেশের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব নাই, ইহাই ভুল ধারণা ও অজ্ঞলোকের পরিকল্পনা—এখানে

নির্বাণ ও নিরোধ দুইটিই বর্তমান। এই বিষয়ে 'সদ্ধর্মলঙ্কাবতার সূত্রম্' (পৃঃ ৩২) গ্রন্থে দেখা যায়—"এবং সংসারনির্বাণবৎ মহামতে সর্বধর্মা অদ্বয়াঃ। ন যত্র মহামতে নির্বাণং তত্র সংসারঃ, ন যত্র সংসারস্তত্র নির্বাণম্, বিলক্ষণহেতুসদ্ভাবাৎ, তেনোচ্যতে অদ্বয়াঃ সংসারঃ পরিনির্বাণবৎ সর্বধর্মা ইতি। তস্মাত্তর্হি মহামতে শূন্যতামুৎপাদাদ্বয়নিঃ- স্বভাবলক্ষণে যোগঃ করণীয়ঃ—অথখলুভগবাংস্তস্যাং বেলায়ামিমে গাথামভাষত—

দেশেভিঃ শূন্যতাং নিত্যং শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিতাম্।
সংসারস্বপ্নমায়াখ্যং ন কর্ম বিনশ্যতি॥
আকাশস্য নির্বাণং নিরোধং দ্বয়মপি চ।
বালাঃ কল্পয়ন্ত্যকৃতানার্যা নাস্ত্যস্তিবর্জিতম্॥

'ললিতবিস্তরঃ নামক গ্রন্থে আবার আকাশকে সর্বদা একরূপ বিশিষ্টনির্বিকল্প, প্রভাস্বর ও অনন্তমধ্য ধর্মচক্র বলা হইয়াছে— অস্তিত্বনাস্তিত্ববিহীন আত্মানৈরাত্ম্যবর্জিত প্রকৃতিরূপিণী ধর্মচক্ররূপে আকাশকে অভিহিত করা হইয়াছে। ভূতকোটিবর্জিত ধর্মনির্দেশক ধর্মচক্রকথিত যাহা, তাহা আকাশেই বিরাজিত এবং তথতা হইতে এখানেই তথত্বের সমাবেশ—

"আকাশেন সদাতুল্যং নির্বিকল্পং প্রভাস্বরম্।
অনন্তমধ্যং নির্দেশং ধর্মচক্রমিহোচ্যতে॥
অস্তিনাস্তিবিনির্মুক্তমাত্মানৈরাত্ম্যবর্জিতং।
প্রকৃত্যাজাতিনির্দেশং ধর্মচক্রমিহোচ্যতে॥
ভূতকোটিং চ তথতায়াং তথত্বতঃ।
অদ্বয়ো ধর্মনির্দেশং চ ধর্মচক্রমিহোচ্যতে। (২৬।৫৭-৫৯)

'সদ্ধর্মলঙ্কাবতারসূত্রম্' এ শূন্যতাকে সপ্তবিধরূপে ভাগ করা হইয়াছে—লক্ষণশূন্যতা, ভাবস্বভাবশূন্যতা, অপ্রচরিতশূন্যতা, প্রচরিত-শূন্যতা, সর্বধর্মনিরলাপ্যশূন্যতা, পরমার্থার্থজ্ঞানমহাশূন্যতা এবং ইতরেতর-শূন্যতা—"তত্র মহামতে সপ্তবিধশূন্যতা। যদুত লক্ষণশূন্যতা ভাবস্বভাব-শূন্যতা প্রচরিতশূন্যতা অপ্রচরিতাশূন্যতা সর্বধর্মনিরলাপ্যশূন্যতা পরমার্থার্থ-জ্ঞানমহাশূন্যতা ইতরেতরশূন্যতা চ সপ্তধা।" (পৃ-৩১)

চারিটি বৌদ্ধমত

বুদ্ধদেব প্রচলিত ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন যে, 'ঈশ্বর' বা 'আত্মা' বলিয়া জগতে কিছুই নাই। কাহারও সহায়তা বা করুণা ধর্মজগতে প্রয়োজন হয় না, শুধু সৎকর্মসাধন করিলেই উন্নত জীবন লাভ হইবে এবং উন্নত হইতে উন্নততর পথে চলিতে চলিতে জন্ম-জন্মান্তরে নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার দার্শনিকতত্ত্বের মূলস্বরূপ তিনটি কথা—"সর্বং অনিত্যম্, সর্বং অনাত্মম্, সর্বং শান্তম্।" জগতের সমস্ত দৃশ্যবস্তু অনিত্য—চরম পরিণতি 'শূন্যতা', কিন্তু ইহা কঠিন পদার্থ নহে, ইহার কোন বিকার নাই—ইহা শূন্য, চিত্তের চিরশান্তিময় অবস্থা বিশেষই বৌদ্ধমতে নির্বাণ; তৃষ্ণাক্ষয়ে এই শূন্যোপম নির্বাণের ভিতর গিয়া চিত্ত চিরবিশ্রান্তি লাভ করে। বুদ্ধদেবপ্রচারিত পুনর্জন্মরহিত এই 'নির্বাণ' কথিত মুক্তির যাহা স্বরূপ, তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই বলিয়া পরবর্তীকালে গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধগণের ভিতরে এই সমস্ত বিষয় নিয়া নানাবিধভাবে গবেষণা চলিতে থাকে এবং ইহার ফলে চারিটি বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—"তে চ বৌদ্ধাশ্চতুর্বিধয়া ভাবনয়া পরমপুরুষার্থং কথয়ন্তি। তে মাধ্যমিকযোগাচারসৌত্রান্তিক-বৈভাষিকসংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা বৌদ্ধা যথাক্রমং সর্বশূন্যত্ববাহ্যার্থ শূন্যতাবাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠন্তে। যদ্যপি ভগবান্‌বুদ্ধ এক এব বোধয়িতা তথাপি বৌদ্ধানাং বুদ্ধিভেদাচ্চতুর্বিধম্। যথা গতোঽস্তমর্ক ইত্যুক্তে জারচৌরানূচানাদয়ঃ স্বেষ্টানুসারেণাভিসরণপরস্বা-পহরণসদাচারণাদিসময়ং বুধ্যন্তে। সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যমিতি ভাবনাচতুষ্টয়মুপদিষ্টং দ্রষ্টব্যম্" (সর্বদর্শনসংগ্রহঃ-বৌদ্ধদর্শনম্-পংক্তি ৪১-৪৯)। সায়নাচার্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহঃ গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শন বা সাধনাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটি বিভিন্ন ধর্মভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বৌদ্ধগণ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে প্রসিদ্ধ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন, তাঁহাদের আদর্শ হইল যথাক্রমে সর্বশূন্যত্ব, বাহ্যার্থশূন্যত্ব, বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব ও বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ব। যদিও ভগবান বুদ্ধ একশূন্য শান্ত নির্বাণের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন, তবুও পরস্পর বুদ্ধির ভেদে চতুর্বিধদলের উৎপত্তি হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সূর্য অস্তমিত হইয়াছে—এই কথা শুনিয়া জার মনে করে যে তাহার অভিসারের সময় হইয়াছে, চোর মনে করে যে তাহার চুরি করার সময় হইয়াছে এবং ধার্মিক পুরুষ মনে করেন যে তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক সদাচরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তদ্রূপ এই চারিটি দলের ভাবনার বিষয় চারিটি বিভিন্ন অবস্থা—সমস্ত ক্ষণিক ক্ষণিক, সমস্ত দুঃখ দুঃখ, সমস্ত স্বলক্ষণ স্বলক্ষণ ও সমস্ত শূন্য শূন্য।

মাধ্যমিক—এইমতে সবশূন্যত্ব অর্থাৎ এই সৃষ্টি প্রবাহে কোন কিছুরই অস্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। মাধ্যমিকের মতে বৈদান্তিকের ন্যায় এই বিশ্বসংসারে সমস্ত বস্তুই ইন্দ্রজালতুল্য। সত্য দুই প্রকার—পরমার্থ ও সংবৃত্তি, যাহা বেদান্তে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকরূপে বর্ণিত। কোন কিছুরই সত্তা নাই, বিনাশ নাই, আবার জন্ম, স্বপ্ন ও নির্বাণ বলিয়াও কিছু নাই। "ইহারা প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদী হইলেও মায়া কথাটা ব্যবহার করেন না। ইহারা সাংখ্য মতের 'প্রধান' ও প্রকৃতির পরিবর্তে প্রজ্ঞা 'ও উপায় ব্যবহার করেন।"১ উক্ত চতুষ্টয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের মতে সকলই শূন্য—স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুসকল জাগ্রতাবস্থায় দেখা যায় না, আবার জাগ্রতাবস্থায় যাহা দেখা যায়—স্বপ্নাবস্থায় তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং কোন বস্তুই সকল অবস্থায় দেখা যায় না—সত্য বলিয়া কিছুই নাই।

যোগাচার—বাহ্যবস্তু মাত্রই মিথ্যা, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপে যে আত্মা প্রতিভাত হয়, তাহাই সত্য। এই বাহ্যার্থশূন্য নামক বিজ্ঞানকে দুই প্রকার বলা হয়—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান, জাগ্রতাবস্থায়

*১ বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু—বৌদ্ধধর্মশব্দ

ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। আবার সুষুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলে, এই আলয় বিজ্ঞানের অবলম্বনে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার বিষয়বস্তু আত্মা—এই আত্মাও বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্যই এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়।

সৌত্রান্তিক—বাহ্যার্থপদার্থ সকল প্রকৃত সত্য বস্তু নহে, প্রতিবিম্ব মাত্র। বাহ্যার্থপদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁহাদের মতে পরোক্ষ, বাহ্য বস্তুর সত্যতা অনুমানসিদ্ধবাহ্যার্থনুমেয়ত্ব। সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন—দ্বিতীয় ক্ষণে নষ্ট। আত্মা ও ক্ষণিক জ্ঞানস্বরূপ—ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর বলিয়া কোন আত্মার অস্তিত্ব নাই। বাহ্যার্থ অনুমান করিবার যে গ্রাহিকা বুদ্ধি আছে, সৌত্রান্তিক তাহার একটি পৃথক অস্তিত্ব অনুমোদন করিতেছেন।

বৈভাষিক—বৈভাষিকদের মতে পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়—এই বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষত্বের মতে মানুষ মাত্রই বাহ্য জগতের বস্তু সমূহের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

অতএব দেখা যায় যে, মাধ্যমিকের শূন্যবাদ, যোগাচারের ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকের জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ ও বৈভাষিকের ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ—এই চারিটি বিভিন্ন মতকে অবলম্বন করিয়া ভারতের বৌদ্ধধর্মের মহাপ্লাবনের ভিতরে এই সকল সম্প্রদায় যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই তরঙ্গাঘাতে ভারতের বৌদ্ধধর্ম আর তাল সামলাইতে পারিল না—সেই সকল তরঙ্গের সহিত নাচিতে নাচিতে ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, আজও সেই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ধর্মতরঙ্গের নৃত্যে মাতোয়ারা, আর ভারত আজ তরঙ্গহীন নিথর নিস্তব্ধ।

নাগার্জুনের বৈশিষ্ট্য

নাগার্জুন কর্তৃক যে মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ভিতরে একটা যুগান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরবর্তী যুগে সেই শূন্যবাদই বৌদ্ধদের নাস্তিক সংজ্ঞা প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তু সমূহের উৎপত্তি বা নিরোধ বলিয়া কিছু নাই—সমস্তই কার্যকারণসম্বন্ধের অনন্ত প্রবাহে আবর্তিত হইয়া চলিতেছে। নাগার্জুনের মতে জন্মও নাই, স্থিতিও নাই বিনাশও নাই, একত্বও নাই, বহুত্বও নাই, আবির্ভাবও নাই, তিরোভাবও নাই। যদিও এই শূন্যত্বের প্রতিষ্ঠাতারূপে নাগার্জুনের কৃতিত্বকে স্থান দেওয়া হয়, তথাপি দেখা যায় যে, নাগার্জুনের পূর্বেও এই শূন্যতত্ত্বের প্রচলিত রূপ ছিল। হীনযান নামধারী বৌদ্ধদের ভিতরেও শূন্যতত্ত্বের বার্তা নিহিত ছিল—সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই নাগার্জুন তাঁহার 'মূল মাধ্যমিক কারিকা'তে একটি পরিপূর্ণ অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি করেন।

এই শূন্যতত্ত্বের নানারকম বিচিত্র ব্যাখ্যা ধর্মজগতেও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতির ভিতরে একটি সমস্যামূলক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। মাধ্যমিক বৃত্তির সংজ্ঞানুসারে এই শূন্যের অর্থ অস্তিত্বও নয়, অস্তিত্ব-বিহীনতাও নয়, অসীম অতল সংজ্ঞাহীন কিছুও নয়—ইহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহা সর্বশূন্য, শান্ত ও নির্মল, এমন কোন অক্ষর নাই যাহাদ্বারা ইহার সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে—"অবাচোহনক্ষরাঃ-সর্বশূন্যাঃ শান্তাদিনির্মলাঃ।" (মাধ্যমিক কারিকা—নির্বাণ পরীক্ষা)

শূন্যতা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না (অননার্থাঃ), ইহা প্রকাশ্য (প্রপঞ্চৈব প্রপঞ্চিতম্), ইহাকে কেহ কাহারও কাছে বর্ণনা করিতে পারে না (অপরপ্রত্যয়:) ইহা ধারণার অযোগ্য (নির্বিকল্পঃ) এবং ইহার পরিণত অবস্থা শান্ত (শান্তম্)। এই সত্তাটির চূড়ান্ত পরিণতিকে অস্তিত্ব বলা যায় না, নাস্তিত্বও বলা যায় না, অস্তিত্বনাস্তিত্বও বলা যায় না "নাসদ্ভূতং ন সদ্ভূতং সদসদ্ভূতমেব বা" (৮ম প্রকরণ, মাধ্যমিকবৃত্তিঃ)। সুতরাং শূন্যতাকে অস্তিত্বের অভাব বশতঃ স্বভাবশূন্য বলা যায়, আবার বহুত্বের অভাবে প্রপঞ্চশূন্য রূপে বর্ণিত হয়। সুতরাং অপেক্ষবাদ ও বাস্তবসত্তা—এই

পরস্পরের উপর নির্ভর করাতে একদিকে নির্ভরশীলতার জন্য 'প্রতীত্যসমুৎপাদ', আবার অনুৎপত্তির জন্য 'পরমার্থোৎপন্ন'ও বলা যায়। বাস্তবসত্তা বলিতে যেখানে সমস্ত বহুত্বের শেষ পরিণতি অদ্বয় তাহাই বুঝায়। সুতরাং শূন্যতা বলিতে নাস্তিকতা অথবা অভাবকে, না বুঝাইয়া বাস্তবসত্তা এবং বহুত্বের অস্তিত্ব হীনতার কথাই প্রকাশ করে—"Reality is one in which all pluralities merge (Advaya). Thus Sunyata in the present context does not mean Nihilism (নাস্তিত্ব) or void, it means on the other hand to be devoid of ultimate reality and plurality "১

নাস্তিত্বমাত্রই একটা অস্তিত্বের ধারাকে বহন করিয়া আনে, অস্বীকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে স্বীকৃতির আভাস—নাস্তিত্ব কথাটাই একটা কল্পনাবিশেষ মাত্র। নাগার্জুনের রচিত মূলমাধ্যমিক কারিকার প্রারম্ভেই দুইটি শ্লোক সন্নিবেশিত দেখা যায়—

"অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্ অনেকার্থমনাগমমনির্গতম্ ॥"

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহা নিরোধ করিবার কোন শক্তি নাই. বিশ্বের উৎপত্তি বলিয়াও কোন কিছু নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অংশগতভাবে কাহাকেও বিভক্ত করা যাইতে পারেনা, অস্থায়ীচিরস্থায়ী বলিয়াও কিছু ঘোষণা করা যায় না, অনেক অর্থ করিয়া আমরা সৃষ্টি বা সৃষ্টির মূল শক্তিকে ব্যাখ্যা করিতে পারি না, আবার নানাপ্রকার অর্থযুক্ত সংজ্ঞাকেও মানিয়া লইতে পারি না—উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এই যে অপূর্ব রহস্যময় অজ্ঞাততত্ত্ব, ইহা অভেদ্য, অপ্রবেশ্য—অর্থাৎ শূন্যময়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক তত্ত্বের মধ্য দিয়া ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়—ইহা অনেকের অভিমত।

নাগার্জুন উৎপত্তিহীনতার সদম্ভ ঘোষণা সহকারেই তাঁহার মাধ্যমিক-কারিকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিজ হইতে কাহারও উৎপত্তি সম্ভব নহে, অপর কিছু হইতে সৃষ্টি সম্ভব নহে, 'নিজ ও অপর' এই দুইটি

১। Mula Madhyamika Karika—H. Chatterjee (Introduction)

যুক্ত অবস্থা হইতে উৎপত্তি হয় না। কোন কিছু উৎপত্তি হইতেছে অথবা কেহ কোন কিছু উৎপন্ন করিতেছে—এই সমস্ত চিন্তাধারা শুধু ভাবজগতে বিদ্যমান—বাস্তবজগতে নহে—

"ন স্বতো নাপিপরতো ন দ্বাভ্যাংনাপ্যহেতুতঃ।

উৎপন্না জাতা বিদ্যন্তেভাবাঃ ক্বচনকেচন।" (মাধ্যমিককারিকা ১।১)

"Text of Buddhism of the Middle preserves its logic of seeing voidness of all things objectively, it will reserve at least the point where mind sees the voidness of the preceding mind."[১]

বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের 'সর্বশূন্যতা' কথাটার আলোচনার ভিতর দিয়া গবেষণাতে এই প্রতীয়মান হয় যে, চিত্তের ভিতর এমন একটা অবস্থা আসে, যাহাতে চিত্ত মনে করে যে চিত্ত বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"বুদ্ধদেবের শিষ্য নাগার্জুন প্রচার করিলেন যে, নির্বাণলাভ করিলে চিত্তের যে অবস্থা হয়, তাহাই শূন্য। ইহা অস্তি, নাস্তি, তদুভয় ও অনুভয় এই চতুর্বিধ অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা বিশেষ—ইহাই শূন্য। কিন্তু ইহা অভাববাদ নহে। বস্তু একান্তিক সৎ বা অসৎ হইতে পারে না, সুতরাং ইহার স্বরূপ সৎ ও অসৎ-এর মধ্যবিন্দুতে নির্নীত হয়, ইহাই শূন্যরূপ, এই শূন্য পরমতত্ত্ব, ইহাই সত্য, ইহা বজ্র। এই আধ্যাত্মিক মধ্যমার্গকে মাধ্যমিক দর্শন আখ্যা দেওয়া হয়। কালক্রমে ইহা হইতেই বজ্রযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।"

"শূন্যতত্ত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব, সুতরাং ইহার তিনটি, চারটি, পাঁচটি এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি শূন্যের (মহাসময়ালঙ্কার—পৃ ১০৪-১৩৫ দ্রষ্টব্য—Calcutta Oriental Series, No—27) যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা মূল তত্ত্বের ভেদ হয় না। মহাযান বৌদ্ধদের বীজমন্ত্র—"ওঁ শূন্যব্রহ্মণে নমঃ।"[২]

১। History of thoughts in Mahayana or Superior Buddhism—Balyu Watanave—Page 114

২। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী—কল্যাণী মল্লিক—পৃ—৩৫২, ৩৬০

এই মাধ্যমিক দর্শন শূন্য সংজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট রহিলেন না—গবেষণার পর গবেষণা চলিতে লাগিল! ইহার ফলে তাঁহাদের ভিতরে মত-বিরোধের সৃষ্টি হওয়াতে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—অপ্রতিষ্ঠিত সর্বধর্ম এবং মায়োপমা অদ্বৈতবাদী, প্রথমদলের মতে শূন্য ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, আর দ্বিতীয় দল বলিলেন যে, শূন্যছাড়া সমস্ত বস্তুই মায়াবৎ অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম বা পদার্থের মধ্যেই শূন্যতা বিরাজিত—শূন্য-স্বরূপের অস্তিত্ব আছে! "এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া কিছুই নাই, উহার নাম প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। আর একদল মায়োপমা অদ্বৈতবাদের মতে শূন্য ছাড়া আর সব কিছুই মায়ার মত।"[১]

মহাযানী বৌদ্ধগণের মতে পরবর্তী যুগে তথাগত বুদ্ধকথিত 'শূন্যতা' যেন একটা বিভ্রান্তিকর বস্তুতে পরিণত হইল। স্বর্ণ বা লৌহ-খনি হইতে অবিশুদ্ধ বস্তু মিশ্রিত অবস্থায় উত্তোলিত হয় এবং বাজারে নীত হয় পাকা সোনা বা ইস্পাতরূপে, ইহাই সমাজে ব্যবহৃত হয়, শূন্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই অভিমত ব্যক্ত করা যায়। ভগবান বুদ্ধ তথাগতও বহুবিধ সাধনার সাহায্যে বিশুদ্ধ শূন্যত্ব, নির্বাণ বা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং উহাই জগতের হিতার্থে প্রচার করিয়াছিলেন, পাছে তৎপ্রচারিত ধর্মের ব্যাখ্যাতে জটিলতার সৃষ্টি হয়, এইজন্য সংস্কৃত ভাষাতে বুদ্ধবচন অনুবাদ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে বুদ্ধবাণী সংস্কৃতে অনুদিত হইয়াছিল, যাহার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বগুলি সংস্কৃত ভাষার দ্বারা ব্যাখাত জটাজালে আবদ্ধ হইয়া গেল। শূন্যতত্ত্বের সাধনাকে—আচার আচরণের বৌদ্ধ-ধর্মকে মহাযানীগণ উপেক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্মকে বুদ্ধমূর্তি পূজাতে পরিণত করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে আরও বহুপ্রকার দেবদেবীর আবিষ্কারের দ্বারা পৌত্তলিক ধর্মের অবতারণা করিলেন। মহামতি নাগার্জুন বৌদ্ধ-ধর্মকে জটাজাল মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে শূন্যত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া চারিটি স্তরের (শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য) সাহায্যে শূন্যত্বের চরম

১। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পরিণতি প্রকাশ করিলেন। শূন্যতার প্রথম স্তর শূন্যতাবোধ, তারপর সাধনার ক্রমবিকাশে অতিশূন্য ও মহাশূন্য নামক আরও দুইটি স্তর পার হইলে চতুর্থ স্তরে সাধনার ফল স্বরূপ সর্বশূন্যতা বা নির্বাণ লাভ সম্পন্ন হয়: "শূনঞ্চাতিশূন্যঞ্চ মহাশূন্যং

তৃতীয়কম্, চতুর্থং সর্বশূন্যঞ্চ ফলহেতুঃ প্রভেদতঃ।"১

শূন্যতা—গ্রাহ্য ও গ্রাহকভাবরহিত অবস্থাই শূন্যতাপ্রাপ্তি, ইহা নাস্তিকতা নহে। সুতরাং গ্রাহ্য ও গ্রাহকের অভাব বোধের ভিতর দিয়া শূন্যতা অভূতপরিকল্পের ভিতরে স্থিতিলাভ করে। কিন্তু অভূত-পরিকল্পের ভিতরে এই অদ্বয়শূন্যতা বর্তমান থাকিলেও আমরা মুক্ত হইতে পারি না, যেহেতু এই অস্তিত্বের রহিততা শূন্যতার আশ্রয় অভূত-পরিকল্পের ভিতরে ও কর্মকর্তৃত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শূন্যের অপর নাম প্রজ্ঞা ও আলোক, ইহার স্বভাব পরতন্ত্র।

অতিশূন্যতা—আলোকাভাস রূপে অতিশূন্যতাকে বর্ণনা করা হয়, পূর্বতন আলোকজ্ঞান হইতে ইহা উদ্ভূত। শূন্যতাকে যেমন প্রজ্ঞা বলা হয়, তদ্রূপ অতিশূন্যতাকে বলা হয়—উপায়। ইহার অপর নাম পরিকল্পিত, ইহাই লয়গত চিত্তের অবস্থা। এই অতিশূন্যতাকে দক্ষিণ, সূর্য মণ্ডল এবং বজ্ররূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কাম, সঙ্কোচ, আনন্দ, সুখ প্রভৃতি চল্লিশটি দোষযুক্ত ক্ষণিক ক্ষণ তখন ও এই অতিশূন্যতার সঙ্গে বর্তমান থাকে—

"নিশাকরাংস্তুতগাকাশআলোকজ্ঞানসম্ভবঃ।
আলোকস্য ইত্যুক্তম অতিশূন্যমুপায়কম্॥
পরিকল্পিতং তথাপ্রোক্তং চৈতসিকম্।" ২

মহাশূন্যতা—ইহার উৎপত্তি প্রজ্ঞা বা উপায় বা আলোক এবং আলোকাভাস অথবা শূন্যতা অতিশূন্যতার সমন্বয়ে, ইহার অপর নাম 'আলোকোপলব্ধি' ইহার স্বভাব পরিনিষ্পন্ন, তথাপি ইহাকে বলা হয়

১। Intro. to Tantric Buddhism—S. B. Dasgupta—P. 43

২। Ibid : PP. 44-5

অবিদ্যা। ইহাকে আবার স্বাধিষ্ঠান চিত্তও বলা হয়। ইহার সঙ্গে বিস্মৃতি, ভ্রান্তি প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতি দোষ সংশ্লিষ্ট অবস্থায় আছে। এইরূপে আলোক, লোকাভাস ও আলোকোপলব্ধি—এই তিনটি চিত্তের বিভিন্নাবস্থার কথা বর্ণিত আছে এবং এই অবস্থাত্রয় এখন ও ১৬০ প্রকার অশুদ্ধির সহিত জড়িত অবস্থায় দিবারাত্র ব্যাপিয়া বায়ুর সহিত প্রবাহিত হয়। ইহার অপর নাম বাহন, ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিদোষ গুলি নিজ নিজ কাজে রত থাকে, শূন্যতাবস্থায় বায়ুও ভাবধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হয়, অতিশূন্যতাবস্থায় বায়ুর উপর ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় এবং মহাশূন্যাবস্থায় ভাব ও বায়ু পরস্পর মিশ্রণের ভিতর দিয়া সত্তাহীন হইয়া পড়ে।

প্রজ্ঞা যদিও খাঁটি বিবেক এবং আকাশের মত মাধ্যম অবস্থায় থাকে, তবুও যেমন আকাশের ভিতর গোধূলি, রাত্রি ও দিবসের ভিতরে পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হয়, প্রজ্ঞার ভিতরেও বহু রকম পার্থক্য দেখা যায়—

"আলোকস্যোপলব্ধিশ্চ উপলব্ধং তথৈবচ।
পরিনিষ্পন্নশ্চৈব অবিদ্যা চৈবনামতঃ॥" ১

সবশূন্যতা—(সর্বপ্রকার অস্তিত্বের অভাব ও প্রকৃত শূন্যত্ব)। ইহা তিন প্রকার অশুদ্ধির সমস্ত বিষয় হইতে মুক্ত ও আত্মস্বরূপ। ইহা অপরিবর্তনীয়, আকারশূন্য, দ্বৈতভাববিবর্জিত। ইহাই প্রধান সত্তা, প্রকৃত শূন্যত্ব বলিতে বুঝায় আরম্ভ বা অনারম্ভ, অনন্ত বা শান্ত, মাধ্যমিক বা অমাধ্যমিক—"শূন্যত্রয়বিশুদ্ধির্যো প্রভাস্বরমিহোচ্যতে। সর্বশূন্যংপদংতচ্চ জ্ঞানত্রয়বিশুদ্ধিতমঃ॥"২

বিশ্বসাগরের এই তীরে জন্ম হয় না, অপর তীরেও জন্ম হয় না। সংস্কৃত বস্তু অবস্থা বিশেষে উৎপন্ন (প্রত্যয় হইতে) হয়—ইহা মহাযান বিংশক নামক গ্রন্থের মত। আরও দেখা যায় যে, ইহার স্বরূপ বলিতে শূন্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সর্বজ্ঞ যিনি, তিনিই অবগত আছেন। যিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদের' তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব

১। Ibid; PP. 44-5 ১। Ibid: P. 45

জানিয়া জগৎকে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন—তাঁহার নিকট জগতের আদি, মধ্য বা অন্ত বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। সংসার ও নির্বাণ একমাত্র বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা, জগতের স্বরূপতত্ত্ব বলিতে বুঝায়—নিরঞ্জন, নির্বিকার, আদি, শান্ত ও প্রভাস্বর, অতএব পদার্থসমূহ প্রতীত্যসমুৎপন্ন বা শূন্য—ইহাদের উৎপত্তিও নাই, নিরোধও নাই, সর্বদা একইভাবে রহিয়াছে—

"নাস্মিংস্তস্মিংস্তটে জাতি সংস্কৃতং প্রত্যয়োদ্ভবম্,
শূন্যমেবস্বরূপেণ সর্বজ্ঞ-জ্ঞানগোচরম্ ॥৩
যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদাৎ ভূতার্থমবলোকতে।
স জানাতি জগচ্ছূন্যমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্ ॥১৫
দর্শনেনৈব সংসারো নির্বাণং চ ন তত্ত্বতঃ।
নিরঞ্জনং নির্বিকারমাদিশান্তং প্রভাস্বরম্।"১৬
(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংবর্ধন লেখমালা, ১খণ্ড—পৃঃ ১৯৯)

পাতঞ্জল দর্শনে চারিটি শূন্যস্তর

পাতঞ্জল যোগদর্শনেও শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্যের সাধনার বিবরণ রহিয়াছে। যোগশাস্ত্রে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নামক আটপ্রকার সাধনার অঙ্গ রহিয়াছে—ইহারই নাম অষ্টাঙ্গ যোগসাধনা "যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" (সাধনপাদ-২৯)। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারকে বলা হইয়াছে বহিরঙ্গ এবং অবশিষ্ট ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে বলা হইয়াছে 'সংযম' এবং উক্ত পাঁচটির তুলনায় অন্তরঙ্গ—ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"" ত্রয়মন্তরঙ্গ পূর্বেভ্যঃ" (বিভূতিপাদঃ-৪, ৭), আবার এই অন্তরঙ্গ তিনটিকে ও নির্বীজ সমাধি বা কৈবল্যের (শূন্যের) বহিরঙ্গ বলা হইয়াছে "তদপি বহিরঙ্গনির্বীজস্য" (বিভূতিপাদঃ-৬৮)।

পরবর্তীযুগে যোগীদের ভিতরে একটা কথা প্রবল হইয়া পড়ে

দেহভাণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড, পঞ্চভূতাত্মক আমাদের এই মানবদেহের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি কামনারাজি অহরহ মানুষকে ভোগের পথে পরিচালিত করিতেছে এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়)—এই উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়-পরিচালনা-গঠিত মনের ক্রিয়া আমাদিগকে স্বরূপ গতির বিপরীত দিকে সবদা আকর্ষণ করিতেছে—"উভয়াত্মকং মনঃ" (সাংখ্যসূত্রম্-২'২৬)। এই মনের বিলোপ না ঘটিলে আমাদের দেহভাণ্ডের স্বাভাবিক বা সহজ স্রোত (স্বরূপতা বা শূন্যতার দিকে যাহার গতি) প্রবাহিত হইতে পারে না বলিয়াই চিত্তের বিলোপ সাধনের জন্য ও দেহকে বজ্রের মত শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদে বর্ণিত 'যম' (অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপ্রতিগ্রহাঃ যমাঃ-৩০) এবং 'নিয়ম' (শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ-৩২) এর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বৃত্তিগুলিকে দমন করিতে হইবে। এইবার সঙ্গে সঙ্গে দেহকে স্থির করিবার জন্য 'আসন' অভ্যাস করিতে হইবে (পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি বহুপ্রকার আসন আছে)। যাহাতে শরীর না নড়ে, না কাঁপে, বেদনাগ্রস্ত না হয়, চিত্তের কোন উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে—এইরূপভাবে আসন করিতে করিতে সহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে (স্থিরসুখমাসনম্, ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ—সাধনপাদে ৪৬,৪৮।

আসনসিদ্ধ হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসকে আয়ত্তাধীন করার যে চেষ্টা, তাহারই নাম 'প্রাণায়াম' (তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ-সাধনপাদে—৪৯)। রেচক, পূরক ও কুম্ভক—এই তিন প্রকার প্রাণাযাম অভ্যাসে যখন নিশ্বাস বায়ু ধারণার ক্ষমতা জন্মে, তখনই প্রাণায়ামসিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের সাহায্যে দেহ ও মন সুপরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত হইলে ইন্দ্রিয় বশীকরণের ক্ষমতা জন্মে। তখন চিত্ত ইচ্ছানুবর্তী হইবে—কোন-

প্রকার রূপ চক্ষুকে আকর্ষণ করিতে পারিবেনা, কোনপ্রকার শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করিতে পারিবেনা—ইহাই 'প্রত্যাহার'। এইরূপভাবে পাঁচ-প্রকার বহিরঙ্গ সাধনার দ্বারা 'প্রত্যাহারসিদ্ধ' হইলে শূন্যতা ধারণার ক্ষমতা আসে অর্থাৎ দেহভাণ্ড শূন্যতার অনুভবে সামর্থ্য লাভ করে।

'প্রত্যাহারসিদ্ধি' হইলে আর কোন বস্তু সত্তা না থাকাতে যোগী শূন্যতার ভিতরে অবস্থান করেন, এই শূন্যের রাজ্যে চিত্তের অবস্থানের ফলে চিত্তবিলোপ ঘটে—'ইহাই ধারণা' (দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা-বিভূতিপাদে ১)—ইহাই শূন্যবাদীদের 'শূন্য' নামক প্রথম স্তর। শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে ধীরে ধীরে ধ্যানের দ্বারা 'অতিশূন্য' অবস্থায় রূপান্তর ঘটে—এই স্তর হইতে বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই (তত্র প্রত্যয়ৈক-তানতা ধ্যানম্-বিভূতিপাদে ২) এইরূপ একাগ্রতার ভিতর দিয়া চিত্ত যখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয় অর্থাৎ না থাকার মত হয়—তখনই উহা 'মহাশূন্য' স্তর বা সমাধিতে পরিণত হয় (তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ—বিভূতিপাদে ৩)। এই সমাধির ফলস্বরূপ পরবর্তী অবস্থাতে 'কৈবল্য প্রাপ্তি' হয়—ইহাই সর্বশূন্য' স্তর (পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি"—কৈবল্যপাদে ৩৩)

পুরাণাদি শাস্ত্রের ভিতরে বর্ণিত সৃষ্টিপ্রবাহে পৃথিবী হইতে ঊর্ধ্বদিকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যনামে সপ্তলোকের বর্ণনা আছে—

"ভূর্লোকশ্চভুবশ্চৈবতৃতীয় স্বরিতিস্মৃতঃ।

মহর্লোকজনশ্চৈব তপঃ সত্যশ্চ সপ্তম॥ (বায়ুপুরাণ—৫০।৭)।

ইহার ভিতরে সত্য, তপঃ ও জনলোককে যথাক্রমে সর্বশূন্য, মহা-শূন্য ও অতিশূন্য নামে অভিহিত করা যায়, এবং মহোলোককে শূন্য বলিয়া নির্ধারণ করা যাইতে পারে. যেহেতু 'যোগবার্তিকম্—ভাষ্য (৩।২৫) প্রথমোক্ত তিনটিকে ব্রহ্মলোক বলা হয় এবং মহোলোককে বলা হয় প্রজাপতিলোক, যেখান হইতে জন্ম হয়—অর্থাৎ শূন্যের চারিটি স্তরের ভিতরে মহোলোককে প্রথম স্তর 'শূন্য' বলা যাইতে পারে (জনআদি

তত্রিভূমিকো ব্রহ্মলোকঃ ততোঽধঃ প্রজাপতির্লোকনাম মহান্ মহোরিতি।")

সত্যলোকের বা সর্বশূন্যতার বর্ণনা মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

"তদেতৎ সত্যম্"—২।১

"যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্—১।৬

এই সত্যলোকই স্বরূপসত্য—ইহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ ও কর্ণের অতীত—সর্বশূন্য, এই সত্যলোকে কোন বিন্দুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নাই, শব্দ নাই, রূপ নাই, ব্যয় নাই, রস নাই, নিত্যতা নাই, গন্ধও নাই, আবার ইহা অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধির অতীত, জন্ম বা মৃত্যুর বাহিরে ধ্রুবসত্য। এই সর্বশূন্যময় সত্যলোকে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ—এমন কি অগ্নি পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতে অক্ষম—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

(কঠোপনিষৎ—৩।১৫)

"ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ং অগ্নিঃ।

(মুণ্ডকোপনিষৎ—২।১০)

বিষ্ণুপুরাণেও ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ নামক তিনটি লোককে কৃত এবং জন, তপঃ ও সত্য নামক তিনটি লোককে অকৃত নাম দিয়া মহোলোককে এই কৃত ও অকৃত উভয় প্রকার লোকের মধ্যস্থলে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে এই মহোলোকেই প্রতিকল্পের শেষে শূন্যত্বের আরম্ভ হয়—জনলোক শূন্যতর, তপোলোক শূন্যতম ও সত্যলোক সর্বশূন্য।

"কৃতাকৃতত্রয়োর্মধ্যে মহর্লোক ইতিস্মৃতঃ।
শূন্যং ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি (৭।২।২০)

"সহস্রারকে তুরীয় নামক জ্ঞানভূমি বলা হয়। নির্বাণতন্ত্র অনুসারে সত্যলোক সহস্রার নির্বাণমুক্তির স্থান। বলা হয়েছে মহলোক সালুক্য মুক্তির স্থান, জনলোক সারূপ্যমুক্তির স্থান, তপোলোক সাযুজ্যমুক্তির স্থান এবং ঊর্ধ্বে নির্বাণ।" ১

১। শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা (২য় খণ্ড)—উপেন্দ্রনাথ দাস—পৃ ৬৭

এখন শূন্য হইতে কার্যকারণযুক্তসৃষ্টি-কার্য কিভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয় এবং এই জাতীয় প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক। সৃষ্টির মূল যদি শূন্যতা না হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রের ভিতর দিয়া সৃষ্টির মূলরূপে সর্বসম্মতিক্রমে একটি চিরন্তন সত্য নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইত এবং জগতের সমস্তপ্রকার সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। ভারতের ছয়টি দর্শনশাস্ত্র বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে সর্বসম্মত চিরন্তন সত্যরূপে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই।

ষড়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন (উত্তর মীমাংসা) বাদরায়ণকৃত সূত্রাবলী-মাত্র, বিভিন্ন ঋষি ও ধর্মবেত্তাগণের দ্বারা বিবিধপ্রকারে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের বা সৃষ্টিকর্তার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কেহই আজও একমত হইতে পারেন নাই। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন তরঙ্গধারায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে শেষ পর্যন্ত মায়াবাদে উপনীত হইয়াও দেখিলেন যে, সৃষ্টির বাসনা নির্গুণ ব্রহ্মের হইতে পারেনা, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় না দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ (ব্রহ্মসূত্র—২।১।৩০) অর্থাৎ লোকবৎলীলা বাসনা নহে।

পূর্ব মীমাংসাকার জৈমিনির মতে কর্মই বেদের সার, কর্ম ভিন্ন বেদে যাহা দৃষ্ট হয়—তাহা অনর্থক—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্য—মতদর্থানাম্ তস্মাদনিত্যমুচ্যতে" (মীমাংসা সূত্র ২।১)। ঈশ্বরের এই দর্শনে সৃষ্টিকর্তারূপে উল্লেখ নাই। এমন কি দেবতার অস্তিত্বও অস্বীকার করা হইয়াছে। মীমাংসার মতে মন্ত্রই দেবতা—দেবতা কখনও শরীরী হইতে পারে না, শরীরী হইলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব। শঙ্করাচার্য মীমাংসাকে আস্তিক দর্শন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বেদে বর্ণিত দেবতাদের দেহ অর্থবাদ বা প্রশংসা মাত্র। মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণের দ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য উৎসর্গ

করিলেই ফলোৎপন্ন হইবে। সুতরাং মীমাংসামতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো দূরের কথা দেবতার অস্তিত্বও স্বীকৃত হয় নাই, কারণ মন্ত্রেই দেবতার অধিষ্ঠান, মন্ত্রের বাহিরে তাঁহাদের অস্তিত্ব সংশয়ের স্থল।

"মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁদের মতে পরমাণুর উপাদান দ্বারা জগৎ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। কর্ম হইতে অপূর্ব নামে একটি শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তি কর্মের ফল উৎপাদন করে।"১

ন্যায়দর্শনের মতে পূর্বজন্মের স্মৃতিই মূলাধার, জীব যাহা কিছু ভাবে বা যাহা কিছু করে সমস্তই সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন—"পূর্বকৃত ফলানুবন্ধাৎ উৎপত্তিঃ"—(ন্যায়সূত্র ৩।১।৬৪) এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায দর্শন মনে করে ঈশ্বর শুধু অদৃষ্ট বা কর্ম ফলের কারণ মাত্র—ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে—"ঈশ্বরেঃ কারণং পুরুষকর্মাফলাদর্শনাৎ" (ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯)। জীবের কর্মব্যতীতফল উৎপন্ন হয় না, ঈশ্বরের স্বীকারের কোন প্রয়োজন হয় না—কর্মই ফলের উৎপাদক—" নপুরুষকর্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" (ন্যায়সূত্র—৪।১।২১)

"যাহার অন্ত আছে, তাহার আদিও আছে। সুতরাং জীবসমন্বিত জগতের আদি ছিল স্বীকার করিতে হয়। শূন্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, শূন্যেই বিলীন হইয়া যাইবে বলিতে হয়। ঈশ্বর মানবের প্রতি প্রীতিবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ কি? পরমাণুগণ ও মানবাত্মা উভয়েই যদি নিত্য হয় এবং তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার ফল যদি এই জগৎ হয়, তাহা, হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোথায়? সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জীবাত্মা ও পরমাণুগণ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বলিতে হইবে।"২

কিন্তু ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তারূপে স্বীকৃত হইলেও তিনি জগতের বাহিরে অধিষ্ঠিত এবং জগৎ হইতে পৃথক জীবাত্মা ও অনুগণ ঈশ্বরের মত নিত্যও অনাদি—ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে।

১—২। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—তারকচন্দ্র রায়—পৃঃ ১৭২

বৈশেষিক ন্যায়দর্শনে কালকে নিত্য ও জাগতিক পদার্থের উৎপত্তির কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে "কারণেলয়ঃ" (বৈশেষিক সূত্র —৭।১।২৫) এবং অভাব বা অসৎকেও একটি পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই অভাব পদার্থটি চারি প্রকার—১। প্রাগসৎ—উৎপত্তির পূর্বে যে অভাব (প্রাক্ + অভাব), ২। ধ্বংসাভাব—ধ্বংসপ্রাপ্ত দ্রব্য (সৎ + অসৎ) ৩। সংসর্গাভাব বা অন্যোন্যাভাব—বর্তমানরূপে সৎ কিন্তু অন্যরূপে অসৎ, ৪। অত্যন্তাভাব—উৎপত্তি, স্থিতি বা ধ্বংস নাই (বৈশেষিক সূত্র—১।১।১—৫) "ক্রিয়াগুণব্যপদেসাভাবাৎ প্রাগসৎ, সদসৎ, অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেসাভাবাদর্থান্তরম্, সচ্চাসৎ।" "বৈশেষিকদর্শন অসৎকার্যবাদী। এই মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের উৎপত্তি থাকে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অভাব থাকে।"১

পূর্বোক্ত বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক ন্যায় দর্শনের ভিতরে কোন যুক্তিসঙ্গত সৃষ্টিপদ্ধতি অথবা সর্বজন সম্মত দার্শনিকতত্ত্ব পাওয়া তো দূরের কথা, উপনিষৎ, পুরাণাদি কোন শাস্ত্রেই এই সকল দার্শনিক মতসমূহ গৃহীত হয় নাই। একমাত্র সাংখ্যোক্ত নিরীশ্বর সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই সমস্ত শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, এমন কি তৎসমর্থক পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নামক একটি পুরুষ বিশেষের উল্লেখ থাকিলেও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর ঈশ্বরের কোন আধিপত্য স্বীকার করা হয় নাই অর্থাৎ সৃষ্টি কার্যের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। শুধু ধ্যেয়বস্তু হিসাবে যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে এবং তাঁহার প্রকাশ স্বরূপ ওঁকার ধ্বনি ঘোষণা করিয়া প্রকারান্তরে শূন্যবাদকেই সমর্থন জানাইয়াছেন, কিন্তু আবার পরক্ষণেই ঈশ্বরের প্রাধান্য উড়াইয়া দিয়া বলিলেন যে, যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

সাংখ্যকার সৃষ্টিকার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির বিকারের ফলে সৃষ্টির উদ্ভব ঘটে—

১। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—তারকচন্দ্র রায়, ৪৫

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত
ষোড়শকস্তুবিকারঃ ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥৩ (সাখ্যকারিকা)

১। প্রকৃতি—১

২। প্রকৃতিবিকৃতি—বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও পঞ্চতন্মাত্র—৭

৩। বিকার—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়), বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়), ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (পঞ্চভূত) ও মন —১৬

৪। প্রকৃতি বিকৃতি ভিন্ন—পুরুষ—১

ইহাকেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান বলা হয় এবং ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে যে পঙ্গু যেমন অন্ধের স্কন্ধদেশে আরোহন করিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া নিয়া যায়, তদ্রূপ ক্রীড়াশীলা অচেতনা প্রকৃতিও ক্রিয়াশক্তিহীন সচেতন পুরুষের সংযোগে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥ ২১ (সাংখ্যকারিকা)

সাংখ্যকার কপিল প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ কিছু দেখিতে পান নাই—তিনি শুধু কার্যের ভিতর দিয়া কারণরূপ গুণের সন্ধান পাইয়াছেন, প্রকৃতির গুণগুলিকে তিনি কারণরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়াই কার্য হইতেই কারণের অনুমান করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয়ের যে শূন্যরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং প্রত্যক্ষত্বের বাধাস্বরূপ মায়া পরবর্তীযুগে কল্পিত হইয়াছে—

"পরমর্ষেরপি গুণানাং কার্যমেব প্রত্যক্ষম্।
ন শক্তি মাত্রেন অবস্থানাং সংবেদ্যত্বাৎ ॥
গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথংপ্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্ ॥" (যুক্তিদীপিকা)

শূন্য হইতে সৃষ্টি

শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে শূন্য হইতে সৃষ্টিপ্রবাহের বর্ণনাস্বরূপ 'অদ্বয়বজ্র-সংগ্রহ' নামক পুস্তক হইতে নিম্নে বিবরণ প্রদান করা হইতেছে—

"গুড়ে মধুরতা চাগ্নেরুষ্ণত্বং প্র(কৃ)তির্যথা। শূন্যতা সর্বধর্মাণাং তথা প্রকৃতিরিষ্যতে॥ পৃ ৪।

"শূন্যতো জায়তে ধর্মাস্তস্মাদন্যা ন ধর্মতা।
অতএব সার্বজ্ঞ্যং বুদ্ধস্য ন বিহন্যতে॥ পৃ—৪৪
শূন্যতাবোধিতবীজং বীজাদ্বিম্বং প্রজায়তে।
বিম্বে চ ন্যাসবিন্যাসৌ সর্বং প্রতীত্যজম্॥ পৃ—৫০
শূন্যতা সর্ববস্তুনাং কস্য নাম ন সম্মতা।
সর্বস্বভাবোঽসৌ কষ্টাপ্রত্যবেদ্যতে॥" পৃ—৫২

গুড়ের মিষ্টত্ব ও অগ্নির উষ্ণত্ব যেমন সর্ববাদিসম্মত, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে যে প্রকৃতি বিরাজিত তাহাও শূন্যতা। শূন্যতা হইতেই উৎপত্তি এতদ্ব্যতীত উৎপত্তি হইতে পারে না—এই সর্বশূন্যতা সর্বজ্ঞ তথাগতের বাণী—সমস্ত বস্তুর বীজস্বরূপ শূন্যতা, এই বীজ হইতে বিম্ব এবং বিম্ব হইতে উৎপত্তি ও লয় লইয়া থাকে। সমস্ত বস্তুর অভাববোধের সংজ্ঞা দেওয়া সুকঠিন এবং এই জন্যই শূন্যকে স্বভাব বা সহজ নামে অভিহিত করা হয়।

মূল মাধ্যমিককারিকা (২য় ভাগ)এ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকাতে—"তথাচ অনুভবমাণানাং বস্তুজাতানাং যে যে সম্ভাব্যমানাঃ ধর্মাঃ তদ্ যথা সত্ত্বমসত্ত্বম্ সদসত্ত্বং, ন সত্ত্বং নাসত্ত্বমিতি, তেষাং তেষাং ধর্মাণাং বস্তুত্বভাবানর্হতয়া ফলতঃ নিঃস্বভাবমেব বস্তুতত্ত্বমিতি মাধ্যমিকানাং সিদ্ধান্তঃ॥" (পৃঃ ৯)

যে বস্তুজাত ধর্মগুলি অনুভব করা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, অস্তিত্বনাস্তিত্ব এবং অস্তিত্বও নয় নাস্তিত্বও নয়—এইরূপ চতুষ্টয়ের ভাবসত্ত্ব না থাকায়, এই শূন্যতাকে নিঃস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে শূন্যতাকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

"কিন্তু ধর্মতা কি? স্বরূপ বা স্বভাব। এখন এই স্বভাব কি? প্রকৃতি, এই প্রকৃতি কি? যাহা শূন্যতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই শূন্যতার অর্থ কি? স্বভাবমুক্ত অবস্থা (নৈঃস্বাভাব্য)। ইহা দ্বারা আমরা কি বুঝিব? সেইরূপ তথ্য। এই তথ্য কি? যেইরূপ সেইরূপ হওয়া অর্থাৎ অবিকারিত্ব সর্বদা বিদ্যমানতা (সদৈব স্থায়িত্ব)। "এই শূন্যতা প্রতীত্যসমুৎপাদই বটে, আর প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ কারণসামগ্রী হইতে বস্তুর উদ্ভব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা বস্তুর স্বস্বরূপে অনুৎপাদ এবং এখানেই সর্বভাষার বিরাম (প্রপঞ্চোপসম)"। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—রাধাকৃষ্ণন্—পৃ ২১৪, ২১৬)

প্রতীত্য সমুৎপাদ

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অতীত জন্ম, বর্ত্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্মের উপাদান ও গঠন প্রণালীর বিবরণ—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন) স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব যথাক্রমে স্তরের ভিতর দিয়া জন্ম ও জরামরণাদি দুঃখের উৎপত্তি ঘটে। বিপরীতক্রমে জন্ম ও মরণাদির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে একের পর একটি করিয়া অবিদ্যা, সংস্কার বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব—, এই সকলের উচ্ছেদ ঘটাইলে জন্মের নিরোধ ও শূন্যতা বোধ আসিবে।

শূন্যতা ও করুণা

হীনযান ও মহাযান উভয় পথই শূন্যতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধকথিত নির্বাণের স্বরূপ লইয়া অর্থাৎ এই নির্বাণ অভাব-স্বভাব এবং অবাস্তব অথবা ভাবস্বভাব ও বাস্তব—এই সন্দেহ দোলায় দোলায়মান অবস্থাই পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। হীনযান বুদ্ধপ্রদর্শিত নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে সাধনা করিতেন, শূন্যতার ভিতর দিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে শূন্যতা উপলব্ধির পর অস্তিত্বকে

অনস্তিত্বের মধ্যে বিলোপ করিয়া দেওয়াই হীনযানদের মত, মহাযানগণ নির্বাণের পরিবর্তে বুদ্ধত্বলাভ অর্থাৎ বোধিচিত্তের অধিকার লাভ করিতে চাহিলেন—শূন্যতা ও করুণার সমন্বয় সাধন, "সংসারে থাকিয়া যাহাতে অন্যকে পবিত্র জীবনযাপনে সাহায্য করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে নির্বাণপ্রাপ্তি স্থগিত রাখা কর্তব্য, প্রাচীন মতে এই ধারণাকে উৎসাহ দেওয়া হইত না", (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—রাধাকৃষ্ণন—পৃঃ ১৯৪)

বোধ হয় আদি কৌমসমাজের প্রভাবেই বৌদ্ধগণের ভিতরে একটা বিবর্তন দেখা গেল, যাহার প্রথম পরিণতি মন্ত্রযান—ইহার মূলধর্মনীতি মন্ত্র ও মন্ত্রাগত ধারণা ও বীজ। এতদ্ব্যতীত আরও একটি ধারা আসিল—ইহার নাম বজ্রযান, ইহাদের মতে নির্বাণের তিনটি অবস্থা—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাশূন্য। শূন্যতার পরম জ্ঞানকে নৈরাত্মা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই ধর্মমতটি অতি প্রাচীন—ইন্দ্রিয়দমনদ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বজ্রভাবে সাধনা করিতে হইবে, যাহাতে চিত্ত বজ্রের মত কঠিন হয়। ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া বজ্রের মত শক্তিশালী অবস্থায় নৈরাত্মা দেবীর সহিত মিলনে 'মহাসুখ' লাভ হইবে। শূন্যতা ও করুণা, নর ও নারীর মিলনের মত—এই মিলনের ফল 'মহাসুখই' ধ্রুবসত্য, সমস্ত ইন্দ্রিয়বাসনা নষ্ট হওয়াই একমাত্র পথ শূন্যতালাভের।

আরও একটি সাধনপদ্ধতি দেখা যায়—কালচক্রযান। কাল বা সময় সর্বদর্শী ও সর্বত্র বিরাজিত ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ব্যাপিয়া এই কালচক্র নিরবচ্ছিন্নভাবে সংসার সৃষ্টি করিতেছে, এই সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটিতেছে এবং সর্বশেষে কালই আবার ইহাকে ধ্বংসের পথে বিলীন করিয়া দিতেছে—কালই ইহার একমাত্র সাক্ষীরূপে বিরাজিত। যোগবলে দেহস্থ নাড়ী ও কেন্দ্রগুলিকে নিরুদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথমে প্রাণবায়ুকে সংযত করিতে হইবে—ইহার ফলে কালের কবল হইতে ঘটিবে মুক্তি, আসিবে শূন্যতাবোধ।

দেবযান ও পিতৃযান

বেদ ও উপনিষদের ভিতরে সাধনার দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একদল সাধক নির্বাণ বা মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনা করেন, কিন্তু অন্যদল আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের দ্বারা ইহলোকে ক্ষমতালাভ ও পর-লোকে অস্থায়ী সুখের জন্য সাধনা করেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ ভারতীয় ধর্মের ভিতরে দুইটি সাধনার পথ দেখা যায়—পিতৃযান ও দেবযান। বৌদ্ধদের 'সদ্ধর্মলঙ্কাবতারসূত্রে'ও দেখা যায় ইহার উল্লেখ—"দেবযানং পিতৃযানং শ্রাবকীয়ং তথৈবচ। তথাগতংচ প্রত্যেকং যামানেতান্ বদাম্যহম্" ঃ পৃ-৫৫

গৃহস্থগণ ইষ্টাপূর্ত ও দান অর্থাৎ অগ্নিহোমাদি বৈদিক কর্ম, বাপীকূপতড়াগাদি নির্ম্মাণ ও যথাশক্তি পূজ্যদিগকে দ্রব্যসম্ভোগাদি প্রতিপাদনরূপ উপাসনার দ্বারা ধূমাভিমানী দেবতাদের প্রাপ্ত হন এবং তৎসময়ে পিতৃলোক ও দেবলোকে গমন করেন, কিন্তু কর্মফল শেষ হইলেই পতন ঘটে—ইহাই পিতৃযান। যেমন রেলগাড়ীতে লোক্যাল ট্রেণ ও মেলট্রেণ থাকে, সাধনমার্গেও তদ্রূপ পিতৃযান ও দেবযান। লোক্যাল ট্রেনরূপ পিতৃযানে স্বর্লোক পর্যন্ত গমন করা যায় এবং আরও সাধনার ফলে ব্রহ্মলোক বা শূন্যলোকে যাওয়া যায় অথবা তদভাবে পুনরায় পৃথিবীতে পতন ঘটে, মেলট্রেনরূপ দেবযানে গমন করিলে সাধকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি (শূন্যতাবোধ) ঘটে—মুক্তি বা নির্বাণ হয়।

বুদ্ধের মূর্তিপূজা

সাকার সাধনা ও নিরাকার সাধনার আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতের যাগযজ্ঞকেও আমরা কতকটা নিরাকার সাধনা বলিতে পারি—যেহেতু সেখানে কোন প্রকার মূর্তি গঠন না করিয়া দেবতার নামে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইত, কিন্তু সেখানেও মানসপটে থাকিত প্রাকৃতিক শক্তির একটি চিত্র এবং আকারযুক্ত অগ্নির ভিতরেই আহুতি প্রদান করা হইত। এমনকি পাতঞ্জল যোগেও নির্দেশ

দেওয়া হইয়াছে যে ঈশ্বর অথবা যে কোন ধ্যায়াকার কিছু অবলম্বন করিয়া ধ্যানযোগে সাধনা করিতে হইবে। সুতরাং মনে হয় যে, একমাত্র পাতঞ্জলদর্শিত অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিয়া শূন্যতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করার যে সাধনা—তাহাই শূন্য বা সহজ সাধনা। বৌদ্ধগণ এই শূন্যতাকে পরিহার করিয়া শূন্যতাকে আকারের ভিতরে আরোপ করতঃ যে সাধনার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী যুগে তাঁহাদের পতনের কারণ হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধরাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ মূর্তি পূজার প্রবর্তন করিয়া সাকার সাধনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং আরও অনেক সাকার তান্ত্রিক দেবতার পরবর্তী যুগে সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা তথাগত বুদ্ধের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। "খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে এই দেশে মূর্তিপূজার প্রবর্তন হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।"১

কায়সাধনা

ভারতীয় ধর্ম ও সাধনার ভিতরে একদিকে যেমন মূর্তি পূজার প্রবর্তন হইল, তেমন অপর দিকে শূন্যবাদী সাধকগণ ও কায়সাধনারূপ আরও একটি নূতন ধরণের সাধনাপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মাটি বা পাথরের মূর্তির পরিবর্তে নিজের দেহকে অবলম্বন করিয়াই সাধনা চলিতে পারে এবং এই কায়াচক্রের ভিতর দিয়াই মহাসুখ, শূন্যতা অথবা সহজ স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সাধনার ধারার ভিতর দিয়াই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি এবং ইহাই ক্রমাগতভাবে বাংলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে—ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়, বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই শূন্যত্বের বিস্তৃত আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি পরিবেশিত হইবে।

তান্ত্রিকগণ কর্তৃক এই মানবদেহ সত্যের আধার ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

১। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—তমোনাশ দাশগুপ্ত পৃঃ ২১

প্রতিমূর্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, দেহকে ভাণ্ডরূপে অভিহিত হইয়াছে। সূর্য, পাহাড়পর্বত, নদনদী, জীবজন্তু প্রভৃতিকে শিবশক্তি বলা হয় এবং এই শিব ও শক্তি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনও স্বরূপবোধই তাঁহাদের কাম্য। দেহস্থিত মেরুদণ্ডটিকে বলা হয় মেরুপর্বত এবং মেরুপর্বতের সর্বোচ্চস্থানে 'সহস্রার' এবং মধ্যদেশে 'স্বাধিষ্ঠান' 'অবস্থিত। দেহের বামদিকে অবস্থিত 'ইড়া' ও ডানদিকে অবস্থিত 'পিঙ্গলা' নাড়ীদ্বয়কে যথাক্রমে 'শিব ও শক্তি' কল্পনা করিয়া (নর ও নারী রূপ ধরিয়া) ইহার ভিতর দিয়া যে 'প্রাণ' ও 'অপান' বায়ুদ্বয় যথাক্রমে প্রবাহিত হইতেছে,' সেই বায়ু দুইটিকে মধ্যস্থলে অবস্থিত 'সুষুম্না' নাড়ীর পথে 'সহস্রারে' প্রেরণ করাই তাঁহাদের সাধনার ধারা—ইহারই নাম 'কায়সাধনা' এবং অদ্বয়লাভের পথ।

এই কায়সাধনার মূল পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে দেখা যায়— 'নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্"—৩০ অর্থাৎ নাভিদেশে অবস্থিত 'স্বাধিষ্ঠান চক্রে' সংযম (ধ্যান) করিলে মানবদেহের সমস্ত শারীরিক সংস্থানগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, জিহ্বাতন্তুর মূলে গলগহ্বরে সংযম করিলে ও সমাহিত হইলে যোগীর ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না, কণ্ঠকূপের নীচে উরঃপ্রদেশে অবস্থিত কূর্ম নামক নাড়ী অতিশয় দৃঢ় বলিয়া এখানে চিত্তসংযমের দ্বারা শরীর ও মনের যে স্থিরতা জন্মে, তাহা ব্যতীত সাধনা সম্ভব হয়না। (কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ-৩১, কূর্মনাড্যাংস্থৈর্যম্—৩২)। মাথার খুলির ঠিক মধ্যস্থলে 'ব্রহ্মরন্ধ্র' নামক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সুষুম্নানাড়ীর দ্বারা হৃদয়স্থ সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ (বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ) সেই স্থানে গিয়া স্পন্দিত হইতেছে। যোগীগণ এই পিণ্ডিত ভাস্বর জ্যোতিঃতে সংযম অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ পুরুষ (অদৃশ্যচর পুরুষ) দিগকে দর্শন করেন। (মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্—৩৩)। এমন কি কায়সংযম করিলে যোগীর এমন অবস্থান্তর ঘটে যে, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্ধান করিতেও সক্ষম হন (কায়রূপসংযমাৎ তৎগ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাহসংযোগেহন্তর্ধানম্

—২১)। এই কায়সাধনার দ্বারা পরবর্তীযুগে তান্ত্রিকগণ দেহের বিবরণ অনেক কিছু অবগত হইতে পারিয়াছিলেন—"দেহের পঞ্চস্থলে যে পাঁচটি নাড়ী আছে। এই পাঁচটি নাড়ীতে পঞ্চতথাগতের অধিষ্ঠান, মতান্তরে দেহের হৃদয়াদি পঞ্চস্থলে এই পঞ্চদেবতার অবস্থিতি।" ১

ষট্‌চক্র

এই সকল তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়াই সাধকগণ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ছয়টি চক্রের অবলম্বনকেই মহাসুখ, শূন্যতা বা সহজস্বরূপ লাভের উপায় মনে করিয়া কায়সাধনাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

পরবর্তী যুগে ধ্যানযোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি বিবিধ পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া সাধকগণ বিভিন্ন প্রকার নাদতত্ত্ব এবং দেহের বিভিন্ন সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বহু নাড়ীর সন্ধান লাভ করেন এবং ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কেই প্রধান বলিয়া ঘোষণা করেন।

বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ

এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে প্রতি পদে পদে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে নিরন্তর ও অনন্ত যে পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার কোন প্রকার উৎস আজও সর্ববাদিসম্মতরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহাই শূন্যতা। কোন বস্তুই একটি আকাশে স্থির হইয়া থাকে না, ক্রমাগত তাহার পরিবর্তন ঘটিতেছে—থাকিয়াও নাই, না থাকিয়াও আছে। অতএব সাধকগণ বিভিন্ন প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া ও নানাবিধ সাধনার ভিতর দিয়া মহাসুখ, শূন্যত্ব অথবা সহজস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই গবেষণালব্ধ পথকে 'সহজযান' আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন। এই সকল সুকঠিন সাধনতত্ত্বগুলি সাধারণ লোকের বোধগম্য করা সহজসাধ্য না হওয়াতে তাঁহারা প্রচারকার্যের জন্য

১। শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা—২য় খণ্ড—উপেন্দ্রনাথ দাস—পৃ ৩২

সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই সাহিত্যের প্রকাশই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ। সংস্কৃত সাহিত্যের আদিরূপ যেমন বেদ, বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ তদ্রূপ চর্যাগান। বেদ ও বেদান্তপ্রচারিত ব্রহ্মশক্তি বাংলাসাহিত্যে শূন্যতারূপ পরিগ্রহ করিয়া বাংলার ধর্মজগতে একটা নূতন পথের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সাহিত্যরসপুষ্ট সাধনার ধারা বাংলার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মাটিতে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রতি অঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে এই শূন্যত্বের বিজয় অভিযান—এই শূন্যময়ী মহাশক্তির প্রভাবে বাংলাসাহিত্যমাত্রই অনুপ্রাণিত। চর্যাপদের শূন্যতার ভাবধারা পরবর্তীযুগের বাংলাসাহিত্যের বিভিন্নস্তর নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, শক্তিসাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে চলিতে চলিতে আধুনিক সাহিত্যের ভিতরেও বিরাজমান।

শূন্যবাদীসাহিত্য চর্যাপদ হইতেই যে বাংলাসাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে সকলেই একমত, শূন্যতত্ত্বকে বিভিন্ন সাধনার ভিতর দিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে—সাধনাসিদ্ধি, মোক্ষ বা নির্বাণের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অদ্বয়, মৈথুন, যুগনদ্ধ, যামল, সমরস, যুগলসহজসমাধি ও শূন্যসমাধিরূপে বিবৃত।

জগতের সকল দেশেই সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে ধর্মকেই অবস্থিত দেখা যায়, এই ধর্মকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই ধর্মের অন্তরালে—সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে দেখা যায় যে, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি জনগণের মানসদৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়েনা বলিয়াই ধর্মকে সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, এতদ্ব্যতীত নীরসবস্তুকে সরস করিবার আর কোন উপায় নাই। বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পার হইয়া বাংলাসাহিত্য 'শূন্যতত্ত্ব'রূপ ধর্মের জয়তিলক ললাটে ধারণ করিয়াছিল এবং এই প্রবেশপত্রের বলেই সাহিত্য জগতে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল।

শূন্যতার স্বরূপ

বেদবেদান্তোপনিষদ্‌পুরাণষড়দর্শনবৌদ্ধদর্শনাদি আলোচনান্তে শূন্য-তত্ত্বের কথা ভাবিতে গেলেই সৃষ্টির পূর্বাবস্থার কথাই মনে আসে এবং শুধু উক্ত শাস্ত্রসমূহই নহে, যৌগিক সৃষ্টি, পরিণাম সৃষ্টি বা বিবর্তবাদ সৃষ্টির সর্বত্রই দেখা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বাবস্থা প্রলয় বা শূন্য—ইহাই স্বাভাবিক। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি বা বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সৃষ্টি রহস্যের মূল হইতেছে এখন একটি ভাবনা—যখন বীজও ছিলনা, বৃক্ষও ছিলনা—শূন্যময় অবস্থা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চর্যাপদ

সাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব

চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় যে, ইহার একদিকে যেমন তৎকালীন সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি, বাংলা দেশের তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ, বাঙ্গালী জাতির সেই যুগের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার পরিচয়, স্থূল জীবনের চিত্র, নৃত্যপরায়ণা নারীর সুষমামণ্ডিত বর্ণনা, প্রেমিক প্রেমিকার বিবিধপ্রকার সম্ভোগ ও বাসনা চরিতার্থতার ভিতর দিয়া বিচিত্র কামকলারূপ আদিরসের পরিবেশনে বিচিত্র সাহিত্য স্বষ্টির অর্থাৎ মানব জীবনের সর্বপ্রকার পার্থিব বিবরণের ভিতর দিয়া সাহিত্যের স্বষ্টি হইয়াছে। অপর দিকে ধ্যানধারণা, নানাবিধ সাধনা ও উপাসনার বিবরণ, হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধদের বিচিত্র চিন্তা-জগতের ভিতরে মূর্ত ও অমূর্ত অনুভূতি, দর্শনের জটিলতম তত্ত্ব ও সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রভৃতি নীরস ধর্মীয় নীতিকথাগুলিকে চর্যাকারগণ তত্ত্বের মরুভূমির মধ্যে নিহিত রাখিয়াই বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহাদিগকে রসধারা সিঞ্চনে রসময় করিয়া তুলিয়াছে, ইহাই চর্যাপদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। নিত্যদৃষ্ট জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খতাকে চিত্রে রূপায়িত করাতে গীতিঝঙ্কারের সহযোগিতায় অপূর্ব রূপব্যঞ্জনার স্বষ্টি হইয়াছে। তাই ধর্মকথা হইয়া উঠিয়াছে জীবন-অভিজ্ঞতার স্রোতে পরিশ্রুত ও ব্যক্তিরসে জারিত এক অপূর্ব মন্ময়স্বভাব গীতিসাহিত্য। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব শূন্যবাদকে অরূপ, করুণা, আনন্দ, মহাসুখ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে চর্যাগানের ভিতরে সাহিত্য-রসসিঞ্চিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

চর্যার উৎস সাংখ্য

ভারতে প্রচলিত সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি সাধনার পদ্ধতি চর্যাপদের সাহিত্যে প্রকাশ

পায় নাই। এই সকল দার্শনিক তত্ত্বসমূহের নানাবিধ গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে যোগের বিবিধ প্রকার কৌশলগুলির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ফলে এবং তথাগত বুদ্ধদেব কথিত শূন্যতত্ত্ব বা নির্বাণতত্ত্বের আলোচনার ভিতর দিয়া যে গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহারই ফলে যে নানাপ্রকার সাধনপদ্ধতি ও ভাবধারা বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই সকল মতামতগুলি তান্ত্রিকতা সংযোগে একটি শক্তিশালী ধর্মমত ও সাধনাপদ্ধতিতে পরিণতি লাভ করে—তাহারই ফল আমরা চর্যাপদের গীতধারার মধ্যে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান দেখিতে পাই। চর্যাপদের ভিতরে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা দেখা যায়, তাহার মূল উৎস সাংখ্যদর্শন এবং চর্যাপদের বর্ণিত বিভিন্ন সাধনার পদ্ধতির ভিতরেও দেখা যায় যে, পাতঞ্জলযোগোক্ত 'অষ্টাঙ্গযোগ' সাধনার দ্বারা স্বরূপে অবস্থান বা সহজ শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণই এই চর্যা সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। এই চর্যাপদই বাংলা ভাষার আদি সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব। এই সকল ধর্মমতগুলি সাহিত্যরসসিঞ্চিত অবস্থায় চর্যাপদ নামে চলিতে লাগিল।

আদি গণসাহিত্য

শুধু ইহাই নহে এই চর্যাসাহিত্য রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা প্রভৃতি চরিত্রের বিবরণ প্রকাশের পরিবর্তে সেকালের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আচার আচরণের সহজ-সরল ও স্বচ্ছ বর্ণনার ভিতর দিয়া সাহিত্যের আসর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাই বাংলার আদিম গণসাহিত্য। এখানে আছে কষ্ট। কল্পনার পরিবর্তে সাধারণ লোকের জীবন ও জীবিকা, কার্য ও বিশ্রাম, পারিবারিক অবস্থার চিত্র, খাদ্য ও বাসনপত্রের বর্ণনা, সঙ্গীতের উপকরণ, অপরাধ, ও বিচার পদ্ধতির বিবরণ প্রভৃতি। এই চর্যাপদে দেখা যায় কষ্ট-কল্পনাবিহীন প্রেম ও সৌন্দর্যের সাবলীল বর্ণনা—আকাশের নীচে আরণ্য সৌন্দর্যে পরিপূর্ণা লীলাময়ী শবর বালিকা ও তাহার খোঁপায়

গোঁজা শিখীপুচ্ছ, বক্ষদেশে শোভা-বিভূষিতা দোলায়মানা গুঞ্জার মালা, কর্ণে কুণ্ডল; আবার দেখা যায় যোগী যোগিনীর মুখকমল চুম্বনের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, প্রেমিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রেমিকা 'ডোম্বীকে সাঙ্গা' করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার জন্য লজ্জা, ভয় ও কলঙ্ককে উপেক্ষা করিয়াছে। তাই এখানে প্রেমের নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ধর্মীয় বিবর্তনের পথেই বাংলার সাহিত্যরস জয়যাত্রা শুরু করিয়াছে।

দেহকে বৃক্ষকল্পনা

বিভিন্ন চর্যাপদের ভিতরে সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগের সম্বন্ধ রহিয়াছে—

"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চিএ পইঠো কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই।
সুখ দুখেঁতে নিচিত মরি আই॥ ধ্রু
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥ ধ্রু
ভণই লুই আম্হে সাণে দিঠা।
ধমন চমন বেণি পণ্ডি বইঠা॥ ১ (চর্যাপদ—লুইপাদ)

দেহ বৃক্ষবিশেষ, ইহার পাঁচটি শাখা আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল। লুই বলেন,—মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া গুরুর নিকট হইতে উহার পরিচয় জান। যতপ্রকার সমাধিনামক ধর্মানুষ্ঠান আছে, তাহা অভ্যাসের দ্বারা কি ফল লাভ হইবে? সমাধি করিয়াও দেখা যায় যে, সুখদুঃখ ভোগ ও মৃত্যুবরণ করিতেই হইবে। নানারূপ ছন্দের বন্ধনমুক্ত অবস্থায় করণের পরিপাটিত্যাগে শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে

অবলম্বন কর। লুই বলিতেছেন—ধ্যানে আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি যে, আমি ধমন ও চমনরূপ দুই পিড়ার উপরে আসীন অবস্থায় বিদ্যমান।

এই চর্যার মূল উৎস আমরা দেখিতে পাই সাংখ্যদর্শন এ তৎসমর্থক উপনিষদের ভিতরে এবং সাংখ্যমত প্রতিষ্ঠারই সূচনা বলিয়া এই চর্যাটি মনে হয়। কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর প্রথম শ্লোক—

"ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্ শাখো এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে।
তদু নাত্যেতি কশ্চন্, এতদ্বৈবৎ॥

মানুষের স্থূলদেহ ও মন অবিদ্যাপ্রভাবে ঊর্ধ্বমূল ও অবাক্ শাখাযুক্ত অবস্থায় সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাকথিত ওঁকাররূপ শুক্র, ব্রহ্ম বা অমৃতকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিশক্তি বিরাজিত —সেই শক্তিকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না—এই যাহা, সেই তাহা অর্থাৎ তথতাই তথতা।

বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত সাংখ্যসারঃ নামক গ্রন্থ হইতে বৃক্ষের সহিত দেহের উপমাকৃত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

অব্যক্তবীজপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্।
মহাহঙ্কারবিটপ ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ॥
মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্।
সদাপর্ণঃসদাপুষ্পঃশুভাশুভফলোদয়ঃ॥
আজীবসর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষসনাতনঃ।
এতচ্ জ্ঞাত্বাচ তত্ত্বেন জ্ঞানেন পরমাসিনা॥
ছিত্ত্বা চাক্ষরতাং প্রাপ্য জহাতি মৃত্যুজন্মনী।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ :—পূর্বভাগে

ব্রহ্মবৃক্ষ নামক এক সনাতন মহাহঙ্কার বৃক্ষ আছে, উহা প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন, উহার বুদ্ধিতত্ত্ব উহার স্কন্ধস্বরূপ, ইন্দ্রিয়াঙ্কুর উহার কোটর, মহাভূত উহার প্রশাখা, বিশেষ উহার প্রতিশাখা, উহাতে সর্বদা পত্র ও পুষ্প বিরাজিত থাকে—শুভ ও অশুভ এই বৃক্ষের ফল, উহা সর্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞানরূপ পরম অসির সাহায্যে উহাকে ছেদন করিয়া মৃত্যু ও জন্মের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যতত্ত্বকেই চর্যাকার লুইপাদ এই চর্যাপদে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং উহাকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। মুনিদত্তের টীকাতে পঞ্চশাখাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"রূপাদয়ঃ পঞ্চস্কন্ধ" অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পাঁচটি দেহবৃক্ষের শাখাস্বরূপ, আবার বলা হইয়াছে—

"ষড়িন্দ্রিয়ানি ধাতবো বিষয়াশ্চ গ্রাহ্যগ্রাহকো গ্রহনোপলক্ষিত-
পল্লবত্বাৎ কায়াতরুবরত্বেন গৃহীতঃ"।

গ্রাহ্যগ্রাহকভাবে ছয়টি ইন্দ্রিয়, বীজ ও বিষয়কে পল্লবরূপে কল্পনা করিয়া শরীরকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে। কিন্তু মূল পংক্তির ভিতরে স্থূলদেহের পাঁচটি উপাদান—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ছাড়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আমরা অন্য কিছু কল্পনা করিতে পারি না, এতদ্ব্যতীত টীকাতে ছয়টি ইন্দ্রিয়, ধাতু ও বিষয়াদিকে দেহবৃক্ষের পল্লব বলিয়া উল্লেখ করাতে সাংখ্যোক্ত শ্লোকটির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

"চঞ্চল চিএ পইঠোকাল"—টীকাতে দেখা যায়—

"প্রকৃত্যাভাসদোষবশাৎ চাঞ্চল্যতয়া প্রাকৃতসত্ত্বেনাচ্যুতিরূপো হি
রাহুঃ। স এব কাল।"

অর্থাৎ স্বাভাবিক দোষে যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া রাহুর মত কাল জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলে—অবিদ্যা সাগরে জীব হাবুডুবু খাইয়া মরে। ন্যায়দর্শনের মতে—

"জন্যানাং জনকঃ কালঃ জগতামাশ্রয়ে মতঃ"

অর্থাৎ কালই সৃষ্টির আদি ও জগতের আধারস্বরূপ (ভাষাপরিচ্ছেদে ১।৪৫) আরও দেখা যায়—"কালীর সহিত কালের রহিয়াছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই কাল শুধু কাল নয়, ইহা মহাকাল। মহাকাল ও মহাকালী নিত্যযুক্ত"[১]। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টাই এই চর্যাপদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত মন্ত্রজপ, ধারণা বা ধ্যানের সাহায্যে সমাধিলাভও যেমন দুষ্কর, তদ্রূপ ইহা দ্বারা কালকে জয় করাও অসম্ভব। গুরুর নির্দিষ্টপথে যোগাঙ্গকথিত যম (অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপ্রতিগ্রহা যমাঃ—সাধনপাদঃ—পাতঞ্জলসূত্র—৩০) এবং নিয়মের (শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ—সাধনপাদঃ—৩২) সহযোগে জীবের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি দূর না হইলে কোন প্রকারেই মহাসুখলাভ অর্থাৎ নির্বাণ ও শূন্যতাবোধ সম্ভব হইবে না।

'মহাসুখ' শব্দটি বিচার করিলে দেখা যায় যে, মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে সুখ অথবা নির্বাণকে চরমসত্তা, ধর্মকায় এবং স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুখ কৃষ্ণবর্ণ, ইহা হরিদ্রাবর্ণ, ইহা রক্তবর্ণ, ইহা শুভ্র, ইহা সবুজ, ইহা সমগ্র বিশ্ব, ইহা প্রজ্ঞা, ইহা উপায়, ইহা স্বয়ং সংযোগাবস্থা, ইহা অস্তিত্ব, ইহা নাস্তিত্ব, ইহা ভগবান বজ্রসত্ত—

"In the Hevajra Tantra it has been said that sukha or bliss is the ultimate reality, it is the dharmakaya, it is the Lord Buddha himself. Sukha is black, it is yellow, it is red, it is white, it is green, it is blue, it is whole universe ; it is Prajna, it is Upaya, it itself is the union, it is existence, it is non-existence, it is the Lord Vajrasatta."[২]

পরবর্তী কালে নির্বাণের সত্তারূপকে মহাসুখ অথবা চরমতম আনন্দরূপে তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে—

১। সাধক কমলাকান্ত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃ ৬২

২। Obscure Religious Cult—S. B. Dasgupta—Pages 37, 36.

"The positive aspect of Nirvana as supreme bliss or Mahasukha was emphasised in the Tantric Buddhism and in later times Nirvana or Mahasukha were held to be identical."[১]

তৈত্তিরীয়োপনিষদে দ্বিতীয় বল্লীতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, মন ও বাক্যের অগোচর আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইলে আর সংসারে কোন ভয়ের কিছু থাকে না—বিশ্বই আনন্দময় বলিয়া অনুভূত হয়—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"

"সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই"—অনেকে এই সমাধি বলিতে সবিকল্প ও নির্বিকল্প নামক যোগশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়কে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু টীকাকার ইহাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সমাধয়ঃ ইন্দ্রিয়নিরোধায় নির্দিষ্টাঃ। তৈরত্র সমাধিভিঃ সুখরহিতত্বাৎ দুষ্করপোষণাদিনিয়মৈশ্চ কিঞ্চিৎ ন ক্রিয়তে। এবং সুখাবঘাতেন বুদ্ধতীর্থিকো বহূনি দুঃখান্যনুভূয় উৎপদ্যন্তে ম্রিয়ন্তে চ"—যোগশাস্ত্রের মতে যমনিয়মাদি সাতটি স্তর অতিক্রমের পরে সমাধিস্তরে পৌঁছান যায়, তাহা না করিয়া শুধু একবারেই সমাধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া মুক্তিলাভ করা যায়, এই মত পোষণকারী সমাধির ভিতরে কোন সুখ বা উৎসাহ না পাইয়া বহু সাধক ভুল পথে গমন করিয়া দুঃখে কষ্টে মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকেন। উক্ত সমাধি নিয়া আলোচনা করিলে মনে হয় যে, এই মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে।

এইখানে সহজ সাধনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—এই সহজ সাধনার ভিতরে দেখা যায় যে, দেহের সহজাত ইন্দ্রিয়, বৃত্তি, ক্লেশ প্রভৃতি বিষয় হইতে যে বাসনাকামনার সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে মুক্তি আনিয়া দিতে পারে এমন জীবনচর্যাকে অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপেই সাধক লাভ করিবেন নির্বিকল্প মহাসুখ তন্ময়তার সন্ধান অর্থাৎ পাতঞ্জল যোগের মতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"

১। Obscure Religious Cult—S. B. Dasgupta—P. 36

(সমাধিপাদঃ—২)। সহজাত বৃত্তি বা ক্লেশের নিবৃত্তির জন্য যে সাধনা, তাহাই সহজাত সাধনা অর্থাৎ সহজ সাধনা।

বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আশাই মানুষের যাবতীয় দুঃখের কারণস্বরূপ, এই বন্ধনের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে সর্বধর্মরহিত সহজ আনন্দস্বরূপ মহাসুখ লাভ সম্ভব হইবে না,—

"সর্বধর্মানুপলম্ভরূপং সহজানন্দমহাসুখম্"। (টীকা)

সংসারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সংসার অসৎ অর্থাৎ জগতের কোন অস্তিত্বই নাই—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিহেতু আমরা সংসারের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই অস্তিত্বহীনতা উপলব্ধি হইলেই, আমরা ভোগপ্রবৃত্তিকে অসার বলিয়া অনুভব করিতে পারি এবং পরিত্যাগ করিতে পারি। ইহাই বাসনার কবল হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়।

"এড়িএউ…লেহুরে পাস"—লুইপাদ তাই বলিতেছেন যে, বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা ত্যাগ করিয়া শূন্যবস্তুকে কাম্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ কর। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ আসনে বসিবে অর্থাৎ যোগের তৃতীয় অঙ্গ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে এবং প্রাণায়ামের পথে অগ্রসর হইবে। "ধমন চমন বেনি পণ্ডি বইন" এখানে আলি-কালি, লোকজ্ঞান, লোকাভাস, রবিশশী অর্থাৎ গ্রাহ্য বা ভব, এবং গ্রাহক বা মনও ইন্দ্রিয়াদির উপরে আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ('স্থিরসুখমাসনম্'—পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদঃ—৪৬)।— এই অর্থে ধমন ও চমনকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাস্থ অহঙ্কার শব্দটির উপরে কোন গুরুত্ব মোটেই দেওয়া হয় নাই, এই 'অহঙ্কার' শব্দটি আলোচনা করিলেই প্রকৃত অর্থ উদ্ভাসিত হইবে—"ধমনং শশীশুদ্ধ্যালিনা চমনং রবিশুদ্ধ্যা কালিনা তত্নভাভ্যামাসনং কৃত্বা স্বদেবতাহংকারোপবিষ্টঃ সন্ সাক্ষাৎ কৃতম্"। (টীকা) এখানে ধমন ও চমন শব্দদ্বয় প্রকৃতি ও বুদ্ধিকে বুঝাইতেছে এবং সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ও বুদ্ধি এই ভিত্তিদ্বয়ের উপর অহঙ্কার অবস্থিত থাকিয়া সৃষ্টিকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত রহিয়াছে

—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহংকারো-ঽহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিবর্গঃ"—(সাংখ্যসূত্রম্—১।৬১)—সুতরাং দেখা যায় যে, সৃষ্টি কার্যের ভিত্তি হইল সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতি ও বুদ্ধি তাহা হইতে জাত অহংকার এবং এই অহংকার হইতে মন, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।

"আম্হে সানে দিঠা"—এখানে সাধক লুইপাদ আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আম্হে শব্দটি অহং অর্থাৎ অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারকে বুঝাইতেছে—এইরূপ অর্থ হওয়াও বিচিত্র নহে এবং সৃষ্টির মূল অহংকার ধ্যানবলে যোগী প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সুতরাং এই চর্যাপদটির ভিতরে পাঞ্চভৌতিক দেহের ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য যোগশাস্ত্র-কথিত যম, নিয়ম ও আসনের বর্ণনা করিয়া প্রকৃতি, বুদ্ধি ও অহংকারের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

চর্যাকারগণ ইহার পরে মনকে প্রাধান্য দিয়াছেন, মন শান্ত না হইলে অর্থাৎ চিত্ত লয় না হইলে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না—

"নিসিঅ অন্ধারী সুসার চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা॥
মার রে জোইয়া মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণ পবণা॥ ধ্রু
ভব বিন্দারহ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ-নাশক॥
কলা মুসা উহ ন বাণ।
গঅনে উঠি চরঅ অমন ধাণ॥ ধ্রু
তবসে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল,
সদ্গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল॥ ধ্রু।
জবেঁ মুষা এর আচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধ ন ফিটঅ॥ ধ্রু॥ (২১)
চর্যাপদ—ভুসুকপাদ)

অন্ধকার রাত্রিতে যেমন চঞ্চল মূষিক যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়া মিষ্টাদি দ্রব্য আহার করে, তদ্রূপ তমোগুণ সম্পন্ন বাসনাকামনার দাস যে মানুষ, তাহার মন রূপাদি বিষয়সমূহে সঞ্চরণ করিয়া বোধিচিত্তের সাধারণ অমৃতধারা ভক্ষণ করে। বাসনাচঞ্চল চিত্ত মূষিকের মত ভবস্বরূপ স্বীয় কায় বিদীর্ণ না করিয়া সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। গুরুর উপদেশে মূষিকের প্রকৃতি দোষ অবগত হইয়া তাহার বিনাশ কর, ভুসুকুর মতে ইহা না করিলে ভববন্ধনের বাঁধন কাটিবে না। এইখানে মূষিক বলিতে কাল বা মরণকে বুঝাইতেছে—চঞ্চল মনই বাসনাকামনার ক্ষণিক স্থায়িত্বের কারণ—যখন ইহা শূন্যে বিলীন হয়, তখন ইহার কোনপ্রকার বর্ণ থাকে না—

"The rat is time or death himself (i.e. the fickle mind constructs all temporal existence)—but in it when there is no colour, when it rises to the void, it moves there and drinks nectar".[১]

আরও টীকাতে দেখা যায় যে, বোধিচিত্তরূপ অমৃত আস্বাদনে রত মূষিক বা চিত্তপবন নিজে এই শত্রুকে ধ্বংস না করিতে পারিলে নির্বাণ বা মুক্তি সম্ভব নহে—"সংবৃত্তিবোধিচিত্তং তুনাশকত্বেন স এব চিত্তমূষকঃ কালঃ, তস্য পিণ্ডগ্রাহানুভেদে বিচারেণ ভো যোগিন্ বর্ণোপলম্ভোপদেশো ন বিদ্যতে। গগনমিতি গুরুসম্প্রদায়াৎ মহাসুখকমলবনং গত্বা পুনরাগত্য পরমার্থবোধিচিত্তঃ মধুপানাস্বাদং করোতি।" (টীকা)

পাতঞ্জলযোগেও রহিয়াছে ঠিক এই ধরণের কথা—চিত্তের বৃত্তি-নিরোধকেই যোগ বলা হয় এবং চিত্তের লয় হইলে অর্থাৎ অসংখ্য চিত্তবৃত্তিগুলি ও ক্লেশগুলি দূরীভূত হইলেই স্বরূপ বা কৈবল্যলাভ করা যায়—শূন্যে অবস্থান ঘটে—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—২, "তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্"—৩ (পাতঞ্জলসূত্রে সমাধিপাদঃ)। সুতরাং দেখা যায় পূর্বতন ভারতীয় যোগশাস্ত্রের অনুসরণক্রমেই চর্যাগানের ভিত্তি রচিত হইয়াছে এবং যোগ ব্যতীত এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী আজ

১। Obscure Religious Cult—S. B. Dasgupta—P. 42

পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারে,—ইহাই সহজ পথ।

সাঙ্কমতই সাংখ্যমত এবং চাটিলই কপিল

সাংখ্যমত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ আরও একটি চর্যার ভিতরে পাওয়া যায়—

"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ ধ্রু ॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই ॥ ধ্রু ॥
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
আদ অদিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ॥ ধ্রু ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূরম মা জাহী ॥ ধ্রু ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী ॥ (৫)

(চর্যাপদ—চাটিল্লপাদ)

এই নদীস্বরূপ বৈষয়িক জগতে দিবারাত্র বৈষয়িক তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ইহাকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে এবং বিবিধ দোষের প্রবাহ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার দুইদিক দোষের পঙ্কে অনুলিপ্ত এবং মধ্যেও থৈ পাওয়া যায় না, ইহা উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য। ললনারসনাদি আভাসত্রয় দিনরাত্রি ব্যাপিয়া, এমনকি সন্ধ্যাসময়েও সাগরের মত এক সময়ে বিষয় কল্লোলে মাতিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই লয় পাইতেছে এবং প্রকৃতির দোষে আচ্ছন্ন রহিয়াছে—"পূর্বোক্তললনারসনাদ্যাভাষত্রয়ং পারাবারগম্ভীরত্বেন নদীসন্ধ্যায়া বোদ্ধব্যং। দিবারাত্রৌচ সন্ধ্যায়াং বিষয়োল্লোলমুৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি চ। অতএব গহনং ভয়ানকং। প্রকৃতি দোষাৎ গম্ভীরং। ষট্‌পথদ্বারেণ মূত্রপুরীষাদিকং চ প্রবহতীতি। অতএব

অন্তদ্বয়ং পারাপারং বামদক্ষিণং চিখিলমিতি প্রকৃতিদোষপঙ্কানুলিপ্তং।" (টীকা)

বৈষয়িক পঙ্কের উর্ধ্বে যে প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, চাটিল তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই ধর্মপথ গমনের হেতুপথেরও সন্ধান দিয়াছেন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোকে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে পারে। মোহতরুকে ছেদ করিয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ভিতরের সমস্ত রকম অস্তিত্বপূর্ণ ভ্রম দূর হইয়া যাইবে—প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকত্ব উপলব্ধি হইবে, ইহার ফলে একমাত্র শূন্যত্ব বা অদ্বয়তত্ত্ব অনুভূত হইবে। স্বাধিষ্ঠান ও প্রভাস্বর নামক তত্ত্বদ্বয়ের ভিতরে সংযোগপথ অবলম্বনের দ্বারাই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। বাম ও দক্ষিণে অবস্থিত সূর্য ও চন্দ্র নামক নাড়ীদ্বয়ের সহায়তায় বায়ুর নিরোধ ঘটাইলেই শূন্যতাবোধ আসিবে—"স্বাধিষ্ঠান প্রভাস্বরয়োরৈক্যং সংক্রমং জিনস্য সত্ত্বানাং সংসারসমুদ্রপারকরণায়। ভো যোগিন্। তত্রারূঢ়ে সতি বামদক্ষিণচন্দ্রসূর্যাভাসৌ পূর্বং বজ্রচাপং নিরোধাৎ, পুনরপি পশ্চাদ্ভাবং মা চিন্তয়িষ্যথ" (টীকা)। মোহতরু বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে গেলে এবং তাহা কিভাবে ছেদন করা যায়, তাহার বর্ণনা স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য তৃষ্ণাদয়ো হেতবইত্যোবেত্য
তাংশ্ছিন্দি দুঃখাৎ যদি নির্মুমুক্ষা কার্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষাদ্ধি॥
দুঃখক্ষয়ো হেতুপরিক্ষয়াচ্চ শান্তংশিবং সাক্ষিকুরুস্ব ধর্মম।
তৃষ্ণাবিরাগংলয়নং নিরোধং সনাতনং ত্রাণমহার্যমার্যম্॥
যস্মিন্ জাতির্নজরা ন মৃত্যুঃ ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্নপ্রিয়প্রয়োগঃ ক্ষমংপদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতংতম্॥"

(সৌন্দরানন্দকাব্যম্—অশ্বঘোষ—১৬।২৫-২৭)

সুতরাং তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাপ্রকার জন্মের হেতু এইটি মনে মনে চিন্তা করিয়া মুক্তিপ্রয়াসী জীব সেই তৃষ্ণা, বাসনা প্রভৃতি মোহবৃক্ষকে ছেদন করিবে, ইহার ফলে তৃষ্ণারূপ কারণের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্মও রহিত হইবে।

তৃষ্ণারূপ হেতুর লয় হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। সুতরাং ‘ধর্মকে’ শরণ ও প্রত্যয় করিবে—এই শান্তিময় মঙ্গলময় ধর্মের শরণ লইলেই বৈরাগ্য আসিবে। এই ধর্মের গুহাতে সর্বধর্মের নিরোধ হয়। ইহাই সনাতন মত, ইহাই মুক্তি, ইহাকে কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই ধর্মের পথে মৃত্যুজরাদি লুপ্ত হয়, মৃত্যু, ব্যাধি, শত্রুসমাগম, নিরাশাও প্রিয়বিরহ নাই, ইহাই চরম ও অচ্যুত।

তথাগত বুদ্ধও এই তৃষ্ণাকেই গৃহকারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই তৃষ্ণা বিদূরিত অবস্থায় আর গৃহ বা গৃহকারকের অস্তিত্বের অভাব দেখিতে পাইয়া শূন্যত্ববোধ অনুভব করিয়াছেন—

“গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসঙ্খিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানংখয়মজ্‌ঝগা।”
(ধম্মপদ—১৫৪)

এই মোহতরু অর্থাৎ বিষয় আবরণস্বরূপ হইয়া জ্ঞান লাভের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায় বলিয়াই সংবৃতিবোধিচিত্তবৃক্ষকে ফাড়িয়া অর্থাৎ বিষয়গ্রহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যুগনদ্ধরূপ পরশুর সাহায্যে দৃঢ়ভাবে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। “মোহতরুং বিষয়ং ব্যাবৃত্তিবশাৎ তমেবসংবৃতি-বোধিচিত্তবৃক্ষং পাটয়িত্বা তস্য বিষয়গ্রহং খণ্ডয়িত্বা সত্তালোকং পাটকেনসহ একীকরণং ঘটয়তি।” (টীকা)

এই মতে চলিলে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বৈতমতের (বাম ও ডাহিন) মোহে আচ্ছন্ন হইবে না, এই প্রকৃতি ও পুরুষের বিযুক্ত অবস্থা অর্থাৎ অদ্বয় বা শূন্যত্বকে অবলম্বণ করিতে হইবে—এই ভাবেই বুদ্ধত্ব লাভ ঘটিবে—বেশী দূরে নহে।

“ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম্ গটই” “পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর স্বামী”—এইখানে চাটিল নামক অনুত্তর স্বামী সাঙ্কমত গঠন করিয়াছেন, ইহাই বুঝাইতেছে। এখানে ‘সাঙ্ক’ বলিতে আমাদের মতে প্রচলিত মতবর্ণিত

'সাঁকো' শব্দকে না বুঝাইয়া 'সাঙ্ক' শব্দ 'সাংখ্য' শব্দের পরিবর্তিত রূপ এবং সাংখ্যকার 'কপিলের' নামই ধ্বনি পরিবর্তনের ভিতর দিয়া 'চাটিল' রূপে পর্যবসিত হইয়াছে। মনে হয় 'কপিল' শব্দের 'ক্' 'চ্'তে এবং 'প্' 'ট্'তে পরিণত হইয়া 'চাটিল' শব্দে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ব হইতে ধ্বনিতত্ত্বের কতকগুলি রীতি আলোচনা করা হইয়াছে এবং যুক্তিরও অবতারণা করা হইয়াছে, ইহা অবশ্য সুধিজন বিবেচ্য।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বর্ণ-মালার প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত ভাষাতে 'চ বর্গ' নাই—শুধু 'ক-বর্গ'ই আছে এবং 'চ বর্গ' নূতন সৃষ্টি। পানিনির মতে 'অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ' এবং "ইচুযশানাং তালু" এই দুইটি সূত্র বিচার করিলে মনে হয় যে 'ক্' কণ্ঠে উচ্চারিত না হইয়া তালুতে উচ্চারিত হইলে 'চ্' এর আকার ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত 'চোঃ কুঃ' এই সূত্রের ভিতর দিয়া 'ক্' কিরূপে সন্ধির নিয়মে 'চ্ তে পরিণত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আছে—যথা, বাক্+ঈশ=বাচ্+ঈশ। এবার ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের মতে বর্ণগুলির বিবরণ ও তদনুযায়ী যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

পুরঃ কণ্ঠ্য (Palatal)—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ (k, kh, g, gh, n)
কণ্ঠ্য বা পশ্চাৎকণ্ঠ্য—(Velar) ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ (q, qh, *g*, gh, *n*)
কণ্ঠৌষ্ঠ্য—(Labiovelar) ক্ব, খ্ব, গ্ব, ঘ্ব, ঙ (qw, qwh, *g*w, gwh, *n*)
দন্ত্য ও দন্তমূলীয় (Dental and Alveolar)—ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ (t, h, d, dh, n)
ওষ্ঠ্য (Labial)—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ (p, ph, b, bh, m)

"তবে 'ই, ঈ, এ'—এই তালব্য স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে থাকিলে মূল ভাষার কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি আর্য শাখায় তালব্য ধ্বনিতে (নূতন সৃষ্ট চ বর্গে) পরিণত হইয়াছে। এই ধ্বনি পরিবর্তন কোলিৎসের সূত্র (Colltitz' Law) নামে পরিচিত।"[১]

১ ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন, পৃ—৬৪,৬৬

"We see therefore that the original ten. and the ten-aspirates have fallen together in the old Germanic language and are represented alike by hard spirants ; i, e, p, t, k, and ph, ths. khs are represented by old Germanic e. g. Gothic spirants f, p, x, (pron. ch)"

"Dental consonants, t, d (Sk. ত, দ,) pronounced by the contact between the tip of the tongue and the ridge of the teeth. The contact takes place at a variety of points in the semicircle of the ridge Hence the variation in dental consonants in all languages. ত, দ, ট, ঠ, (t, d, t, th)"[১]

এতদ্ব্যতীত ভারতীয় প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই সাংখ্যমতকে গ্রহণ করিয়াছে এবং সর্বসম্মতরূপে কপিলকে আদিবিদ্বান (অনুত্তরস্বামী) বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। সুতরাং 'সাঙ্ক' শব্দ 'সাংখ্য' এবং 'কপিল' শব্দ 'চাটিল'রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে—ইহা মোটেই যুক্তি-বহির্ভূত নহে।

"দুই আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী"—এখানে এই ছত্রের ভিতর দিয়া এই প্রকাশ পাইতেছে যে, সৃষ্টি প্রবাহের একদিকে প্রকৃতি ও অপর দিকে পুরুষ যুক্ত অবস্থায় থাকিয়া মোহতরু গঠন করিয়াছে, এই মোহতরুকে সাধক যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে পান, তখনই সমস্ত অস্তিত্বের জ্ঞান নষ্ট হইয়া শূন্যতাকে অবলম্বন করেন। টীকাতে দেখা যায় প্রকৃতিদোষের জন্য ভবনদী অত্যন্ত গভীর এবং দুই তীর প্রকৃতি-দোষরূপ পঙ্কের দ্বারা অনুলিপ্ত ("প্রকৃতি দোষাৎ গম্ভীরং", "চিখিলমিতি প্রকৃতি দোষপঙ্কানুলিপ্তং")। সাংখ্যের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই যে অযথার্থ জ্ঞান হইতেই ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্য—এই সাতটি রূপের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় এবং সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তির কারণস্বরূপ পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়, অষ্ট বিংশতি প্রকার অশক্তি, নয় প্রকার তুষ্টি এবং আট প্রকার সিদ্ধি,—এই

১। Introduction to Comparative Philology P.D. Gune, p 41. Appendix—P. 67

পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয় সর্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহার ফলেই শূন্যতার পরিবর্তে অস্তিত্বের প্রত্যয় ঘটে

"এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণ-বৈষম্যবিমর্দাওস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥৪৬
পঞ্চবিপর্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতির্ভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥৪৭" (সাংখ্য কারিকা)

প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; এই তিনটি গুণের পরস্পর বৈষম্যের ফলে এই পঞ্চাশটি প্রত্যয় সর্গ অর্থাৎ প্রকৃতি দোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি দোষকে আরও তথ্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিপর্যয়কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা—
১। আট প্রকার তমঃ ২। আট প্রকার মোহ ৩। দশ প্রকার মহামোহ ৪। অষ্টাদশ প্রকার তামিস্র ৫। অষ্টাদশ প্রকার অন্ধতামিস্র

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রশ্চ ॥৪৮" (সাংখ্য কারিকা)

পাতঞ্জল যোগে ইহাদিগকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চক্লেশরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—
"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ" (সাধনপাদঃ—৩)

অশক্তির উৎপত্তি হয় বুদ্ধিবধ হইতে অর্থাৎ একাদশটি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অসামর্থ্যতার দরুণ একাদশ অশক্তির সৃষ্টি এবং তুষ্টি ও সিদ্ধির বৈপরীত্যবশতঃ সপ্তদশপ্রকার বুদ্ধির বধ সম্পাদিত হয় অর্থাৎ স্বকার্যে অক্ষমতা ঘটে। এইরূপে মোট ২৮ প্রকার অশক্তি উৎপন্ন হয়—

"একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টাঃ।
সপ্তদশবধা বুদ্ধে বিপর্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্"। ৪০ (সাংখ্য কারিকা)

প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য নামক আধ্যাত্মিক তুষ্টি ৪ প্রকার এবং বিষয়বৈরাগ্য বশতঃ তুষ্টি ৫ প্রকার —মোট নয় প্রকার তুষ্টি—

"আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ ॥"৫০ (সাংখ্য কারিকা)

প্রত্যয়সর্গের ভিতরে বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টিকে 'অঙ্কুশ' বলা হয়, যেহেতু ইহারা মুক্তির প্রতিবন্ধক, এতদ্ব্যতীত অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠ, তদর্থবোধ, পঠিত বিষয়ের মনন, তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য আলোচনা, বিবেক জ্ঞানের পরিশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নামক তিন প্রকার দুঃখ—এই আটটি সিদ্ধি নামে কথিত—

"ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধ।"৫১
(সাংখ্য কারিকা)

এই পঞ্চাশ প্রকার প্রকৃতি দোষযুক্ত মোহগুরুকে ছেদ করিয়া ইহাদের পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিভক্ত অবস্থায় অস্তিত্বের অভাববোধে প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকত্ব জ্ঞানের ভিতর দিয়া শূন্যকে প্রতিষ্ঠাই সহজ পথ। এইরূপ তত্ত্বাভ্যাসের ফলে—"আমার কোন ব্যাপার নাই, আমি কর্তা নই, আমি বিষয়ের ফল ভোগী নই"—এই 'অহং' ভাবের অভাব ঘটিয়া থাকে—ইহার ফল শূন্যতাবোধ। সুতরাং অহঙ্কারের বিনাশ ও অস্তিত্ব-বোধের অভাবে প্রকৃতি দোষের লয় হয় ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় অর্থাৎ তত্ত্বের আবির্ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা অনুভূত হয়, পুরুষ স্বস্থ অবস্থায় শূন্যতে বা স্বরূপে অবস্থিত হয়, ইহাতে পূর্বোক্ত সাতটি রূপের বিনাশ হয়—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাঽস্মিন্ মে নাঽহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥ ৬৪
তেন নিবৃত্তপ্রসবার্থবশাৎ সপ্তরূপাবনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥" ৬৫
(সাংখ্য কারিকা)

অতএব দেখা যাইতেছে যে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে চর্যাগানের যোগা-যোগ অস্বীকার্য নহে, এখন পাতঞ্জলকৃত যোগসূত্রের সঙ্গে এবং বিশেষ করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের সঙ্গে চর্যাগানের সম্পর্ক বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক।

চর্যাপদে অষ্টাঙ্গ যোগ

পাতঞ্জলদর্শনে কৈবল্য, স্বরূপ, শূন্যতা, নির্বাণ বা মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনা অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে—"যম-নিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" (পাতঞ্জল-সূত্রে—সাধনপাদে—২৯)

যম—পূর্বেই চিত্তচাঞ্চল্যের কথা বলা হইয়াছে এবং এই চঞ্চলতার আধার স্বরূপ আমাদের দেহকে বর্ণনা করা হইয়াছে—"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল," (চর্যাপদ—১)। এখন বিচার করিলে দেখা যায় যে, চিত্তশুদ্ধির পূর্বে চিত্তের আধারস্বরূপ দেহশুদ্ধির প্রয়োজন এবং চিত্তের উপাদান ইন্দ্রিয়াদির সংযমও দরকার।

মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাত ফলাহা (হ বাহা) ॥ ধ্রু ॥
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ
কাহ্নু ভণই তরুপুন ন উইজঅ ॥ ধ্রু ॥
বাটই সো তরু সুভাসুভপানী
ছেবই বিদুজন গুরুপরিমাণী ॥ ধ্রু ॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥
সু [ন] তরু গঅণ কুঠার
ছেবহু সো তরু মূল ন ডাল ॥ ধ্রু ॥ ৪৫ (চর্যাপদ-কাহ্নুপাদ)

এখানে মনকে তরুর সঙ্গে এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত বাসনাকে পত্র ও ফলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—"অনাদিভববাসনাপল্লবা-শ্রয়ত্বাৎ কৃষ্ণাচার্যপাদেন স্বচিত্তং তরুত্বেন উৎপ্রেক্ষিতং" (টীকা)। গুরুর উপদেশরূপ কুঠারের দ্বারা ইহা সমূলে ছেদ করিতে হইবে, সংসারের মঙ্গল ও অমঙ্গল চিন্তার জালে এই তরু পরিপুষ্ট—"সোঽপি চিত্ততরুঃ

স্বশুভাশুভং জলং গৃহীত্বা অনাদি সংসারভূমৌ বর্দ্ধতে" (টীকা)। গুরুর নির্দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা সমূলে ধ্বংস করিয়া মনের আনন্দে মগ্ন থাকেন। এই তরুর কোন অস্তিত্ব নাই—ইহা শূন্য—অবিদ্যাই ইহার রূপ। প্রকৃতিপ্রভাস্বর অর্থাৎ বিবেকের আবির্ভাবে ইহা বিলীন হইয়া যায়। হিংসা, মিথ্যা, পরস্বহরণ, যৌনকামনা ও ভোগপ্রবৃত্তি—এই পাঁচটি প্রধান রিপুই আমাদের চিত্তচাঞ্চল্যের উৎপত্তির কারণ। এই-গুলিকে দমন করিতে হইবে অর্থাৎ ইহার বিপরীত অহিংসা, সত্য, চৌর্যবৃত্তিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য ও লোভ প্রবৃত্তিত্যাগ এই পাঁচটি পথ অবলম্বনের সাহায্যে জীবকে চিত্তচাঞ্চল্য ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহা পাতঞ্জল দর্শনে 'যম' নামে অভিহিত—"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (পাতঞ্জলসূত্রে—সাধনপাদে—৩০)। ইহা সর্বদেশে, সর্বকালে ও সর্বধর্মেই স্বীকৃত হইয়াছে—ইহাই সার্বভৌম মহাব্রত।

নিয়ম—'যম' সাধন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে 'নিয়ম' সাধন করিতে হইবে, কারণ শরীর ও চিত্তের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতে চিত্তের আধার শরীরকেও চঞ্চলতাহীন করিয়া তুলিতে হইবে। তাই চর্যাপদে বলা হইয়াছে—

> "এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণকপাটের আস
> সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস ॥১

ছন্দযুক্ত অবস্থায় দেহের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয়াদি করণ হইতে মুক্ত হইয়া শূন্যত্বকে অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। সাংখ্যদর্শনের মতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ (৫টি কর্মেন্দ্রিয়)—চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা (৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং মন, এই একাদশটি ইন্দ্রিয় করণ, ইহারা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং দৈহিক কার্যাদির প্রবর্তক—"কর্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরন্তরমেকাদশকম্" —১৯ (সাংখ্যদর্শন—দ্বিতীয় অধ্যায়)—"ইন্দ্রস্য সঙ্খনাতেশ্বরস্য করণ-মিন্দ্রিয়ম্ তথা চাহঙ্কারকার্যত্বেসতি করণত্বমিন্দ্রিয়ত্বমিতি" (টীকা)

"কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ুয়াল
সদ্‌গুরু বঅনে ধর পতবাল ॥ধ্রু॥
চীঅ থির করি ধরুরে নাহী
অন উপায়ে পার ন জাই ॥ধ্রু॥
নৌবাহী নৌকা টাগু অ গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জাউণ আণেঁ ॥ধ্রু॥
বাট অভঅ খাণ্টবি বল আ
ভব উলোলেঁ ষঅ বি বোলি আ ।ধ্রু॥
কুল লই খরে সোন্তে উজা অ
সরহ ভণই গনেঁ পমাএঁ ।ধ্রু॥ ৩৮ (চর্যাপদ—সরহ পাদ)

দেহকে নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া মনমাঝি এই তরী বাহিয়া যাইবে। সদ্‌ গুরু বচনে স্থির না হইলে পার হওয়া যাইবে না "আধারাধেয় সম্বন্ধেন কায়ং নৌকাং পরিকল্প্য মনোবিজ্ঞানং কেলিপাতঞ্চ। সৎগুরুবচনং পতবালং গৃহীত্বা। বজ্রজলজসংযোগভবজলধিমধ্যে পঞ্চজ্ঞানাত্মকং বিলক্ষণ-শোধিতসংবৃতিবোধিচিত্তং স্থিরীকৃত্য কায়নৌরক্ষাং কুরু (টীকা)। কর্ণধার গুণের সাহায্যে দেহনৌকাকে সহজানন্দের ভিতর দিয়া মহাসুখদ্বীপে গমন করিবে। কুপথে গেলে চলিবে না, মহাসুখ রাগ-স্রোতে নৌকা বোধিচিত্তবজ্ররূপে উর্ধ্বগমন করিবে। দেহের ভিতরে চাঞ্চল্য থাকিলে ভবসাগর পার সম্ভব হইবে না।

এখন এই দেহচাঞ্চল্যকে পরিহার করিতে হইলে অর্থাৎ দেহকে ও ইন্দ্রিয়বর্গের কার্যাদিকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে পাঁচটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—শুচিতারক্ষা, মনের সন্তুষ্টি, তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরে অর্থাৎ আদর্শে বিশ্বাস ও অনুরক্তি এই পাঁচটিকে পাতঞ্জলদর্শনে 'নিয়ম' নামে প্রচলন করা হইয়াছে—"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ"—(পাতঞ্জল সূত্রে—সাধন পাদে—৩২)

আসন—ইহা সাধারণ কথা যে, কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইলে

বা মনোযোগী হইতে হইলে আসন করিয়া বসিতে হইবে। সুতরাং চিত্ত ও শরীর বিশুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ যম ও নিয়ম এই দুইটি প্রথাকে যথার্থভাবে প্রতিপালন করিয়া সাধক স্থির হইয়া উপাসনায় রত হইবেন। এখন বিচার্য বিষয় এই যে, এই আসনের নিয়ম কি তাহা জানিতে হইবে, যাহার পক্ষে যেরূপ আসন উপযুক্ত হইবে, তাহাকে সেই আসন গ্রহণ করিতে হইবে—আসন বিবিধ প্রকার, যেমন, পদ্মাসন, দণ্ডাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি। যেই আসনে উপবেশন করিলে আসীন ব্যক্তির দেহস্থির থাকিবে, কম্পিত হইবেনা, উদ্বেগের সৃষ্টি হইবেনা, শান্তি ও আরাম অনুভব করিবে, তাহাকে সেই আসনকেই অবলম্বন করিতে হইবে। তখন সমস্ত রকম দ্বন্দ্ব দূর হইবে, শীতোষ্ণতার বোধশক্তিও থাকিবে না—

"স্থিরসুখমাসনম্ (পাতঞ্জলসূত্রে—সাধনপাদে—৪৬)।

চর্যাপদে আসন সম্বন্ধে কোন বর্ণনা না থাকিলেও উহার উল্লেখ দেখা যায়—"ভণই লুই আম্‌হে সানে দিঠা

ধমন চমন বেণি পণ্ডি বইন ॥ ধ্রু ॥ ১

'সানে' এই কথাটা 'আসনে' শব্দের পরিবর্তিত রূপ হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। ধ্যান কথাদ্বারা 'সানে' কথাটাকে ব্যাখ্যা করিতে গেলেও, আসনের অর্থই প্রকাশ পায়—আসন ব্যতীত ধ্যান সম্ভব হয় না।

প্রাণায়াম—যম ও নিয়ম সংযোগে দেহ ও মন যখন বিশুদ্ধ অবস্থায় আসে, তখন সাধক আসনস্থ হইলে সমস্ত প্রকার শারীরিক ও মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে—"ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ" (পাতঞ্জলসূত্রে সাধনপাদে —৪৮)। এইবার সাধককে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়ামের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ (পাতঞ্জল সূত্রে—সাধন-পাদে—৪৯)

"দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তুলী কুম্ভীরে খাঅ" ॥

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ ধ্রু ॥
সুসুরা নিদগেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহিঁ সনাইড় ॥ ধ্রু ॥ ২
(চর্যাপদ—কুক্কুরীপাদ)

এইখানে রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামধেয় প্রাণায়ামত্রয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দ্বৈতভাব যেখানে লীন হইয়াছে, সেই মহাসুখকমলকে দোহন করিয়া বজ্রমণিপৈঠাতে ধারণের দ্বারা সহজানন্দ উপভোগ করা প্রাণায়ামে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। দেহঘরের নিকটে মহাসুখের আঙ্গিনাতে প্রবেশের পথই কুম্ভকযোগ, এই পরিশোধিত কুম্ভকযোগের সাহায্যে বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাব করা যায়—"কায়বৃক্ষস্য ফলং তদেব বোধিচিত্তং চিঞ্চাফলবৎ বক্রং কুম্ভীরমিতি। বিলক্ষণ-পরিশোধিতকুম্ভকসমাধিনা স্বানুভবক্রমেণ চ তস্য ভক্ষণং নিঃস্বভাবীকরণং কুর্বন্তি"—(টীকা)।

ললনানাড়ী ও রসনানাড়ীর ভিতর দিয়া রেচক ও পূরক সম্পাদন করিয়া অবধূতিকা নাড়ীতে কুম্ভক সিদ্ধ হয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে প্রাণায়াম তিনপ্রকার—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি, ইহারা দেশ, কাল ও সংখ্যানুসারে সম্পাদিত হয়। এই তিন প্রকার প্রাণায়ামের ভিতর শ্বাস ও প্রশ্বাস যখন গতিশূন্য অবস্থায় আসে, তাহাই চতুর্থ অবস্থা—ইহাকেই এই চর্যাপদে চতুর্থ অবস্থারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—স তু বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টোদীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ—৫০, বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ—৫১ (পাতঞ্জল সূত্রের—সাধনপাদে)। অতএব অর্ধরাত্রে অর্থাৎ কুম্ভকযোগের চতুর্থ অবস্থায় প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক

দানকালে প্রবেশাদিবাতদোষ সহজানন্দ ভাবকর্তৃক অপহৃত হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসরহিত হয়। কুম্ভকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া সাধক যখন তুরীয়ানন্দে-নিমগ্ন থাকে, তখন অবধূতি ভববিকল্প পরিহার করিয়া জাগ্রতা অবস্থায় থাকে—"তস্মিন্‌গৃহে পুনরর্ধরাত্রৌ চতুর্থীসন্ধ্যানাং কানেট ইত্যাদি। তদেব প্রবেশাদিবাতদোষবিভবং সহজানন্দচৌরেণ হৃতং।" "ত্বরিতাদি-শ্বাসং চতুর্থানন্দং যোগনিদ্রাং নীত্বাঽবধূতি শব্দসন্ধ্যায়া অনাদিভববিকল্পঞ্চ ধৃত্বা প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিরূপেণ যোগিন্যোঽপ্যহর্নিশং জাগরণং কুর্বন্তি" (টীকা)। ইন্দ্রিয়াদির সতেজ অবস্থায় চিত্তজাগ্রত থাকে—ইহাই দিন, আর সুষুপ্তি অবস্থাই রাত্রি। নিজের সংবৃত্তির শুক্ররূপে পরিণত অবস্থায় ত্রিলোক নির্মাণ করিয়া অবধূতি যখন নিজ সৃষ্টির ভীষণতা লক্ষ্য করেন তখন ভীত হন; কিন্তু আবার প্রজ্ঞাজ্ঞানের উদয়ে ইন্দ্রিয়াদির সুষুপ্তির ভিতরে পরিশুদ্ধ অবস্থায় মহাসুখের পথে চলিতে থাকেন—

"সা অবধূতিকা সংবৃত্ত্যা শুক্ররূপেণ ত্রৈলোক্যং নির্মায় স্বয়মেব দিবাদিজ্ঞানমুৎপাদ্য কাড়ই ইত্যাদি।" "স্বয়মেব মহাসুখচক্রস্থানে নির্বিকল্পং গচ্ছতি" (টীকা)। যখন প্রভাস্বর দ্বারা প্রবেশাদি বাতদোষ অপহৃত হয়, তখন সাধক দশদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পান না—

> "স্বস্থানতঃ সহজপবনঃ কল্পনাজালমুক্তঃ
> শান্তস্তোঽবং কিমপি জয়ত্যেষঃ শূন্যস্বভাবঃ॥" (টীকা)।

এইরূপে কুম্ভকের সাহায্যে সহজ পবনের উদয় হয় এবং চিত্তের স্থিরতা সম্পাদিত হয়—ইহারই পরবর্তী স্তর শূন্য। কুক্কুরীপাদের গানের এই গূঢ়তত্ত্ব সকলে বুঝিতে পারে না।

> "এক যে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ
> চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ ধ্রু॥
> সহজে থির করি বারুণী সান্ধে
> জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধ॥ ধ্রু॥
> দশমী দুআরত চিহ্ন দেখই আ॥

আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধ্রু ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥
এক সড়ুলী সরুই নাল
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥

(চর্যাপদ—বিরআপাদ)

এই চর্যাপদের মধ্যে মদের দোকানের উপমার ভিতর দিয়া 'প্রাণায়াম, এর বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যহীনা অস্পৃশ্যা পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মাযোগিনীকে শুণ্ডিনীরূপে পর্যবসিত করা হইয়াছে—বামনাসাপুটে গ্রাহকভাবে চন্দ্রস্বভাবে অবস্থিতা ললনা নামক নাড়ী এবং দক্ষিণ নাসাপুটে গ্রাহ্যভাবে সূর্যস্বভাবে অবস্থিতা রসনা নামক নাড়ীর মধ্যস্থলে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব বিসর্জন দিয়া স্বাধিষ্ঠানে অবস্থান করে অবধূতিকা। আবার দেখা যায় যে, অবিদ্যাবীজদ্বেষ প্রভৃতি বল্কলরূপ-দোষরহিত প্রভাস্বরশূন্যের দ্বারা সুখপ্রমোদদানকারী বারুণীমদের নেশার মত নিজের বোধিচিত্তকে বন্ধন করে—"একবা ষট্‌পথযোগাৎ সা অবধূতিকা শুণ্ডিনী ঊর্ধ্বনাসাঘটিকারন্ধ্রে চন্দ্রসূর্যৌ বামদক্ষিণৌ প্রৌঢ়যোগী বলবন্তৌ দ্বৌ সন্ধয়তি মধ্যমায়াং প্রবেশয়তি। এতেন স্বাধিষ্ঠানং প্ররূঢ়য়তি। পুনঃ স্বয়মেব আগত্যাধোনাসায়াং বজ্রমণিশিখর-শুসিরে বোধিচিত্তং বিন্দুমবিদ্যাবীজদ্বেষবল্কলরহিতেন প্রভাস্বরেণ গুরু-পদেশাদভিসন্ধ্য বারুণীতি সুখপ্রমোদত্বাৎ বোধিচিত্তং বন্ধয়তি" (টীকা)।

এইরূপ প্রাণায়াম মানুষকে অজর ও অমর করিতে পারে। নবদ্বারের অতিরিক্ত বৈরোচন দ্বারে নির্বাণরূপ মহাসুখের চিহ্ন দেখিয়া সাধক পরমার্থতত্ত্বের সন্ধান পান এবং মহাসুখের গ্রাহকরূপে উপস্থিত হন। চৌষট্টি ঘটিতে মদ্যপানের নেশার মত চৌষট্টি ঘটিকা অর্থাৎ দিবারাত্রি সাধক মহাসুখের নেশায় মগ্ন থাকেন—"তস্য বোধিচিত্তস্য স্বাধিষ্ঠানগতস্যাক্ষরতা সুখপাশেন বন্ধং কৃত্বা যেনাভ্যাসবিশেষেণ অজরামরত্বং দৃঢ়স্কন্ধং লভসে তৎ কুরু (টীকা)। গ্রাহ্য গ্রাহক আভাস-

দ্বয় নিরোধ করার জন্য অবধূতি মার্গকে সরুনাল বলা হইয়াছে, এই সরুমার্গেই সংবৃত্তি ও পরমার্থসত্যদ্বয়কে সংঘটন করা হইয়াছে—তাই অবধূতিকাকে ঘটী বলা হইয়াছে—"সংবৃত্তিপরমার্থসত্যদ্বয়ং ঘটতীতি কৃত্বা ঘটী আভাসদ্বয়নিরোধাৎ সূক্ষ্মরূপা। বিরুআপাদাঃ এবং বদন্তি। তয়া শুক্র নাড়িকয়া গুরোরুপদেশাৎ তমপতিতং বোধিচিত্তং স্থৈর্যংকৃত্বা নিস্তরঙ্গরূপেণ চালয়" (টীকা)। গুরুর উপদেশে অর্থাৎ প্রাণায়াম সাহায্যে বোধিচিত্ত স্থির ও নিস্তরঙ্গ হইবে—ইহাই বিরুআপাদের ঘোষণা—পাতঞ্জল মতে প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলেই চিত্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং রজস্তমোগুণ তিরোহিত হইতে থাকে—"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" (পাতঞ্জলসূত্রে—সাধনপাদে—৫২)। ইহাকে বজ্র বা শূন্যতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং অদ্বয়বজ্র হইতে একটি শ্লোক টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে —

"দৃঢ়ং সারমশৌষর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে।"

বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি নামক প্রাণবায়ুর যে শিল্প অর্থাৎ যে প্রাণবায়ু বিনা প্রযত্নে স্বাভাবিকরূপে সবদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, বিশেষ প্রকার কৌশলপূর্ণ প্রযত্নের সাহায্যে সেই স্বাভাবিক বায়ুশিল্পের গতিকে ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্যপ্রকার ভাবের অধীন করিয়া দেওয়ার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম শিল্পকে আয়ত্ত করিলে চিত্ত যে কতদূর বেগশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঔদর্য বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় সেই বায়ুকে বাহিরে পরিত্যাগ করার নাম বাহ্যবৃত্তি বা রেচক, বাহিরের বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম আভ্যন্তরবৃত্তি বা পূরক। রেচক ও পূরক উভয় প্রকার বৃত্তিকে বন্ধ করিয়া বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক। পূর্ণ অবস্থায় জলকুম্ভ যেমন নিশ্চল থাকে চক্ চক্ করিয়া নড়ে না, মানুষের শরীরেও সেইরূপ বায়ু পূর্ণ হইলে, তন্মমধ্যস্থ

বায়ুও নিশ্চল হয়—নড়াচড়া করে না। এই কুম্ভক নামধেয় স্তম্ভবৃত্তির ফলে শরীরের শিরা, প্রশিরা প্রভৃতি সমস্তই যদি বায়ুপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগের সৃষ্টি হয় না, ইহার ফলে শরীরও নির্বিকল্প, লঘু ও স্ফীতপ্রায় হয়। তপ্ত শিলার উপরে জলবিন্দু পতিত হইলে, তাহা যেমন শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তদ্রূপ সন্নিহিত বায়ুও সেই শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগজনক বেগের হ্রাস হওয়াতে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এই তিন প্রকার প্রাণায়াম যদি হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, সর্ব শরীর ব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি আভ্যন্তর স্থান সমূহে পর্যালোচন বা অনুসন্ধানপূর্বক সম্পন্ন হয়, তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম। এই চারিপ্রকার প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তকে যথেচ্ছরূপে প্রয়োগ করা যায়। বিদ্যাদি ক্লেশ ও রাগদ্বেষাদি মনোদোষ চিত্তের সর্বপ্রকার ব্যাপকতাকে, প্রকাশ শক্তিকে বা অসীম ক্ষমতাকে আবৃত করিয়া রাখে। প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ ভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব বা সহজ প্রকাশক শক্তি ব্যক্ত হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয় চিত্তের স্থিরতা ও ধারণাশক্তি—"ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ" (পাতঞ্জলসূত্রে—সাধনপাদে—৫৩)। এই চিত্তচাঞ্চল্যের অবসান ঘটাইবার সহজ পথ প্রাণায়াম।

"কাহেঁরি ঘিনিমিলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পরঅ চৌদিস ॥ধ্রু॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥ধ্রু॥
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবইন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জাণী ॥ধ্রু॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরি আ তো।
এবণচ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ধ্রু॥৬

(চর্যাপদ—ভুসুকুপাদ)

চিত্তে একদিক দিয়া যেমন অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ ও রাগদ্বেষাদি মনোদোষরূপ কাল প্রবেশ করিয়াছে, অপরদিকে বায়ু সঞ্চালন দ্বারাও চিত্তের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যম, নিয়ম ও আসন—এই তিনটি যোগাঙ্গ সাধনের পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন যে, চিত্ত কাহারও সহিত যুক্ত নহে, চিত্তে গ্রহণযোগ্য কোন বস্তু থাকিতে পারে না, আবার পরিত্যাজ্য বলিয়াও কোন কিছু নাই—সংসারের সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক ও অসার—"কাহেঁরি ঘিনিমিলি অচ্ছহু কীস" এযাবৎ মৃত্যু, মার প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় যে হরিণরূপ চিত্ত মার্ মার্ ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিল, গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে সর্বধর্মানুপলব্ধি ও গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবের দূরীকরণে ও শূন্যতাকে অবলম্বনে হরিণ মনে করিতেছে যে, সে মুক্তভাবে আছে। নিজকৃত অবিদ্যা মাৎসর্য প্রভৃতি দোষে দুষ্ট চঞ্চল চিত্ত সাধনার শত্রু, সুতরাং সদ্‌গুরু বচনরূপ বাণের দ্বারা ভুসুকুপাদ চিত্ত হরিণকে অনবরত আঘাত করিতে করিতে জব্দ করিতেছেন অর্থাৎ যোগের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের চেষ্টা করিতেছেন। টীকাতেও 'বোধিচর্যাবতার' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"ইমং চর্মপুটং তাবৎ স্ববুদ্ধ্যৈব পৃথক্ কুরু
অস্থিপঞ্জরতো মাংসং প্রজ্ঞাশস্ত্রেণ মোচয়॥
অস্থীন্যপি পৃথক্ কৃত্বা পশ্য জ্ঞানমনন্ততঃ
কিমত্র সারমস্তীতি স্বয়মেব বিচারয়॥"

চিত্তহরিণের চামড়া ছাড়াইয়া অস্থিপঞ্জর হইতে প্রজ্ঞাজ্ঞানের দ্বারা মাংস ছাড়াইয়া লও—অস্থিগুলিকেও পুনরায় পৃথক করিয়া অনন্তজ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইবে যে, ইহার মধ্যে কোন সার বস্তু নাই। প্রাণায়ামপরায়ণ হইলে পরে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয় এবং সাধারণ মৃগের মত তৃণজল পরিত্যাগ করে, তখনই এই বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। বিশেষ বিচারের দ্বারা চিত্ত তাহার সেই স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে, ইন্দ্রিয়পথে সেই স্বরূপপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা

থাকে না, যেহেতু চিত্ত ও পবনের আবাসস্থানের তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—"যথা বাহৈর্মৃগৈঃ তৃণচ্ছেদনির্ঝরপানং ক্রিয়তে তদ্বৎ চিত্তহরিণম্ন করোতি। বিশিষ্ট বিচারস্বরূপেণ তয়োঃ চিত্তপবনয়োঃ নিলয়ং নিবাসং ইন্দ্রিয়দ্বারেণ নাবগম্যতে" (টীকা)। এখন সময়ে শূন্যতাজ্ঞান হয় অর্থাৎ হরিণীরূপেকল্পিতা নৈরাত্মাদেবী বলেন যে, এই দেহবন হইতে শূন্যতা অর্থাৎ মহাসুখ কমলবনেই চিত্তকে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে, এইবার আর চিত্তহরিণের খুর দৃষ্ট হইল না—শূন্যে বিলীন হইল—"সহজজ্ঞানাবরোধেন যোগিনস্তস্য স্বচিত্তহরিণস্যাবয়বাদি বিকল্পং ন কল্পয়ন্তি" (টীকা)। মন সর্বত্র বিরাজিত, নিরাভাসি করুণারূপে প্রতিভাত। শূন্যতারূপিণী বৃষস্যন্তী নৈরাত্মা শীঘ্রই ইহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবে—

"সর্বস্যাপি নিরাভাবিককরুণৈক রসং মনঃ।
আলিঙ্গতি ঝটিত্যেষা বৃষস্যন্তী চ শূন্যতা ॥

এইবার দেখা যাইতেছে যে, প্রাণায়াম বলেই সাধকের মনে একটা শূন্যতাবোধের আবির্ভাব ঘটে।

প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয়কার্য হইতে বিরত হইলে যোগের পঞ্চম অঙ্গ 'প্রত্যাহার' সাধিত হয়—"স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ—৫৪" (পাতঞ্জল সূত্রে —সাধনপাদঃ)। যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের ভিতর দিয়া যখন শরীর ও মন পরিষ্কৃত বা সুসংস্কৃত হয় তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে রূপাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত ও সমাশক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের বাহ্যগতি ফিরিয়া আসে অর্থাৎ আসক্তির ধ্বংস হয়, তাহাই প্রত্যাহার, চক্ষু মনের নিকট রূপ অর্পণ করে না; কর্ণ হইতে মন কোন শব্দ গ্রহণ করে না, নাসিকা মনকে কোন গন্ধ প্রদান করে না—এক কথায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি মনের উপরে কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ গ্রহীতব্য বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের অনুগত হইয়া থাকে। সমস্তগুলিই একযোগে চিত্তকেই অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়, কারণ চিত্ত তখন ইন্দ্রিয় সকলের

অধীনতা হইতে মুক্ত হয় এবং স্বরূপে অবস্থিতির পথে চলিতে থাকে। মধুকররাজ যেমন মক্ষিকাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তদ্রূপ চিত্তের নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত সাধকের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে, চিত্তের অধীনস্থ ইন্দ্রিয়বর্গও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কেহই চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। এইবার যোগের ফল শূন্যত্বের তত্ত্ব স্বভাবতঃ সাধকের হৃদয়ে অনুভূত হইবে—তাই চর্যাকার চিত্তকে হরিণের সহিত তুলনা করিয়া নৈরাত্মা বা শূন্যতাকে হরিণীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং হরিণীরূপা নৈরাত্মাদেবীর নির্দেশেই চিত্ত দেহবন হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের কবল হইতে পলায়ন করিতেছে—

"When the deer citta is troubled thus amidst the miseries of life there comes to the doe or the goddess Nairatma essenceless) or perfect vareity) to his help and she takes him away form the world beset on all sides with the hunters" ১

"ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্"—(পাতঞ্জলসূত্রে—সাধনপাদে—৫৫) —ইন্দ্রিয়বশ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যত্বের ধারণা সাধকের মনে সঞ্চারিত হইলেই সাধক সহজ পথে অগ্রসর হইয়া নির্বাণ লাভে সমর্থ হইবেন; তাহা না করিয়া যদি সাধক কল্পিতদেবতাদের ধ্যান করেন, তবেই পথে জটিলতার সৃষ্টি হইবে। এই যোগ সম্বন্ধে ভোজরাজকৃত পাতঞ্জল সূত্রের 'মার্তণ্ড টীকাতে রহিয়াছে—" তদিদং যোগো যমনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্তবীজ-ভাব আসনপ্রাণায়ামৈরঙ্কুরিতঃ প্রত্যাহারেণ কুসুমিতঃ ধারণাধ্যান সমাধিভিঃ ফলিষ্যতি"—অর্থাৎ অষ্ট প্রকার যোগের অঙ্গ সকলের মধ্যে যম-নিয়ম বীজ স্বরূপ, আসনপ্রাণায়াম অঙ্কুর স্বরূপ এবং প্রত্যাহার পুষ্প স্বরূপ। এই পুষ্প হইতে ধারণাধ্যান সমাধির দ্বারা ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোগের এই ফল স্বরূপ, নির্বাণ বা শূন্যত্ব—ধারণা দ্বারা শূন্যত্ব, ধ্যানের দ্বারা অতিশূন্যত্ব এবং সমাধির দ্বারা মহাশূন্যত্ব লাভের পরেই যোগের ফল কৈবল্য বা সর্বশূন্যত্ব লাভ হয়।

১ Obscure Religious Cult—S.B. Dasgupta P 43

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী
কমল কুলিশঘাণ্ট করহুঁ বি আলী ॥ধ্রু॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ধ্রু॥
খেঁপহু জোই নি লেপন জায়
মণিকুলে বহি আ ওড়ি আণে সগাঅ ॥ধ্রু॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল
চান্দ সুজবেণি পখা ফাল ॥ধ্রু॥
ভণই গুণ্ডরী অহ্ মে কুন্দুরে বীরা
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীড়া ॥৪
(চর্যাপদ—গুণ্ডরী পাদ)

যে পরিশুদ্ধাবধূতিকাকে নৈরাত্মাযোগিনী বলা হইয়াছে, তিনিই ললনা, রসনা ও অবধূতিকা নামক নাড়ীত্রয়কে চাপ দিতে দিতে নিরাভাস করেন, ইহার ফলে উহাদের ভিতর হইতে গ্রাহ্যগ্রাহকত্ব, বাসস্থান, জ্ঞাতাজ্ঞেয় প্রভৃতি দ্বৈতভাব দূরীকৃত হয় ; এইবার স্বরূপতাবোধ জন্মে, সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতারূপ বজ্র পদ্ম সংযোগের ভিতর দিয়া সহজানন্দ লাভ হয় এবং কালরহিত সময় নিরপেক্ষ মহামুদ্রারূপ শূন্যতার সন্ধান পাইয়া সিদ্ধির পথে যাত্রা করেন—"ললনারসনা অবধূতিকা নাড্যঃ ত্রিনাড্যং চাপয়িত্বা নিরাভাসীকৃত্য সৈব পরিশুদ্ধাবধূতিকা নিরাত্মাযোগিনী। অঙ্কবালীতি। অঙ্কং স্বচিহ্নং সাধকায় দদাতি। তং পালয়তিচ। অথবা বিচিত্রাদিলক্ষণযোগেনানন্দাদিক্রমং দদাতি। পুনঃ সৈব ভাবকস্যাবিরতাভিযোগদাশ্বাসং দদাতি। কমল কুলিশমিতি। ভো যোগিবর সম্যক্ কুলিশাব্জসংযোগস্থৌ আনন্দসম্মোহতয়া। বিকালমিতি কালরহিতাং মহামুদ্রাং সিদ্ধি সাক্ষাৎ কুরু। অতএব মহাসুখ সমালগ্নোহং ভাবকঃ।" (টীকা)

এইবার সাধকের চিত্তে শূন্যতা ধারণের যে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ কথিত 'প্রত্যাহার' নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হয়, তাহার

ফলে মহাসুখের সন্ধান পাইয়া আরও উচ্চতর মহাসুখের প্রবল বাসনায় সাধক উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং ইহাকে প্রকাশ করিবার জন্য নরনারী মিলনের যৌনসুখকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক যুগেও দেখা যায় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও নাকি ভগবৎ দর্শনের সুখকে সহস্রলিঙ্গের দ্বারা সংগমসুখের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই মহাসুখকে পরিত্যাগ করিয়া একমুহূর্তও সাধক বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না—আনন্দের আধার নৈরাত্মার মুখচুম্বন করিয়া উষ্ণিষকমলে পরমার্থ মধুপানের জন্য ছটফট্ করিতে থাকেন, মহাবোধিলাভ করিতে চাহেন। এই নৈরাত্মাদেবীর আবির্ভাবে, শূন্যতাবোধের ফলে সমস্ত মোহ দূর হইয়া যায় এবং প্রবুদ্ধতালাভে যে আনন্দরসের সঞ্চার হয়, তাহা অনুভূত হইলে মণিমূল হইতে উর্ধ্বদিকে মহাসুখ চক্রের সন্ধানে যাত্রা করেন। এখানে প্রাণবায়ু ধারণের কথাই বলা হইয়াছে অর্থাৎ যোগাঙ্গের 'প্রত্যাহার'কে বর্ণনা করা হইয়াছে—"ভো নৈরাসযোগিনি ত্বয়া বিনা ক্ষণৈকং ত্বর্বারবেগচপলত্বাৎ প্রাণবাতধারণেন সমর্থোঽহং। তথাচাগমঃ—"উৎপাদস্থিতিভঙ্গেষু অন্তরাভবসংস্থিতি। —যাবতী কল্পনালোকে বায়ুশ্চিত্তং বিজৃম্ভিতং" তব বক্তৃং সহজানন্দং পুশ্চুম্বয়িত্বা কমলরসমিতি উষ্ণীষকমলামধুমদনং পরমার্থ বোধিচিত্তং গুরুসম্প্রদায়াদ্বিরমানন্দকালিঙ্গর সময়ে করোমি" (টীকা)।

শূন্যতাবোধ না হইলে প্রাণবায়ুর বেগ ধারণ করা তুঃসাধ্য. ক্ষণিকত্ব, উৎপত্তির অভাব ও স্থিতিহীনতা অর্থাৎ সৃষ্টি বিভূতির অসারতার উপলব্ধি হইলেই শূন্যতাবোধ আসে। সুতরাং উৎপন্নতা স্থিতির অভাবে অন্তর স্বরূপতা লাভ করিয়াছে এবং বায়ু ও চিত্তের বিজৃম্ভন ঘটিয়াছে। সাধকের মণিপুরদ্বার বন্ধ হওয়াতে বায়ু ধারণ সহজতম হইয়াছে—চন্দ্র সূর্যের প্রবেশও অসাধ্য অর্থাৎ গ্রাহ্য গ্রাহকভাব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত—"তালসম্পুটীকরণে মণিপুরদ্বার নিরোধং কর্তব্যং আত্মানং সংবোধ্য স্বয়মেব বদত্যাম্বুপূর্ণিকাং" (টীকা)। চর্যাকার গুন্ডরীপাদ নিজেকে কুন্দুরেবীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—এই কুন্দুরেবীর বলিতে

বুঝা যায় যে, যিনি দুই ইন্দ্রিয় পরিসমাপ্তির পরে ক্লেশাদি শত্রুকে পরাজিত করিয়া অক্ষয় সুখের অধিকারী—"দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তিযোগাক্ষর-সুখেন ক্লেশাদি মর্দ্দনাদ্বীরোহহম্" (টীকা)। দুই ইন্দ্রিয় বলিতে অনেকে মন ও পবনকে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পবন ইন্দ্রিয়পদবাচ্য হইতে পারে না। পূর্বে পাতঞ্জল যোগের সূত্র আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, 'প্রত্যাহার' নামক যোগাঙ্গসিদ্ধি হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং কুন্দুরে বীর শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা বুঝিব যে, যিনি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্পানিপাদপায়ু উপস্থ) জয় করিয়াছেন। এই দুইপ্রকার ইন্দ্রিয় বশ্যতা স্বীকার করিলে বায়ুধারণ ক্ষমতা আসে এবং চিত্ত বশ্যতা স্বীকার করে। 'সাসুঘরে ও ঘালি কোঞ্চা তাল' বলিতেও বুঝা যায় যে, চিত্তবজ্রকে শক্ত করার জন্য সহজানন্দের ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে "চিত্তবজ্রদৃঢ়ীকরণায় সা বিরমানন্দাবধূতিকা সহজানন্দৈকলোলীভাবং ন শ্বাসাগারং সুমেরুশিখরং নীত্বা" (টীকা)।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'প্রত্যাহার'সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয় বোধের অভাব ঘটে এবং শূন্য জগতের ভিতরে নরত্ব ও নারীত্বের কোন পৃথকত্ব থাকে না; ইহার কারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়াই যৌনবুদ্ধি জাগরিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাবে ইহা লুপ্ত হয় এবং সম্প্রদায় ভেদ দূরীকৃত হয়—যোগীন্দ্রের অষ্ট ঐশ্বর্য্যাদি শুধু অবশিষ্ট থাকে—"যোগীন্দ্রচিহ্নমষ্টগুনৈশ্বর্যাদি ময়োক্তমভিজ্ঞাসন্দর্শার্থং" (টীকা)।

শূন্যতা

ধারণা—'প্রত্যাহার' এই পঞ্চম যোগাঙ্গের ভিতর দিয়া চিত্তকে কোন বিশেষ স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিবার শক্তির উৎপত্তি হয় এবং এই প্রত্যাহারের ফল স্বরূপ যে চিত্তধারণ ক্ষমতা—তাহাই যোগের ষষ্ঠ অঙ্গ 'ধারণা'। যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া কোন একার যোগোক্ত আসনে ঋজু ভাবে উপবেশন করিতে হইবে, তারপর প্রাণায়ামসহযোগে ইন্দ্রিয়

দিগকে স্ব স্ব বিষয় (রূপদর্শন, শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি) হইতে এবং তাহাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া (আকর্ষণ করিয়া) চিত্তকে সমর্পণ করিতে হইবে। তাদৃশ চিত্তকে নাসিকাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎপিণ্ড দেশে, অথবা নাড়ীচক্রাদি আধ্যাত্মিক প্রদেশে অথবা কোন ভূত ও ভৌতিকে বা কোন সুন্দর মূর্তিতে চিত্তকে বদ্ধ রাখার ধারণা নামক শক্তির ভিতরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না—ইহাই শূন্য বা সহজ—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"১ (পাতঞ্জল সূত্রে বিভূতিপাদে)। চর্যাপদেরও বক্তব্য যে যাঁহারা এই শূন্য বা সহজকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব লাভের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অপরমার্থ তত্ত্বের কল্পনা করে, তাঁহাদের সাধনা সফল হইতে পারে না।

"আলি এঁ কালি এঁ এবাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ধ্রু॥
কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস
জো মন গোঅর সো উ আস ॥ধ্রু॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ধ্রু॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ধ্রু॥
হেরি সে কাহ্নি ণি অরি জিন উর বট্টই
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি ন পই সই ॥ধ্রু॥ ৭ (চর্যাপদ-কাহ্নুপাদ)

চর্যাকার কৃষ্ণাচার্য যোগ বলে 'ধারণা' সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বজ্রজাপ উপদেশ লাভে শূন্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ আলি বা লোকজ্ঞানের দ্বারা এবং কালি বা লোকাভাসের দ্বারা অবধূতি মার্গে বায়ুং মনকে একীকৃত করিয়া সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছেন এবং গুরু কৃপায় প্রকৃতি পরিশুদ্ধা অবধূতিকার আকারে শূন্য সাগরে চিত্তকে নিমজ্জিত করিয়া বিশুদ্ধমনা হইয়াছেন— "উক্তার্থস্বদেবতাযোগপূর্বক বজ্রজাপোপদেশং লব্ধা কৃষ্ণাচার্যেনালিনা লোকজ্ঞানেন কালিনা লোক-

ভাসেন চ একীকৃত্যবধূতীমার্গং সুদৃঢ়ং রুদ্ধতং পুনঃ সৎগুরুপ্রসাদাৎ প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিকা রূপেণ কৃষ্ণাচার্য বিশিষ্ট মনসো ভূতাঃ” (টীকা)।

সুকুমার সেনের ‘চর্যাগীতিপদাবলীতে (৬০পৃ) আলি ও কালি শব্দদ্বয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—“আলিকালি উচ্যতে তদ্ যথা —অ আ ই ঈ ঋ ৠ ঌ ঌ অ আ এ ঐ অর্ আর্ ও ঔ অল্ আল হ হা য যা র রা ব বা ল লা ইতি সৃষ্টিক্রমেণালি জাপঃ শ্বাস প্রবেশেন। শ্বাসনির্গমে কালিঃ—ক কা…না স সা মা ত তা না স সা হ্ব হ্বা ষ ষা শ শা ক্ষ ক্ষা ইতি” (সাধনমালা—২৪৬ পৃ)। আলি ও কালি নামক নাড়ীদ্বয় শ্বাস প্রশ্বাসের আধার এবং বিভিন্ন শব্দ সংযোগের ভিতর দিয়া এই শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য অনবরত চলিতেছে।

চর্যাকার নিজেই নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে ব্যাপ্য ব্যাপক রূপে সুখপূর্ণ বলিয়া মনে হয় এই বিশ্বজগৎ এবং তন্ময়তাবশতঃ আমরা কোন স্থানেই কোন বিশিষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাই না বলিয়া শূন্যময় এই অবস্থাতে আমরা যে কোন স্থানে (নাসাগ্রে, হৃৎপিণ্ডদেশে প্রভৃতি) বৃত্তিহীন চিত্তকে ধারণা করিতে পারি। মননেন্দ্রিয়দ্বারা এই পরমার্থ গ্রহণীয় নহে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অভাবে এই মহাসুখের স্বরূপকে শূন্যতার ভিতর দিয়া অনুভব করিতে হইবে—“স্বয়মেবাত্মানং সংবোধ্য বদন্তি। ভোঃ কৃষ্ণাচার্যপাদা! ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ সুখেন ব্যাপিতং জগৎ ইতি।” “কুত্রস্থানে অস্মাভির্নিবাসঃ করণীয়ঃ স তন্ময়ত্বাৎ, যেঽপি যোগিনো মনোগোচরা মনেন্দ্রিয়বোধপ্রধানা ভবন্তি তেঽপ্যস্মিন্ ধর্মে উদাসাঃ দূরতরা এব” (টীকা)। পার্থিব পদার্থের ভিতরে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা বিকল্পজাত, শূন্যতায় যাঁহাদের চিত্ত পূর্ণ এবং যাঁহারা মহাসুখপথের যাত্রী, তাঁহারা এই ভববিকল্পজাল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া বিভিন্নতার মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট স্থূল স্বর্গমর্ত্যপাতাল এবং অন্তরস্থিত কায়বাক্‌চিত্ত, এমনকি দিবারাত্রিসন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত ত্রিশক্তি সম্পন্ন বিভিন্নতাবোধ অস্তিত্বহীন—মহাসুখপথের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের ভেদাভেদজ্ঞান

লোপ পাইয়াছে—" বাহ্যে স্বর্গমর্ত্যরসাতলমধ্যাত্মে কায়বাক্‌চিত্তদিবারাত্রি-সন্ধ্যাযোগযোগিনীতন্ত্রাদিকং বোদ্ধব্যং। এতৈরন্যোন্যং মহাসুখব্যাপকত্বেন ভেদোপলব্ধিলক্ষণং নাস্তি যোগিনাং পরমার্থবিদাং" (টীকা)।

এই জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নাই, ক্ষণিকের মধ্যে উৎপত্তি হয়, আবার ক্ষণেকের মধ্যেই লয় হইয়া যায়। কৃষ্ণাচার্য এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, যাহার প্রভাবে উৎপত্তি ও ধ্বংস—এই দুইটি বিষয়ের অন্তর্নিহিত মহাসত্য সম্বন্ধে গুরুকৃপার বলে তিনি জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছেন —"যে যে ভাবাঃ উৎপন্নাস্তে তে ভাবা বিলয়ংগতাঃ। এষামুৎপাদভঙ্গেষু সংবৃতিসত্যস্বভাবপরিজ্ঞানেন গুরুপ্রসাদত্বাৎ কৃষ্ণাচার্যচরণাবিশিষ্টমনসঃ পরিশুদ্ধভূতাঃ।" (টীকা)। বিশুদ্ধমনা হইয়া অনুভূতি জন্মিয়াছে যে, জিনপুর বা মহাসুখপুরের নিকটে তিনি পৌঁছিতে পারিয়াছেন—অবিদ্যামোহে মহাসুখ লাভ হয় না—শূন্যত্ব সৃষ্টি হইলে সাধকের সাধনার ভিতর দিয়া যে, উৎপত্তির পথ এবং উৎপত্তির ক্রমসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান বা স্তর শূন্যতা, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হইবে—

"উৎপত্তিক্রমসংস্থানাং উৎপন্নক্রমকাঙ্ক্ষিণাং
উপায়শ্চৈষঃ সংবুদ্ধৌ সোপানমিবনির্মিতঃ॥
(নাগার্জুনপাদাঃ—টীকাতে উদ্ধৃত)

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী
সোনা থোই মহিকে ঠাবী॥ ধ্রু॥
বাহতু কামলি গঅন উবেসেঁ।
গেলী জাম বহু উই কইসেঁ॥ ধ্রু॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥ ধ্রু॥
মাঙ্গত চন্‌ হিলে চউদিস চাহঅ
কেড়ুয়াল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥ ধ্রু॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাপা
বাটত মিলিল মহাসুহসুঙ্গা॥৮ (চর্যাপদ—কম্বলাম্বরপাদ

বোধিচিত্তকে এখানে নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং এই বোধিচিত্তরূপা তরণী, শূন্যতা ও করুণার আবির্ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সদগুরুর কৃপাতে স্বরূপ, সহজশূন্য ও সর্বপ্রকার আকৃতিশূন্য সেই বোধিচিত্ত মহাসুখচক্রে আরোহণ করিয়া সর্বশূন্যরূপ মহাসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রী সিদ্ধাচার্য কম্বলাম্বরপাদ এই বাণী প্রকাশ করিতেছেন যে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ দূরীভূত হইয়া ভেদাভেদ অভাবে তন্ময়তায় পর্যবসিত হইয়াছে—"তাং তাদাত্মতয়া সর্বাকারবরোপেতশূন্যতয়া সদ্‌গুরুপ্রসাদরসং সংপূর্য মহাসুখ-চক্রগমনসমুদ্রোদ্দেশেনাত্মানং সংবোধ্য সিদ্ধাচার্যকম্বলাম্বরপাদা বাহয়ন্তি। রূপেত্যাদি রূপবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারবিজ্ঞানাদীনাং অনেন স্থানভেদং নাস্তি সর্বমেব তন্ময়ত্বাৎ" (টীকা)।

নৌকার কথা বুঝাইতে গিয়া টীকাকার বলিয়াছেন—দেহ তরীতে আরোহণ করিয়াই দুঃখের নদী অতিক্রম করিতে হইবে, নিদ্রার আঁধারে আবৃত অলস মূর্খদের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে—

"মানুষ্যং নাবমাসাদ্য তর দুঃখমহানদীং
মূঢ়কালো ন নিদ্রয়া ইয়ন্নৌ দুর্লভাঃ পুনঃ॥" (টীকা)

শূন্যকে অবলম্বন করিয়া চিত্ততরীকে নির্বাণ বা শূন্য গগনের উদ্দেশ্যে চালাইয়া যাইতে হইবে—তাহা হইলে জন্মরহিত অমরত্ব লাভ হইবে। "আকাশের অর্থ হচ্ছে অনাবৃতি। যা রূপ বা বস্তু (matter) দ্বারা আবৃত হয় না এবং রূপ বা বস্তুকে আবৃত্ত করে না, তাই হচ্ছে আকাশ।"[১]

"নির্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত! ঠিক কথাটি পাই না বলিয়াই আমরা ইহাকে 'শূন্য' বলি। কিন্তু শূন্যশব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই, যাহা অস্তি নাস্তি প্রভৃতির চারিপ্রকার অবস্থার অতীত। অস্তি নাস্তি তদুভয়া-নুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যম্।[২]

১ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—প্রবোধচন্দ্র বাগচি পৃ ২৬
২ বৌদ্ধধর্ম - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃ ১৭

এখন শূন্যধারণা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখানেই থাকিয়া গেলে মহাসুখ লাভ বা নির্বাণ লাভ হইবে না, সুতরাং এখনও বোধিচিত্তরূপ নৌকাকে বাহিয়াই যাইতে হইবে। তাই আরম্ভ হইল শূন্যতার পথে নূতন অভিযান, আভাস দোষের খুঁটিগুলি তুলিয়া দিয়া অবিদ্যা কাছিকে মুক্ত করিতে হইবে। সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে মহাসুখরূপ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া সেই বিলীন অবস্থার ভিতর দিয়া নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। এখন এই যাত্রাপথে লক্ষ্যকে স্থির করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, যেন নানাবিধ বাধাবিপত্তি এই যাত্রাপথে বিঘ্নের সৃষ্টি না করিতে পারে—'মার্গং বিরমানন্দং গত্বা চতুর্দিক্ষং গ্রাহ্যাদিভিঃসংসারে পতন্তি" (টীকা)। পাতঞ্জল সূত্রকথিত "ধারণা" নামক যোগাঙ্গের স্পষ্ট নির্দেশ টীকাতেও উল্লিখিত হইয়াছে—"বামদক্ষিণ আভাসদ্বয়ং মধ্যমায়াং প্রবেশয়িত্বা মার্গবিরমানন্দগতং বোধিচিত্তং নিজজ্ঞানপরিশোধিতং মহাসুখচক্রসমুদ্রোদ্দেশেন যদা মিলিতং তস্মিন্ মার্গে মহাসুখসঙ্গনৈরাত্মা-জ্ঞানভিসঙ্গ ময়া প্রাপ্তমিতি" (টীকা) অর্থাৎ বাম দক্ষিণ আভাস দুইটি বন্ধ করিয়া মধ্যমাতে পবন ও চিত্তের 'ধারণা' সিদ্ধি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে মার্গস্থিত বিরমানন্দগত পরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত লাভ করিতে হইবে। তাহার পর মহাসুখচক্ররূপ সমুদ্রে গমনের পথ অর্থাৎ বিশূন্যত্ব লাভের মহাসুখরূপ নদীর নৈরাত্মজ্ঞান সাধক লাভ করিয়াছেন। শূন্যতাপ্রাপ্তির পর সহজপথে যাত্রা সুরু হইল।

কৃষ্ণাচার্যপাদ বলিয়াছেন যে, যিনি সংবেদনশীল মনোরত্নকে (যম নিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারদ্বারা) সহজপথে পরিচালিত করিতে পারেন তিনিই সহজ পথের ধর্মগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর কেহ নহেন—

"যো সংবেঅন মনরঅন
অহরহ সহজ ফরন্তু।
সো পর জানই ধর্মগই
অনু কিমু পঅ কহন্তু॥" (টীকা)

"বৌদ্ধতন্ত্রমতে চারিটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত, নিম্নতম হইল নির্মাণ

চক্র, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত ; তদূর্ধ্বে হৃদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে হইল সম্ভোগচক্র, মস্তকে উষ্ণীষকমল হইল মহাসুখচক্র। নির্মাণ চক্র শুধু নিম্নতম চক্র নয়, ইহা স্থূলতম তত্ত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু শক্তির জাগরণ প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষট্টিদলযুক্ত পদ্মে ; এইখানে এই শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ।"[১]

যোগসূত্রেও দেখা যায় যে চিত্তকে প্রথমে নাভিদেশে, তারপর হৃদয়ে, তারপর বক্ষে, তারপর কণ্ঠে, তারপর মুখে, তারপর নাসিকাগ্রে নিশ্চল স্থিতির পরে নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে ধারণা করিতে হইবে—

"প্রাঙ্ নাভ্যাং হৃদয়ে চাথ তৃতীয়ে চ তথোরসি-
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রভ্রূমধ্যমূর্দ্ধাসু॥" (যোগবার্তিক ৩—২)

"নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছুই ছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ॥ ধ্রু॥
আলো ডোম্বি তো এ সম করিবে মো সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ॥ ধ্রু॥
একসো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ ধ্রু॥
হালো ডোম্বী পুছমি সদভাবে
অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥ ধ্রু॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর ন চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়িনড় এট্টা॥ ধ্রু॥
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥ ধ্রু॥
সরোবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ॥ ধ্রু॥১০

(চর্যাপদ—কাহ্নপাদ)

১। ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত—৪র্থ অধ্যায়

অস্পৃশ্যজাতীয়া ডোম্বীকে এইখানে পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মারূপে গৃহীত হইয়াছে, ব্রহ্মহুঁকার বীজ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ শূন্যতাবলম্বী চিত্তকে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ। ডোম্বী যেমন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে গেলে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্যা ডোম্বীর স্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে চাহেন; তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জয়ী সম্প্রদায়ভেদহীন যোগীদের ব্রহ্মহুঁকার-জাত বোধিচিত্ত সংবৃত্তিশুক্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই মণিমূলস্থ বিরমান্দকে স্পর্শ করিবার জন্য নৈরাত্মাদেবী ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে। এখন রূপাদিবিষয়রহিত এবং ইন্দ্রিয়গোচরের বাহিরে অবস্থিত যোগী কৃষ্ণাচার্য নৈরাত্মার বাসস্থান মহাসুখচক্রের সন্ধান পাওযাতে তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে—

"কোন্ বৃন্দাবনে রসের উৎপত্তি
সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে পদ্ম বিকশিত
ভ্রমরা মধু সে খায়" ॥[১]

লোকলজ্জা ও সঙ্গেসঙ্গে সামাজিক ঘৃণা ও বন্ধনের যোগ ছিন্ন করিয়া যেমন কাপালিক ও ডোম্বীর মিলন সম্ভব হয়, সেই পার্থিব বিষয় ও সকল প্রকার ইন্দ্রিয়াদি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নৈরাত্মার প্রতি ধাবিত যোগীর চিত্ত প্রজ্ঞোপায়াত্মিকা মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভে অগ্রসর—

"রতিকাম যদি কিঞ্চিৎ টলে
সহজ বলিয়া কেমনে বলে।
যেখানে নাহিক প্রেমের হাট
সে ধ্বনি কেবল চিতার ঠাট" ॥[২]

প্রকৃতিরূপিণী নৈরাত্মার বর্ণনায় দেখা যায় যে, চৌষট্টি পদ্মের পাপড়ীর উপরে অর্থাৎ নাভিদেশস্থিত নির্মাণচক্রের উপরে নৈরাত্মাদেবী নৃত্যপরায়ণা এবং সাধক ধারণাসিদ্ধ। কৃষ্ণাচার্যও ভগবতী নৈরাত্মার

১-২ সহজিয়া সাহিত্য—মণীন্দ্রনাথ বসু—পৃ৭৩, ৮৬

সহিত রসযুক্ত অবস্থায় মহারাগানন্দসৌন্দর্যে উৎফুল্ল হইয়া উজ্জ্বলরূপে নৃত্যে মগ্ন হইয়াছেন—"পদ্মৈকং নির্মাণচক্রং চতুঃষষ্টিদলযুক্তং তত্র স্থিত্বা ভগবত্যা নৈরাত্ময়া সহ একরাগতয়া মহারাগানন্দসুন্দরোহি কৃষ্ণাচার্যো নৃত্যতি।" (টীকা)

এখন যোগীর অন্তরে প্রকৃতি ও পুরুষের লীলাখেলার পরিচয় কিছু কিছু জাগরিত হইতেছে—'ধারণা' দ্বারা শূন্যতাবোধের পর স্বরূপাশয় অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রকৃতিরূপিণী নৈরাত্মাকে স্পষ্টভাবে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে সে কোন পথে যাতায়াত করে। সে সর্বধর্মশূন্যতাহেতু সংবৃত্তি বোধিচিত্ত নৌকামার্গে যাতায়াত করে—এই অবস্থাকে টীকাতেও ঘোষণা করা হইয়াছে—

"তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বত্র সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকারচেতসা॥" (টীকা)

অর্থাৎ তদ্ধেতু পৃথিবীর সর্বত্র সহজ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এই সহজ অবস্থা হইতে স্বরূপের আবির্ভাব ঘটে—বিশুদ্ধ চিত্তই স্বরূপ বা নির্বাণের ধারণা করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এতদিন যে সংসার নাট্যে যোগী ব্যস্ত ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নৈরাত্মার ভগরূপ —অবিদ্যাময়-পদ্মস্থান রহিত ও বিষয়াভাসবিরহিত প্রকৃতির স্বরূপের সন্ধান পাইলেন—"তন্ত্রীতি ভগং পদ্মাস্থানং অবিদ্যারূপং চাঙ্গিত-মিত্যাদি তস্য পল্লবং বিষয়াভাসং" (টীকা)। সুসন্নিবেশ দেহের স্বরূপ যেমন হাড়ের মালা, তেমন প্রকৃতির স্বরূপ পুরুষের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন। এখন কৃষ্ণাচার্য প্রকৃতির পরিচয়বোধে স্বচ্ছ পুরুষত্ব বা শূন্যত্বের সন্ধান পাইলেন এবং বুঝিলেন যে চক্রীকুণ্ডলকণ্ঠিকা প্রভৃতির দ্বারা আবৃত বাহ্য মন্ত্র তন্ত্রের প্রভাব অস্তিত্বহীন ও পঞ্চসন্ধই স্বরূপ বোধের বাঁধা—"অতএব তবান্তরেণ ময়া কৃষ্ণাচার্যেণ ষট্‌তথাগতচক্রীকুণ্ডলকণ্ঠিকাদি-নিরংশুচর্য্যাং বিধৃত্য বাহ্যমন্ত্রনিরপেক্ষ্যতয়া পঞ্চবর্ন্ন বিহরণং কৃতং" (টীকা)।

কায়পুস্করের মূল বোধিচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে কামবীজের দ্বারা অঙ্কুরিত—এই বীজ ও অঙ্কুর দূরীভূত করিতে হইলে চিত্তকে নিঃস্বভাব

করিতে হইবে "গুরুসম্প্রদায়বিহীনস্য সৈব ডোম্বিনী অপরিশুদ্ধাবধূতিকা সরোবরং কায়পুষ্করং তন্মূলং তদেব বোধিচিত্তং সংবৃত্ত্যা শুক্ররূপং মারয়ামি। নিঃস্বভাবী করোমি" (টীকা)।

অবিদ্যাজাত বাসনার বিপাকে মনের ভিতরে কতকগুলি প্রতিভাস রচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাত চিত্তচাঞ্চল্য কালস্থান, জ্ঞাতাজ্ঞেয়, গ্রাহ্যগ্রাহকত্ব প্রভৃতি দ্বৈত কল্পনার সৃষ্টি করে। উদকচন্দ্রবৎ এই অলীক দ্বৈত কল্পনা হইতে অদ্বৈত বোধেই নির্বাণ বা মহাসুখলাভ ঘটে—ইহাই শূন্যতা, এই শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করিলে পাওয়া যায়—আলোক ও প্রজ্ঞা ইহার স্বভাব পরতন্ত্র। এই সর্বপ্রথম শূন্যতার স্তরে ইন্দ্রিয়দোষ অপগত হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা, অনুভূতি প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকার দুঃখ বিরাজিত থাকে। যদিও যোগোক্ত 'প্রত্যাহারে'র ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তবুও এই যোগোক্ত 'ধারণা' অর্থ্যাৎ শূন্যতা প্রাপ্তির ভিতরেও মোহ বিদ্যমান এবং স্ত্রী জাতির প্রতি মোহই শ্রেষ্ঠ মোহ বলিয়া এই অবশিষ্ট মোহজ্ঞানকে শূন্যময়ী নৈরাত্মা নামে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বামে করুণা বা উপায়, দক্ষিণে শূন্যতা বা প্রজ্ঞা এবং মধ্যে নৈরাত্মা বা অবধূতিকা—ইহাই শূন্যতা জ্ঞানের উপাদান স্বরূপ।

চর্যাপদের ভিতরে সাধক ও ডোম্বী নামক স্ত্রীপুরুষের বর্ণনার দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ সর্বপ্রথম সাংখ্যকার কপিল মুনিই প্রকৃতি ও পুরুষ নামে প্রকাশ করিয়াছেন এবং চর্যাপদের ভিতরে এই প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বই নানাবিধ রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অতিশূন্যতা

ধ্যান—চিত্তকে দেশবিশেষে ধারণার পরে শূন্যবাদে কথিত চারিস্তরের প্রথম স্তর শূন্যতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই ধারণীয় পদার্থে যখন চিত্তবৃত্তিগুলির একতানতা জন্মে তখনই সাধকের যোগের সপ্তম অঙ্গ

সম্পন্ন হয় এবং ইহারই ফলে শূন্যতার পরবর্তী স্তর 'অতিশূন্যতা'য় সাধক পৌঁছিয়া যায় অর্থাৎ ধ্যান নামক মনোবৃত্তিই অতিশূন্যতা।

"সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খলক্খন ন জাই
জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥ ধ্রু ॥
কুলেঁ কু মা হোইরে মূঢ়া উজু বাট সংসারা
বাল ভিণ একু বাকুণ ভুলহ রাজপথ কণ্টারা ॥ ধ্রু ॥
মাআ মোহাসমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥
সুনাপান্তর উহ ন দিসই ভান্তিন বাসসি জান্তে
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝএ উজু বাট জাঅন্তে ॥ ধ্রু ॥
বামদাহিণ দো বাটাচ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ
ঘাটন গুমাখড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জইউ ।১৫

(চর্যাপদ—শান্তিপাদ)

শূন্যতাই পরমানন্দ প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসাবে শান্তিপাদ বর্ণনা করিতেছেন। স্বয়ম্ভুয়মান নির্বিকল্প মহাসুখকে এখানে অলক্ষ্য স্বসংবেদনস্বরূপরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা কোনরূপ বিচারের দ্বারা লক্ষ্য হয় না, অনুভূতির বস্তু। নির্বাণ লাভের রাজপথ সহজ সাধনা, যাঁহারা শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া এই সহজপথে গমন করেন, তাঁহারাই যথাস্থানে পৌঁছিতে পারেন, মহাসুখ লাভ করেন—ফিরিয়া আসেন না—"এতদ্বিরমানন্দাবধূতিমার্গেন গতাঃতেঽপ্যনাবর্তে মহাসুখ-চক্রেশরসিজবনে লগ্নাঃ। তথাচ রতিবজ্রে—

"এষ মার্গবরঃ শ্রেষ্ঠো মহাযানমহোদয়ঃ।
যেন যূয়ং গমিষ্যন্তো ভবিষ্যথ তথাগতাঃ ॥" (টীকা)

মহাযান কথিত এই সহজমার্গই শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা এই মার্গকে অবলম্বন করেন, তাঁহারাই একমাত্র তথাগতরূপে মহাসুখে লগ্ন হইতে পারেন। রাজারা যেমন অন্যান্য সাধারণ পথে গমন করেন না, তাঁহারা শুধু কণকময় রাজপথই ব্যবহার করেন ক্রীড়া উদ্যানে প্রবেশ করার

জন্য, তদ্রূপ যোগীরাও একমাত্র অবধূতি মার্গকে অবলম্বন করিয়া মহাসুখচক্রে কমলবনে প্রবেশ করেন—"নান্যোপায়েন বুদ্ধত্বং শুদ্ধং চেদং জগত্রয়মিতি" (টীকা)

এই সংসার সমুদ্রের কোন শেষ পাওয়া যায় না। সেখানে ভেলা বা নৌকার সন্ধান পাওয়া যায় না ; এই পথে চলিতে হইলে, এই সংসার সমুদ্রের পরপারে শূন্য জগতে প্রবেশ করিতে হইলে, একমাত্র সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ ব্যতীত আর কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায় না—এমন কি চতুর্থানন্দ লাভের পরেও মায়ামোহকে গুরুর উপদেশ অবলম্বনে দূর করিতে হইবে—

''সর্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশেষ্যতে।
জ্ঞানত্রয়প্রভেদোঽয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে" (টীকা)
"ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥৫৮
রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥৫৯
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য স্বতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥৬০
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্নদর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥৬১
তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতি ॥৬২
রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥৬৩

(সাংখ্যকারিকা)

মানুষমাত্রই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত কার্যে নিযুক্ত হয় এবং অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইলে আর কার্য করিবার কোন প্রবৃত্তি না থাকায় কার্য হইতে বিরত হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ কার্যে নিযুক্ত হয়—কিন্তু তাহার

নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, পুরুষের মুক্তির উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি সৃষ্টি কার্যে অবতীর্ণ হয় এবং পুরুষমুক্তিলাভ করিলেই তাহার কার্য শেষ হয়, মুক্ত পুরুষের দিকে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেমন রঙ্গালয়ে জনসাধারণের সাক্ষাতে সুসজ্জিতা নর্তকী নৃত্য প্রদর্শন করে এবং কার্যশেষে নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিদেবীও পুরুষের উদ্দেশ্যে স্বকীয় কার্য শেষ হইলে, নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষের নিকট হইতে অপসৃত হয়। প্রকৃতির শব্দাদিরূপ কার্যদর্শনে পুরুষের ভোগ এবং প্রকৃতির স্বরূপদর্শনে (নিজকে প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন দেখিলেই) পুরুষের মোক্ষপথ নির্মিত হয়।

সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণা প্রকৃতি নানাপ্রকার উপায়ে অনুপকারী নির্গুণ পুরুষের উপকার করে—ইহাতে প্রকৃতির কোনই স্বার্থ থাকে না অর্থাৎ প্রকৃতি নিঃস্বার্থভাবে পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বের নর্তকীর দৃষ্টান্তকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া যায় না, যেহেতু নর্তকী নৃত্য হইতে অবসর গ্রহণের পরেও আবার দর্শকগণের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য পুনরায় নৃত্যে অবতীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত নর্তকী ও দর্শকগণের প্রভেদ এই যে পুরুষের পুনরায় সৃষ্টির জন্য কৌতূহল হয় না এবং প্রকৃতিও অতি লজ্জাশীলা। প্রকৃতি হইতে লজ্জাশীলা আর কেহ আছে কিনা, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। "আমি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি" প্রকৃতি এইরূপ লজ্জার বশবর্তী হইয়া আর পুরুষের দৃষ্টিপথে প্রকাশ পায় না।

সৃষ্টিজগতে যে বন্ধন, মুক্তি ও সংসার নামক অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হয়, তাহা শুধু প্রকৃতিরই কার্য, পুরুষের মোহের নিমিত্ত শুধু তাহার উপরে এই-গুলির আরোপ হয়। পুরুষ নির্গুণ ও স্বচ্ছ, পুরুষের বন্ধন, মুক্তি ও সংসার হয় না—প্রকৃতিই পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত নানাবিধ স্থূল শরীর সৃষ্টি করিয়া নিজেই বদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির আটটি রূপ—ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য,

অবৈরাগ্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটি রূপের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর বন্ধনযুক্ত হয় এবং জ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকত্ব উপলব্ধিতে মুক্তির পথ আরম্ভ হয়।

এইবার শূন্যতাপ্রাপ্তির পরে প্রভাস্বর শূন্যতার উচ্ছেদ করিয়া কোন আকার বিশিষ্ট চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রভাস্বর—পরিশোধিত স্বাধিষ্ঠান চিত্তের কথা ভাবিলে অর্থাৎ শূন্যতার ভিতর দিয়া সহজপথে অগ্রসর হইলে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। কিন্তু এখানেই স্থগিত হইয়া সামান্য সুখে লিপ্ত হইলে চলিবে না, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মায়াকে ধ্বংস করিয়া যোগী সর্বদা দিব্যনেত্রে শূন্যতা ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিবে—"অস্মিন মার্গঞ্চ প্রাপ্য প্রভাস্বরং শূন্যমিতি কৃত্বা উচ্ছেদপ্রসঙ্গং কৃত্বা ভ্রান্ত্যা মা করিষ্যসি ভো মূঢ়। অত্রৈব প্রভাস্বর পরিশোধিত—স্বাধিষ্ঠান চিত্তং ভাবয়ন্ পুনরষ্টসিদ্ধির্ভবতি নিসয়ঃ। তথা চাগমঃ—

"দগ্ধ্বা মায়াপুরং রম্যং সহসা জ্ঞানবহ্নিনা।
পশ্যন্তি সততং শূন্যং দিব্যনেত্রাঃ হি যোগিনঃ ॥" (টীকা)

চর্যাকার শান্তি মহানন্দে বামদক্ষিণ আভাসদ্বয় পরিহারপূর্বক বিষয় বাসনাতে মত্ত না হইয়া পরিশুদ্ধাবধূতি বিরমানন্দ মার্গে চলিয়াছেন—এই পথ হইতে সমস্ত আবরণ দূর হইয়া গিয়াছে, খাট, খাঁটি, মদ, তড় কিছুই নাই—স্তব্ধোন্মীলিত নেত্রে ধ্যানযোগে যুগনদ্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন—মস্তকাবনত অবস্থায় স্তিমিত চিত্তই চৈত্যের শূন্যতা প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিয়া শূন্য নেত্রে ধ্যানযোগে নিবিষ্ট। পাতঞ্জল কৃত যোগাঙ্গের সপ্তম অঙ্গ ধ্যান এই চর্যার ভিতরে বর্ণিত "সিদ্ধাচার্যেণ বামদক্ষিণাভাসদ্বয়ং পরিহারাৎ স্ফুটমিতিকৃত্বা ভাববিষয়োপসংহারং কৃতং। অস্মিন্ পরিশুদ্ধাবধূতী বিরমানন্দমার্গেণ গচ্ছেন্ সন্ ঘটকুটী গুল্মদালকাদিভয়ং ন বিদ্যতে। তৃণকণ্টকখল্লবিখল্লকাদ্যুপদ্রবং নাস্তীতি। অথাহ স্তব্ধোন্মীল্লিত লোচনে যুগনদ্ধং স পশ্যতীতি তথাচাগমঃ—

করোতি তরতামক্ষ্ণোঃ শিরশ্চাবমমতাং।
স্তৈমিত্যং চিত্তচৈত্যানাং শূন্যতা শূন্যতে ক্ষিণাং ॥" (টীকা)

"এবংকার বাখোড় মোড্ডিউ।
বিবিহ বি আপক বান্ধন তোড়িউ ॥ ধ্রু।
কাহ্নু বিল সঅ আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিণা করিণীরেঁ রিসঅ
তিম তিম তথতা মঅ গল বরিসঅ। ধ্রু ॥
ছড গই সঅল সহাবে সুধ
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু।
দশবল রঅ ণ হরিঅ দশদিসেঁ
বিদ্যা কবি দম কুঁ অকিলেসেঁ। ধ্রু ॥৯

(চর্যাপদ—কাহ্নুপাদ)

'এ' কার চন্দ্রাভাস এবং 'বং' কার সূর্য—এই দুইটি দিবারাত্রি, সদসৎ প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞানরূপ স্তম্ভদ্বয়কে বজ্রচাপের শূন্যতাবোধে মর্দন করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধপ্রকার পরমার্থজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বন্ধনগুলি খসিয়া গিয়াছে—"একারশ্চন্দ্রাভাসং বংকারঃ সূর্যঃ উভয়ং দিবারাত্রি-জ্ঞানং বাখোড়স্তম্ভদ্বয়ং মর্দয়িত্বা নিরাভাসীকৃত্য বজ্রজাপক্রমেণ।" (টীকা) মহাসুখলাভের পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণাচার্য কায়, বাক্ ও চিত্ত কোনটিরই উপলব্ধি করিতে পারেন না, উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে মহাসুখলাভের সন্ধানে—মহাশূন্যের দিকে। মদমত্ত মাতঙ্গের মত সহজ পথে মহাসুখকমল বনের দিকে ধাবমান সাধকের এই ধ্যান অবস্থাকে বর্ণনা করিতে গিয়া টীকাকার নাগার্জ্জুনের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বাহ্যং যস্তুদসৎ স্বভাববিরহাৎ জ্ঞানঞ্চ বীক্ষ্যচ্যবৎ
শূন্যং যৎ যৎ পরিকল্পিতং তদপি চাশূন্যং মতং কেবলম্।
ইত্যেবং পরিভাব্য ভাববিভবং নির্বিন্নতত্ত্বৈকধী
মায়ানাটকনৈক নিপুনো যোগীশ্বরঃ ক্রীড়তি।" (টীকা)

সমস্ত বাহ্যবস্তুর কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না, শুধু স্বরূপবোধের

অভাবে আমরা ইহার ভিতরে অস্তিত্বের আভাস পাই—এমন কি শূন্যতা পরিকল্পিত হইলেও, আবার তাহাকেও অশূন্য বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ শূন্যতার অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় না।

এইরূপভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই সাধক ধ্যানযোগের ভিতর গিয়া সমস্যার সমাধানে যত্নশীল হইয়া থাকেন, এই সমস্যাপূর্ণ ঘটনাটির নাম 'মায়ানাটক' দেওয়া হইয়াছে। নিপুণ নটের মত এই মায়ানাটক সাধক অভিনয় করেন। মত্তহস্তী যেমন হস্তিনীকে আক্রমণ করিলে মদ্‌গল বর্ষিত হয়, তদ্রূপ চিত্তগজেন্দ্রের সাথে নৈরাত্মাদেবীর পরস্পর সংঘর্ষের ফলে 'তথতা' মদ প্রবর্ষিত হয়, ভাব ও অভাবের বিচার লুপ্ত হইয়া যায়, জীবের ছয়টি গতি অণ্ডজ, জরায়ুজ, উপপাদুকা, সংস্বেদজ, দেব প্রকৃতি ও অসুর প্রকৃতি ভাবগুলি স্বভাববোধের দ্বারা অর্থাৎ শূন্যতা উপলব্ধির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে—"যথা বাহ্যকারী করিণ্যামির্ব্বা-মদং বহতি। তদ্বৎ ভগবতীনৈরাত্মাসঙ্গতয়া চিত্তগজেন্দ্রকৃষ্ণাচার্যপাদাঃ তথতামদং প্রবর্ষন্তি।" অণ্ডজাজরায়ুজাউপপাদুকাসংস্বেদজাদেবাসুর প্রকৃতিকাঃ সর্বে ভাবাঃ স্বভাবেন পরিশুদ্ধা যোগীন্দ্রস্য। বালাগ্রমপ্য-পরিশুদ্ধং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।" (টীকা)

দশবলরত্ন দশদিক হইতে আহৃত হওয়াতে তথতারত্নের প্রভাবে অবিদ্যাকরী দমিত হইল অর্থাৎ দশবলবৈশারদ্যাদি গুণযুক্ত তথতারত্ন দশদিক হইতে অনুভবাভ্যাসের বলে ইহা সম্ভব হইল—"দশবলবৈশার-দ্যাদি গুণযুক্তং তথতারত্নং দশদিগ্‌ব্যাপকতয়া অনুভাবাভ্যাসবলেন হারিতমস্মাকং। অতএব তথতারত্নপ্রভাবেণাবিদ্যাকরীন্দ্রস্য আসঙ্গেন দমনং (মদনং) কুরু" (টীকা)

বুদ্ধির উপরে যে সকল আবরণ স্বপ্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের স্বরূপত্ব-উপলব্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় এই বৈশারদ্যগুণে সেই বুদ্ধির স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থ স্থিতিপ্রবাহে পরিণত হয়—"নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ"—৪৭ (সমাধিপাদঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্রে)। "অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধি

সত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহবৈশারদ্যং” (ব্যাসভাষ্যে)

“তিনি এঁপাটেঁ লাগেলিরে অণহ কসণ ঘণ গাজই
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই ॥ধ্রু॥
মাতেল চীঅ-গঅন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ধ্রু॥
পাপ পুণ্য বেণি তিড়ি অ সিঅল মোড়ি অ খ ম্ভাবাণা
গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্তা পইঠ নিবাণা ॥ধ্রু॥
মহারসপানে মাতেলরে তিহুঅন সএল উ এ খী
পঞ্চ বিষয়রে নায়করে বিপখ কো বী ন দেখী ॥ধ্রু॥
খররবিকিরণ সন্তাপেরে গঅণাঙ্গণ গই পইবা
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিবা ॥ধ্রু॥১৬
(চর্যাপদ—মহাধরপাদ)

কায়, বাক্ ও চিত্তকে প্রত্যাহার পূর্বক তত্রস্থ ধারণার ভিতরে যে জ্ঞানমধু আবির্ভূত হয়, সিদ্ধাচার্য মহীধরের চিত্তগজেন্দ্র তাহা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ অনাহত শূন্যতা নাদের গর্জন শুনিতে পাইতেছেন এবং সেই অনাহত নাদের প্রভাবে স্কন্ধক্লেশাদি মারসৈন্য ভগ্নপ্রায় হইতেছে—

“অনাহতং শূন্যতাশব্দং। কসণং ভয়ানকং। শূন্যতানাদং শ্রুত্বা কণ্ঠগর্জনং করোতি। তমনাহতং শব্দং শ্রুত্বা সংসার ভয়ভূরাগন্তুকস্কন্ধক্লেশাদয়ো মারা ভগ্নাঃ। তথাচ রতিবজ্রে—“মন্ত্রপ্রয়োগমণ্ডলং যেন ভগ্নং মহাবলং। মারসৈন্যং মহাঘোরং শাক্যসিংহাদি ভিবুদ্ধৈঃ ॥”(টীকা)

অর্থাৎ শাক্যসিংহ প্রভৃতি বুদ্ধগণ কর্তৃক যেমন মহাশক্তিশালী মারসৈন্যগণ পরাভূত হইয়াছিল, সেইরূপ যে সকল মণ্ডলে এই অনাহত ধ্বনির প্রভাব রহিয়াছে, সেখান হইতে দোষাদি অপসৃত হইয়া যায়।

প্রমত্ত চিত্তগজেন্দ্র চন্দ্রসূর্য দিবারাত্রিরূপ বিকল্প দূরীভূত অবস্থায় চতুর্থানন্দের সন্ধান পাইয়া মহাসুখ সরোবরের দিকে নিরন্তর ধাবমান। পাপ ও পুণ্য এই সংসার বন্ধনদ্বয় ছিন্ন করিয়া অবিদ্যাস্তম্ভ দুইটিকে

বিমর্দ্দন পূর্বক সাধক শূন্যময় গগনে প্রতিভাত নির্বাণসরোবরের সন্ধানে ও ভাবাভাবের সন্ধানে ব্যস্ত। ভাবাভাবের উর্ধ্বে অবস্থিত শূন্যতারূপ মহাসুখরসপানে যোগীত্রিভুবনকে উপেক্ষা করিয়া পঞ্চ বিষয়ের উপর নায়কত্বলাভে বজ্রধররূপে প্রতিবন্ধক ক্লেশাদিকে ধ্বংস করিয়াছেন—

"স এব প্রমত্তো হি চিত্তগজেশ্চন্দ্রসূর্যদিবারাত্রিবিকল্পং ঘোলয়িত্বা গগনোপদেশশ্চতুর্থানন্দোপদেশং গৃহীত্বা গচ্ছতীতি মহাসুখসরসি নিরন্তরং।"

"পাপপুণ্যৌ সংসারপাপৌ দ্বৌ খণ্ডয়িত্বা। খন্তেতি অবিদ্যাস্তম্ভং মর্দ্দয়িত্বা। গগনটকেতি অনাহত শব্দেন প্রেরিতসন্ স এব চিত্তগজেন্দ্রো নির্বাণসরোবরংগতঃ।"

"ভাবাভাবয়োরৈক্যং মহাসুখরসং তেন পানে প্রমত্তঃ সন্ ত্রিভুবনস্য গ্রহোপেক্ষাং করোতি। ভাবাভাবগ্রাহ্যাদিবিকল্পং করোতি। অতএব পঞ্চবিষয়াণাং নায়কত্বেন স এব ষষ্ঠঃমহাবজ্রধরঃ। (টীকা)

মহাসুখরাগানলে উদ্দীপ্ত চিত্তগজেন্দ্র গগনগঙ্গামহাসুখসরোবরে স্বরূপ বা শূন্য ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না—এই অবস্থাই যোগ সূত্রে কথিত ধ্যান—"তস্মিন্ মগ্নে সতি ময়াহস্য স্বরূপং কিমপি ন দৃষ্টং নির্বিকল্পং।" (টীকা)

তিনি ভু অণ মই বাহিঅ হেলেঁ
হাঁউ সুতেলী মহাসুহ লীড়েঁ ।।ধ্রু।।
কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলা।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবা লী ।।ধ্রু।।
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ ।।ধ্রু।।
কেহে কেহো তোহারে বিরু আ বোলই।
বিদুজণ লো অ তোরেঁ কণ্ঠ ন ঘেলঈ ।।ধ্রু।।
কাহ্নে গাইতু কাম চণ্ডালী।
ডোম্বি তআ গলি নাহি ছাৗণালী ।।ধ্রু।।১৮

(চর্যাপদ—কৃষ্ণবজ্রপাদ)

সিদ্ধাচার্য মহীধর যে ধ্যানের বর্ণনা দিয়াছেন, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের মিলন ও পরস্পর পৃথকত্ব হওয়ার বিবরণ কৃষ্ণবজ্রপাদের এই চর্যার ভিতরেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণাচার্য বজ্রবণিতাভিষঙ্গহেতু ত্রিভুবনে শূন্যতা অনুভব করিতেছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ কায়, বাক্ ও চিত্তের প্রত্যাহার পূর্বক ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষমুক্ত অবস্থায় মহাসুখলীলায় অর্থাৎ যোগনিদ্রায় ধ্যানে নিমগ্ন—"ময়া কৃষ্ণাচার্যেণ বজ্রবণিতাভিষঙ্গাৎ ত্রিভুবনং কায়বাক্‌চিত্তং। তস্য ষষ্ঠ্যুত্তরশতপ্রকৃতিদোষেঽবহেলয়া বাধিতঃ। অতএবাহং সুপ্তং লীলেমিতি ক্রীড়য়া যোগনিদ্রাং গতঃ। নৈরাত্মধর্মাগবমাৎ" (টীকা)

প্রকৃতি সাতটি রূপে (ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, এবং অজ্ঞানতা) পুরুষের বন্ধন সৃষ্টি করে এবং এই প্রকৃতিই আবার জ্ঞান নামধেয় রূপ দর্শন করাইয়া পুরুষের মুক্তি সম্পাদন করে। এই চর্যাপদের ভিতরে প্রকৃতির বন্ধনকারিণী ও মুক্তিদাত্রী—এই উভয় প্রকার রূপই দেখা যায়—রজস্তমোময়ী (পূর্বোক্ত সপ্তরূপা) প্রকৃতি পুরুষের বন্ধনের সৃষ্টি করে এবং সত্ত্বময়ী প্রকৃতি (জ্ঞান) পুরুষের মুক্তি সম্পাদন করে—অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটি রূপ। ডোম্বীরমণীর ভিতরে এই দুইটি রূপের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, মুক্তি মার্গের অন্তঃপ্রদেশে বুদ্ধিসত্ত্বকে রাখিয়া দ্বিচারিণীরূপে রজঃ ও তমঃ গুণের আবরণে কাপালিকের (পুরুষের) সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ মায়াময়ী প্রকৃতির প্রভাবে দেবাসুর, মনুষ্য প্রভৃতি ত্রৈধাতুক মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে গ্রহণ করাতে তাহাদের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়, শশধর বা প্রভাস্বর-হেতুভূত সংবৃত্তিবোধিচিত্ত একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়—"ত্বয়া ডোম্বি ত্যাঽপরিশুদ্ধাবধূতিকয়া দেবাসুরমনুষ্যাদিত্রৈধাতুকং সকলং মিথ্যা জ্ঞানেন টালিতমিতি নাসিতম্। যত এব শশহরং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং প্রভাস্বর হেতুভূতং। অসম্প্রদায়যোগিন্যা টালিতমিতি বিনষ্টীকৃতং" (টীকা)।

কিন্তু যাঁহারা সহজানন্দ পরিশুদ্ধা প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সংসারের ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও

আধিদৈবিক) অভিভূতাবস্থায় প্রকৃতিকে দোষারোপ করেন। যে সকল প্রাদেশিক যোগী সম্যক্ বজ্রাব্জসংযোগাক্ষরসুখে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারাও তাঁহাকে রাত্রিদিন কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে ধারণ করেন—পরিত্যাগ করেন না—"যেহপি স্বরূপানভিজ্ঞা : সহজানন্দপরিশুদ্ধিতয়া তাং ডোম্বীং ন জানন্তি। তেহপি কর্মবসিতাং প্রাপ্য সংসার দুঃখানুভবাত্তব বিরুদ্ধং বদন্তি। যে তে প্রাদেশিকা যোগীন্দ্রা : সম্যক্‌বজ্রাব্জসংযোগাক্ষর সুখতয়া তাং প্রজানন্তি। তেহপি কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে অহর্নিশন্ন পরিত্যজন্তীতি।" (টীকা)

প্রকৃতির স্বভাব নিঃস্বার্থভাবে পুরুষের মুক্তির জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, তাই তাহাকে কামচণ্ডালীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—পুরুষকে মুক্তির পথে পৌঁছাইয়া দিয়া ছিন্ননাসিকা নাগরিকার মত পলায়ন করে, আর কখনও পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না—"ঈদৃশীকর্মসাধনোপায়চণ্ডালী কৃষ্ণাচার্যৈঃ পরমং গীয়তে নান্যৈঃ। ডোম্বী ব্যতিরেকাৎ নান্যা ছিন্ননাসিকা নাগরিকা বা বিদ্যতে। যস্মাৎ সত্ত্বভেদং প্রাপ্য ভেদাধিষ্ঠানং বিধত্তে ॥ (টীকা)

চিত্তরূপ মহাবীজ সৃষ্টি কার্যের দুইটি রূপ পুরুষ ও প্রকৃতি সংবৃত্তির ভিতর দিয়া যাহা লাভ করে, তাহাই নির্বাণ—

"চিত্তমেব মহাবীজং ভবনির্বাণয়োরপি।
সংবৃত্তৌ সংবৃত্তিঃযাতি নির্বাণে নিঃস্বভাবতাং ॥ (টীকা)

"ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা
মন পবন বেণি করণ্ড কশালা ॥ ধ্রু ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি নাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারি উ জাম
জাউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ ধ্রু ॥
অহিনিসি সুর অপসঙ্গে জাঅ
জোইনি জালে রএনি পোহা অ ॥ ধ্রু ॥

ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥ ধ্রু ॥ ১৯
(চর্যাপদ—কৃষ্ণপাদ)

প্রকৃতি, পুরুষ ও বুদ্ধির সঙ্গে সৃষ্টি জগতের ও জীবের কি সম্বন্ধ—তাহাই এই চর্যাপদের ভিতরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ধ্যানের ভিতর দিয়া ইহা সাধক অনুভব করেন। প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করেন, নিজের স্বার্থের জন্য নহে—পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত; অচেতনা প্রকৃতির সৃষ্টি উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের মত চেতন পুরুষের নিমিত্ত। এই সৃষ্টির আদিরূপ সপ্তদশ বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্ট লিঙ্গদেহ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চতন্মাত্র এবং বুদ্ধি—

"প্রধান সৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ"—৫৮
"সপ্তদশৈকং লিঙ্গং"—৯ (সাংখ্যদর্শনম্—তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

পুরুষ ও প্রকৃতির পৃথকত্ব মুক্তির উপায়, প্রকৃতির শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক বুদ্ধির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ না ঘটিলে মুক্তি সম্ভব হয় না। এই সপ্তদশপ্রকার প্রাকৃতিক উপাদানের ভিতরে বুদ্ধি বাদে অবশিষ্ট ষোলটির সহিত পৃথকবোধ আসিলে পুরুষ বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া ধ্যানযোগে সহজানন্দ লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে—

"সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥৩৫
এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥৩৬
সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানং পুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥৩৭
(সাংখ্যকারিকা)

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশটিকে বহিঃকরণ এবং মন ও অহঙ্কার এই দুইটিকে বলা হয় অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণদ্বয়ের যুক্ত

অবস্থায় বুদ্ধি সমস্ত গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে বলিয়া মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে বলা হয় দ্বারী অর্থাৎ দ্বার বিশিষ্ট প্রধান এবং অবশিষ্ট দশটিকে বলা হয় দ্বার স্বরূপ অর্থাৎ এইগুলির সাহায্যে গ্রাহ্যবিষয় অন্তঃকরণের নিকট উপস্থিত হয়। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণত্রয়ের ভিতরে বুদ্ধিই প্রধান বলিয়া বুদ্ধি ব্যতীত সমস্ত করণ—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার এইগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও জল, তৈল, সলিতা ও অগ্নি—এই পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী বস্তুসকল যেমন প্রদীপের আলোক উৎপাদন করে, তদ্রূপ এইগুলিও পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও প্রদীপের আলোকের ন্যায় আলোক সম্পন্ন বলিয়া পুরুষের নিমিত্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বুদ্ধির নিকটে সমর্পণ করিয়া থাকে অর্থাৎ সমস্ত কাজ যাহা ঘটে, সমস্তই বুদ্ধিতে সমর্পিত হয় এবং বুদ্ধি উহা পুরুষের উপরে আরোপ করে। পুরুষের সমস্ত শব্দাদির উপভোগ বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং এই বুদ্ধিই আবার পরে অতিদুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সম্পাদন করে—পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। ভোগ ও অপবর্গ এই উভয়ের ভিতর দিয়াই বুদ্ধি প্রধানরূপে পুরুষকে মুক্তির পথে নিয়া যায়—যেমন রাজার কর্মচারীগণ প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যে রাজাকে সমস্ত নিবেদন করে, তদ্রূপ করণসমূহও বুদ্ধির সাহায্যেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করাইয়া থাকে। অচেতনা বুদ্ধি চেতন পুরুষের সন্নিধানবশতঃ উহার ছায়া গ্রহণ করিয়া পুরুষের বিষয় ভোগ চেতনের ন্যায় সম্পাদন করে।

সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির নিমিত্ত মনপবনাদি বিকল্প পরিশোধন করিয়া (কাড়া ও মাদল উৎপ্রেক্ষাপূর্বক) মহাসুখ সঙ্গে অর্থাৎ শুক্রনাড়িকাকে (অপরিশুদ্ধা অবধূতিকা) বিবাহ করিতে কৃষ্ণাচার্য যাত্রা করিয়াছেন এবং শুভ বিবাহের চিহ্নস্বরূপ জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি ও এক আকাশভেদী দুন্দুভিধ্বনি চলিতেছে—আকাশ মুখরিত হইল এবং ডোম্বীবায়ুরূপার গমনদ্বার রুদ্ধ হইল। এইরূপে জাঁকজমকের সহিত ডোমনীর বিবাহ সম্পাদিত হইল—জন্ম উচ্ছিন্ন হইল, অনুত্তর ধর্মের সাক্ষাৎ

লাভ ঘটিল। এই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এইবার যোগী সপ্তরূপরহিতা প্রকৃতিদেবীর বা জ্ঞানমুদ্রার সহিত দিবারাত্রি সুরতরঙ্গে ব্রতী হইলে—ইহাই ধ্যান "ভবনির্বাণং মনপবনাদিবিকল্পং পূর্বোক্তক্রমেণ পরিশোধ্য তং পটহাদিভাণ্ডম্ উৎপ্রেক্ষ্য মহাসুখসঙ্গংগৃহীত্বা। ডোম্বীতি সৈব শুক্র-নাড়িকাহপরিশুদ্ধাবধূতিকা তস্যাঃ বাহবভঙ্গার্থং যদাঃ কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ প্রচালিতাঃ। তদা জয়ধ্বনিপুষ্পবৃষ্টিদুন্দুভিশব্দাদিকঃ আকাশে নিমিত্তং-প্রভূতমিতি।" "সৈব ডোম্বী তস্যা গমনদ্বারস্য বিবাহমিতি। ভঙ্গং কৃত্বা জয়মিতি। উৎপাদভঙ্গাদিদোষা নাশিতাঃ॥ অতএব জৌতকে-নাক্লেশেনানুত্তরধর্মসাক্ষাৎকৃতং।" "এতয়া জ্ঞানমুদ্রয়া সহ যস্য যোগীন্দ্র-স্যাহর্নিশং সুরতাভিষঙ্গোভবতি তস্য যোগীন্দ্রস্য যোগনীজালেনেতি। তস্য জ্ঞানরশ্মিনা। রএনীত্যাদি। ক্লেশান্ধকারং পলায়তে।" (টীকা)

বায়ুদ্বার নিরোধকে বিবাহ এবং বায়ুকে ডোম্বী কল্পনা করা হইয়াছে, বায়ুদ্বার রুদ্ধ অবস্থায় সাত্ত্বিকাপ্রকৃতির সঙ্গে অর্থাৎ জ্ঞানমুদ্রার সঙ্গে ধ্যানযোগে যোগীর যে মহাসুখলাভ, তাহাকেই পুরুষ ও রমণীর সুরত ক্রীড়ার সুখের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—শূন্যতার স্তর পার হইয়া ধ্যানবলে অতিশূন্যতার ভিতরে যোগী যে মহানন্দে মগ্ন, তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে—

"শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞাই নৈরাত্মারূপিণী নির্বাণ—উপায়ই সর্ব-সিদ্ধরূপ ভব। এই ভব ও নির্বাণের সামরস্যই হইল যুগনদ্ধতত্ত্ব—এই অদ্বয় যুগনদ্ধতত্ত্বই হইল পরমকাম্য"।[১]

> "আত্মন্যেব লয়ং গতে ভগবতি প্রাণাধিপে স্বামিনি
> শ্বাসোচ্ছ্বাসগণে প্রসমিতে জীবানিলে যন্ত্রিতে।
> যো জ্যোতিঃপ্রসবঃ প্রভাস্বরতরো যোগীশ্বরাণামসৌ
> সাঙ্গাদেব বিনির্গতো হততমাঃ ত্রৈলোক্যমাক্রামতি॥" (টীকা)

অর্থাৎ প্রাণের রাজা স্বামী যে আত্মাপুরুষ, তাহাতে প্রকৃতি ভগবতী লয় প্রাপ্ত হইলে পরে বায়ু ও জীবের ভিতরে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ৪র্থ অধ্যায়।

সম্বন্ধ আছে, তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার ফলে যোগীদের ভিতরে যে প্রভাস্বর উৎপন্ন হয়, তাহা যেন নিজ অঙ্গ হইতেই অন্ধকার-বিধ্বংসীরূপে বহির্গত হইয়া ত্রিলোককে ভেদ করিয়া চলিতে থাকে, বুদ্ধিরূপিণী প্রকৃতি ও পুরুষের স্বামী-পত্নী সম্বন্ধ সাংখ্যদর্শনও ঘোষণা করিয়াছে—

"সাধ্বী তু পতিং দৃষ্ট্বা যাথাথ্যেন তৎপরা।
ইহানন্দময়ী চান্তে পতিদেহে লয়ং ব্রজেৎ॥"৪২

(সাংখ্যসারঃ—তৃতীয় পরিচ্ছেদ, উত্তরভাগঃ)

অর্থাৎ যথাযথরূপে ইহলোকে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া পতিদেহে (আত্মার স্বরূপে) সাধ্বী বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই ডোম্বী নামে কথিতা নায়িকা প্রকৃতি প্রভাস্বরপরিশুদ্ধা অবধূতিকা অর্থাৎ রজস্তমোগুণরহিতা সাত্ত্বিকা প্রকৃতি অথবা সপ্তরূপ-রহিতা বুদ্ধিরূপিণী প্রকৃতি। এই নারীর সঙ্গে যোগী একবার সুরতরঙ্গে মত্ত হইলে সেই জ্ঞানমুদ্রারূপ মহাসুখানন্দের আধারকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে চাহেন না—"ডোম্বী সৈব প্রকৃতি প্রভাস্বরপরিশুদ্ধাবধূতিকা জ্ঞানমুদ্রাং মহাসুখানন্দধারত্বাৎ ক্ষণমপি ন পরিত্যজন্তীতি" (*টীকা*)

"জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হো নঠা
ন জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা॥ধ্রু॥
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ
আজদেব নিরাসে রাজই॥ধ্রু॥
চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ
চিঅ বিকরণে অহি টলি পইসই॥ধ্রু॥
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর॥ধ্রু॥
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ
ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ॥ধ্রু॥ ৩১

চর্যাপদ—আর্যদেব

এইবার পাতঞ্জলযোগকথিত ধ্যানের সঞ্চার হইল—প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—"২ (পাতঞ্জলযোগসূত্রে—বিভূতিপাদঃ) অর্থাৎ ধারণা নামক যোগাঙ্গসিদ্ধ হইলে, ধারণার ভিতরে সর্বাবরণমুক্ত অবস্থায় যখন একতানতা বা তন্ময়ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহাই ধ্যান। এইবার সাধকের ধ্যানাবিষ্ট অবস্থাতে চিত্ত, বায়ু ও ইন্দ্রিয়ের নাশ হয়; প্রভাস্বরসংহারমণ্ডলাদিক্রমে বিষয়, পবন ও ইন্দ্রিয় সকলের নিঃস্বভাবী অবস্থায় চিত্ত বিলীন অবস্থাতে রহিয়াছে। সংবৃত্তিবোধিচিত্তে অনাহত ধ্বনি হইতেছে—এই অদ্ভুত নাদধ্বনির মাহাত্ম্যে আর্যদেব নিরালম্ব অবস্থায় অতিশূন্যের ভিতরে অবস্থিত—"যস্মিন্ প্রভাস্বরে সংহার মণ্ডলাদিক্রমেণ বিষয়পবনেন্দ্রিয়াদিং নিঃস্বভাবীকরণং।" "করুণেতি সংবৃতিবোধিচিত্তং গুরুসম্প্রদায়াৎ। ডমরুকেতি অনাহতং শব্দং করোতি, অনাহতং হৃতজ্ঞানং বিবুধ্যতে। অতএব আর্যদেবপাদাঃ, নিরালম্বেন সর্বধর্মানুপলম্ভযোগেন রাজতে শোভতে।" (টীকা)

চন্দ্র অস্ত গেলে যেমন জ্যোৎস্না রাশি চন্দ্রেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ চিত্তও ধ্যানাবস্থায় অচিত্ততায় পর্যবসিত হয় অর্থাৎ প্রভাস্বরে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তের বিকল্পসকল চিত্তেই লয় প্রাপ্ত হয়—

"যথা অস্তং গতে চন্দ্রমসি তস্য চন্দ্রিকা তত্রৈব অন্তর্ভবতি, ইতি। চিত্তরাজোপি যদা অচিত্ততাং গচ্ছতি প্রভাস্বরং বিশতি তদা তস্য বিকল্পাবলী তত্রৈব লীনা ভবতীতি, তথাচাগমঃ—

অস্তং গতে চন্দ্রমসীব নূনং নারেন্দবঃ সংহরণং প্রযান্তি।

চিত্তং হি তদ্বৎ সহজেনিলীনে নশ্যন্ত্যমীসর্ববিকল্পদোষাঃ॥" (টীকা)

চিত্তের এই বিকল্পদোষের কথা পাতঞ্জলযোগেও দেখা যায়। শব্দ জগতে ও ভাবনার ভিতরে এমন কতকগুলি বিষয় আমরা সংজ্ঞাদ্বারা বর্ণনা করি যাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব বা কোন বস্তু নাই—যেমন আকাশকুসুম, ইহা চিত্তের একপ্রকার বৃত্তি—"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ"—৯ পাতঞ্জলযোগসূত্রে সমাধিপাদঃ

আজ সিদ্ধাচার্যের সমস্তরকম সাংসারিক বন্ধন মুক্ত হইল, ভয়,

লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি সমস্ত পার্থিবজ্ঞানযুক্ত অবিদ্যা দূর হইল, গুরুর উপদেশে আজ শূন্যতার ভিতরে অবস্থান করিয়া সমস্তই অস্তিত্ববিহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল; নৈরাত্মধারার ভিতর দিয়া শূন্যজগতে ভাসমান অবস্থায় অনাহতনাদের ভিতরে ধারণার ভিতর দিয়া প্রাপ্ত শূন্যতা আরও শূন্যতর বলিয়া মনে হইল এবং ধ্যানের ভিতর দিয়া অতিশূন্যতা স্তরে উপনীত হইল—

"গুরুবচনমার্গনিরীক্ষণেন শূন্যমিতি। ভাবং নৈরাত্ম্যরূপং দৃষ্টঃ।"

(টীকা)

অতিশূন্যকে বর্ণনা করা হয় আলোকাভাসরূপে, আলোকজ্ঞান হইতেই ইহার উৎপত্তি। শূন্যতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা আর অতিশূন্যতার নাম উপায়, ইহার অপর নাম পরিকল্পিত, ইহাই লয়গত চিত্তের অবস্থা। অতিশূন্যতাকে দক্ষিণ, সূর্যমণ্ডল এবং বজ্ররূপে অভিহিত করা হইয়াছে এবং এখানেও কাম, আনন্দ, সন্তোষ, ভোগ, সুখ প্রভৃতি ক্ষণিকতা শূন্যতার স্পর্শে আছে।

মহাশূন্যতা

সমাধি—ধ্যানবলে সাধক যখন অতিশূন্যস্তরে অবস্থান করেন, তখন এই ধ্যানমগ্নতা বিভিন্ন সাধনার কৌশলের ভিতর দিয়া আরও সূক্ষ্মতর স্তরে গতিবিস্তার করিতে থাকে—যাহার ফলে মহাশূন্যতাবোধ আসিবে। পাতঞ্জলযোগের অষ্টম যোগাঙ্গ—সমাধিই মহাশূন্যতা

"উচাঁ উচাঁ পাবত, তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পর হিণ সবরী গিবতগুঞ্জরী মালী ॥ধ্রু॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা করগুলী গুহাডা তো হৌরি
নিঅ ঘরনীনামে সহজ সুন্দরী ॥ধ্রু॥
নানা তরুবর মৌলিলরে গগনত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ-কুণ্ডল বজ্রধারী ॥ধ্রু॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণিদারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥ধ্রু॥

হিঅ তাবুলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ধ্রু॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মনে বাণেঁ
একে শরসন্ধানে বিন্দহ বিন্দহ পরম নিবাণে ॥ধ্রু॥
উমতো সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর সিহ সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ধ্রু॥২৮

(চর্যাপদ—শবরপাদ)

এখানে ধ্যানযোগে নৈরাত্মার সঙ্গে সাধকের সুরতসংযোগের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং সমাধিতে তাহার চরম পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে। "এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধ সহজিয়া—তথা বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের দেবী, এই জন্যই তিনি সর্বদা সহস্বরূপ বা সহজানন্দদায়িনী। এই সহজ আনন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাত্মারূপিণী বা আদরিণী নৈরামণি। এই আনন্দস্বরূপিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাহাকে ক্রমে হৃদয়ে (ধর্মচক্রে) ধারণ—এই সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সহিত বজ্রধর সাধকের চিত্তের সুরতযোগ—এই সুরতযোগের পরিণতি দেহপর্বতের উচ্চশিখরে উষ্ণীষকমলে অচ্যুত সহজানন্দের পূর্ণানুভূতিতে—সেই অনুভূতির সাধকচিত্তের সহজস্বরূপিণীর ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব—তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত বজ্রধরের যুগনদ্ধস্থিতি।"[১]

সিদ্ধাচার্য শবরপাদ দেহকঙ্কালকে পর্বতরূপে কল্পনা করিয়া মহাসুখ-চক্রকে সুমেরু শিখর এবং নৈরাত্মাদেবীকে উচ্চপর্বতবাসিনী ময়ূর-পুচ্ছপরিহিতা গুঞ্জমালাশোভিতা প্রেমময়ী শবর বালিকারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীবাদেশের গুঞ্জমালা ও পরিহিত ময়ূরপুচ্ছ বলিতে গুহ্যমন্ত্র ও বিকল্পরূপকে যথাক্রমে বুঝাইতেছে। নৈরাত্মা যেমন সপ্তরূপনিবৃত্তা প্রকৃতিরূপে বর্ণিতা, তদ্রূপ 'সোহং' তত্ত্বেরও অবতারণা

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য —শশিভূষণ দাশগুপ্ত,৪র্থ অধ্যায়।

করা হইয়াছে—"যোগীন্দ্রস্য সকায়কঙ্কালদণ্ডমুন্নতং সুমেরুশিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে। সকারপরোহংকারঃ সন্ পরিধরঃ। তস্য গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা অঁকারজবসতি। ময়ূরাঙ্গমিতি। নানাবিচিত্র পক্ষবিকল্পরূপং স্বরূপেণ—অধিবাস্যতয়া পরিধানমলঙ্কারং কৃতং, গুঞ্জেতি গ্রীবায়াং সম্ভোগচক্রে গুহ্যমন্ত্রমাবিবেকেহপি বিধৃতা।" (টীকা)

প্রকৃতি জীব বা হংসকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি কার্য নির্বাহ করিতেছে এবং জীব প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকত্বজ্ঞান লাভ করার পর ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করে—ইহাই হংসতত্ত্ব।

"সর্বাজীবে সর্বাসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানাং প্রেরিতরমং মত্বা জুষ্টস্তোমৃতত্বমিতি॥

(শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্—১ম অধ্যায়)

তন্ত্রশাস্ত্রের এই 'হংসতত্ত্বের' বিশ্লেষণে হংসকে প্রকৃতিরূপে এবং ওঁকারকে প্রকৃতির গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—

জীবমাত্রই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সর্বসময়ে এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে—প্রতি দিবা ও রাত্রিতে এই জপের সংখ্যা—৬০০০২১ বার ঃ

"হংসেতি প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঁকারঃ প্রকৃতে গুণাঃ।
হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ॥
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।
ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥"

(প্রচলিত শ্লোক)

অতএব দেখা যায় যে, 'হং' এই ধ্বনি নাসিকা হইতে নির্গত হয় এবং 'সঃ' এই ধ্বনি নাসিকাতে প্রবেশ করে। ভিতর হইতে ধরিলে ইহা দাঁড়াইবে 'হংসঃ' এবং বাহির হইতে ধরিলে ইহা দাঁড়াইবে—'সোহহং (সঃ + অহং)। পাণিনিকৃত বর্ণমালাতে বিসর্গ ও অনুস্বারের কোন উল্লেখ না দেখিলেও উচ্চারণঘটিত সূত্রের ভিতরে বিসর্গ ও অনুস্বারের সংজ্ঞা পাওয়া যায়—

"অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ", 'নাসিকানুস্বারস্য'।

এই জ্ঞানরূপা প্রকৃতি (সহজসুন্দরী) জীবের নিজ ঘরণী মুক্তিদাত্রী। অবিদ্যারূপ তরুবর মুকুলিত হইল, শাখাপ্রশাখা গগন ভেদ করিল; কিন্তু প্রভাস্বরে উপনীত হইলে আনন্দাদি মন্ত্রের দ্বারা অবিদ্যাতরু বিনষ্ট হইল। তাই দেখা যায় যে, বজ্রোপায়জ্ঞানশোভিতা যুগনদ্ধরূপে কায়পর্বত বনে ক্রীড়াশালা—"তরুবরং অবিদ্যারূপং, আনন্দাদিমন্ত্রেণ নানাপ্রকারেণ মুকুলিতনিজরূপং গতং। অস্য ডালঞ্চ পঞ্চস্কন্ধং গগনে প্রভাস্বরে লগ্নং। অতএব সা নৈরাত্মা একক। কর্ণৈতি নানাস্থানে কুণ্ডলাদিপঞ্চমুদ্রানিরংশুকালঙ্কারং কৃত্বা বজ্রমুপায়জ্ঞানং বিধৃত্যযুগনদ্ধ-রূপেণ অত্র কায়পর্বতবনে, হিণ্ডতি ক্রীড়তি।" (টীকা)

কায়, বাক্ ও চিত্তরূপ তিন ধাতুর খাটে সুখপ্রভাস্বরে মহাসুখশয্যায় শায়িত শবর নৈরাত্মার সহিত প্রেমলীলায় রাত্রি শেষ করিল অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের দ্বারা বাঁধাবিকল্প দূর হইল। কামসুখে তাম্বুল ও কর্পূর সেবন সুখবর্দ্ধক হয়, প্রভাস্বরে যুগনদ্ধরূপ আনন্দলাভ করিলেও শূন্যতারূপ সহজানন্দ গাঢ়তর হইয়া থাকে; সমস্ত আকারের আভাস দূরীকৃত হওয়ায় সম্ভোগচক্রে মহাসমাধিতে চিত্তরজনীর অবসান ঘটে—"হৃদয়ং প্রভাস্বরং তাম্বুলেনাধিমুচ্য কর্পূরং যুগনদ্ধরূপেণ ফলহেতু সম্বন্ধেন তমধিমুচ্য। শূন্যমিতি সৈব সর্বাকারবরোপেতশূন্যতা নৈরাত্মজ্ঞান-যোগিনী। কণ্ঠেতি সম্ভোগচক্রেবিধৃতা মহাসুখজ্ঞানরশ্মিনা রজনীতি, স্বকায়ক্লেশতমঃ স্বয়ং নাশিতং।" (টীকা)

সদ্গুরুবাক্যকে ধনুরূপে গ্রহণ করিয়া মন নামক মৃগকে হনন করিতে হইবে; ইহার ভিতরেও পূর্ববর্ণিত হংসতত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে—'একস্বরনির্ঘোষের' দ্বারাই সমাধিসিদ্ধি হইবে। জ্ঞানানন্দ গন্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মহাসুখচক্রে নলিনীবনোদ্দেশ্যে চলিয়াছে—

"একরসং বাণমিতি উভয়োরেকং কৃত্বা একস্বর নির্ঘোষেণ তমভ্যস্যমানঃ সন্ তেন নির্বাণেন ময়া সবরপাদেন অনাদ্যবিদ্যাবাসনাদোষঃ হি হতঃ।" "সহজপানপ্রমত্তো মম চিত্তবজ্রোহি সবরঃ গরুআ রোষেণেতি জ্ঞানানন্দ-গন্ধেন প্রেরিতসন্ মহাসুখচক্রনলিনীবনোদ্দেশেন প্রচলিতঃ।" (টীকা)

"পেখু সুঅণে অদশ জইসা
অন্তরালে মোহ তইসা ॥ ধ্রু ॥
মোহদ বিমুক্কা জই মাণা
তবেঁ তুটই অবনগমনা ॥ ধ্রু ॥
নৌ দাটই নৌ তিমই ন চ্ছিজ্জই
পেখ মোঅ মোহে বলি বলি বাবাই ॥ ধ্রু ॥
ছাঅ মাআ কায় সমাণা
বেণি পাখেঁ সোই বিণা ॥ ধ্রু ॥
চিঅ তথাতাস্বভাবে যোহিঅ
ভণই জঅনন্দি ফুড় অন ন হোই ॥ ধ্রু ॥৪৬

(চর্যাপদ—জয়নন্দীপাদ)

শূন্যতা ও অতিশূন্যতা স্তর উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ধ্যানবলে সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া সাধক মহাশূন্যতাবোধে উদ্দীপ্ত, তাই মহাশূন্যের দর্পণের ভিতরে যেন সর্বশূন্যতার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আজ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অবশিষ্ট যতটুকু মোহ ও বাসনা আছে অর্থাৎ প্রকৃতিদোষ রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার উচ্চে আরোহণের বাধাস্বরূপ, সদ্‌গুরুবচনের দ্বারা চিত্তকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত না করিতে পারিলে, জন্ম ও মরণকে রহিত করিতে পারা যায় না, চিত্তের লয় হইলেই এমন বজ্রশক্তির মত সর্বশূন্যতার সৃষ্টি হইবে, যাহাকে জল প্লাবিত করিতে পারিবে না, অগ্নিও দগ্ধ করিতে পারিবে না। ছায়ার মত যে মায়া বা অবিদ্যা রহিয়াছে, তাহা ছিন্ন হইলেই সাধকের চিত্ত তথতা প্রাপ্ত হইবে। জয়নন্দীপাদ বলিতেছেন যে, প্রজ্ঞাপারমিতার সাহায্যে যখন প্রকৃতির মোহ আবরণ ধ্বংস হয় এবং প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকত্ব সম্পাদিত হয়, তখনই চিত্ত অন্যতাভাব পরিত্যাগ না করিয়া তথতাভাব প্রাপ্ত হয়—ইহাই সর্বশূন্যতা—"যথা স্বপ্নে স্বপ্রতিভাসং যথাদর্শে প্রতিবিম্বং তাদৃশমন্তরা ভববিজ্ঞানং পশ্য"।

"সদ্‌গুরুচরণপঙ্কজরজঃ প্রসঙ্গাৎ তদেব সংস্কারমনো যদি মোহবিমুক্তং

ভবতি। তদাগ্নিনা ন দগ্ধং ভবতি। জলেন ন প্লাবনীয়ং ভবতি। শস্ত্রেণ ছেত্তুং ন পার্য্যতে।" "প্রজ্ঞাপারমিতার্থমহারসেন চিত্তবাসনাদোষ-বিশোধনং যদি ক্রিয়তে বুধৈঃ। তদা জয়ানন্দপাদো হি বদতি। চিত্তমন্য-থাভাবং ন ভবতি। তথতাবিশুদ্ধো হি যঃ স তথাপরং ভবতি"। (টীকা)

"সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ
বিলসই দারিক গঅনত পারিম কূলেঁ॥ ধ্রু॥
অলক্ষলখচিত্তা মহাসুহে
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলেঁ॥ ধ্রু॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণবখাণে।
অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ॥ ধ্রু॥
দুখেঁ সুখেঁ একু করিয়া ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী॥ ধ্রু॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুঅনেঁ লধা॥ ধ্রু॥ ৩৪

(চর্যাপদ—দারিকপাদ)

শূন্য ও করুণার মিলনে সমরসের ভিতর দিয়া মহাসুখ প্রাপ্তির কথা বলা হইতেছে। কায়, বাক্ ও চিত্তের অভিন্ন আচরণে শূন্য ও করুণার মিলনের ভিতরে দারিকপাদ মহাশূন্যে বিলাসরত। শূন্যস্তর ও অতি শূন্যস্তর পার হইয়া মহাশূন্যতার ভিতরে সমাধিমগ্ন অবস্থায় সর্বশূন্যতাই লক্ষ্য বস্তু, আর সমস্ত বস্তু লক্ষ্যের বহির্ভূত। গগন বলিতে এখানে আলোকত্রয় অর্থাৎ শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্যকে বুঝাইতেছে। মহাশূন্যের পারে সর্বশূন্যের উদ্দেশ্যে আজ দারিক সাধনারত—"উভয়-মভেদোপচারেণ গৃহীত্বা বজ্রগুরুপ্রসাদাৎ সিদ্ধাচার্যোহি দারিকঃ। গগনমিতি আলোকাদিশূন্যত্রয়ং বোদ্ধব্যং তস্যপারং প্রভাস্বরো মহাসুখেন পরিশুদ্ধ কায়বাক্ চিত্তাবির্ভাবনিয়মেন বিলসতি, তথাচাগমঃ—

"ভাবেভ্যঃ শূন্যতা নান্যো চ ভাবোস্তি তাং বিনেত্যাদি"। (টীকা)

মন্ত্র, তন্ত্র বা ধ্যান ব্যাখ্যানের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠান সুখলাভ হয়, উহা

দ্বারা মহাসুখ লাভ সম্ভব নহে—মহাসুখে লীন না হইলে পরম নির্বাণ সম্ভব নহে। বিষয়েন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগ করিয়া গুরুর বচন পালন করিয়াছেন বলিয়াই গুরু নির্দেশিত পথাবলম্বনে দারিকপাদ সংসারে আর আপন পর ভেদ করেন না এবং দেহসুখ ও ঐশ্বর্যাদির মোহমুক্ত অবস্থায় দ্বাদশভুবনের তত্ত্বজ্ঞানে মহাশূন্যের সমাধিতে মগ্ন—"তন্ত্রপাঠেন চ ধ্যানব্যাখ্যানেন বা কিম্। অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখলীলয়া তব নির্বাণং দুর্লক্ষ্যং গুরুচরণরেণুপ্রসাদাৎ প্রসিদ্ধমেব"। রা আ ইত্যাদি। উক্তিত্রয়েণ স্বকীয়ং কায়ৈশ্বর্য্যাদিকং গুণং সূচিতং, অন্যে যে দেবা নাগেন্দ্রাদয়ো বিষয় মোহেন বদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি, বয়ং পুনঃ লুয়ীপাদ প্রসাদাৎ দ্বাদশভূমিনো জিনসখাঃ। (টীকা)

ধ্যানযোগের পরেই সমাধির পথে যাত্রা আরম্ভ হয় অর্থাৎ অতি শূন্যতার পর হইতে মহাশূন্যের দিকে যাইতে যাইতে চিত্তের নির্মলাবস্থায় মনোনিবেশ বা একাগ্রশক্তিলাভের ফলে কি পরমাণু, কি পরমমহৎ—সর্বত্র চিত্ত স্থিরতা লাভ করে, কিছুতেই কুণ্ঠিত বা বিক্ষিপ্ত হয় না। এমন কি সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্যন্ত সর্বত্র সমুদয় বস্তুই গ্রাহ্য, প্রকাশ্য ও বশ্য হয়, স্ফটিক মণির মত নির্বৃত্তিক নির্মল চিত্ত যে বস্তুতে অর্পিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুতেই সমাশক্ত, স্থির ও তন্ময় হইয়া থাকে এবং অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন চিত্তের সমাপত্তি বা তন্ময়তার মধ্যে শব্দজ্ঞান বা অর্থজ্ঞানের দ্বারা সংকীর্ণ বিশিষ্ট বৈশিষ্টভাবে যাহা স্ফুরিত হয়, তাহাই সবিতর্ক সমাপত্তি—"তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ—১। শব্দের ও অর্থের স্মৃতিপরিশুদ্ধ অর্থাৎ চিত্তে বিলীন হইলে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুই প্রতিভাত হয়, ইহাই নির্বিতর্কা সমাপত্তি—"স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসং নির্বিতর্কা।"২

সবিচার ও নির্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং এখানে ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, ও অহঙ্কার প্রভৃতি স্তর পার হইয়া তাহার শেষ সীমা বা

১-২। পাতঞ্জলসূত্রে, সমাধিপাদে—৪২, ৪৩

পরিণতিতে পরিসমাপ্তি লাভ করে। আবার নির্মল চিত্তের অভিমত বস্তুতে তন্ময়তার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। এখন দেখা যায় যে, চিত্তমূলে তন্ময় হইলেও বিকল্প জ্ঞান দূরীভূত না হওয়ার দরুণ সমাধির নাম সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক এবং সূক্ষ্ম আলম্বনে তন্ময় হইলে, সেই সমাধির নাম সবিচার ও নির্বিচার অর্থাৎ স্বরূপাবলম্বনে যে সমাধিপ্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়—ইহার ফল শূন্যতা—"এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।" ৩

"তত্রাপ্যেক বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমেবাদি—ধর্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মালম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে যা পুনঃ সর্বথা সর্বতঃ সাম্ভোদিতব্যপদেশ্য ধর্মানবচ্ছিন্নেষু সর্বধর্মানুপপত্তিষু সর্বধর্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্বিচারা উচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মং এতেনৈবস্বরূপেনালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসং যদা ভবতি তদা নির্বিচারেত্যুচ্যতে, তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নির্বিতর্কা চ এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি।' (ব্যাসভাষ্যে)

আলম্বনীয় সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে প্রথম পঞ্চ মহাভূত, তদপেক্ষা তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়, তদপেক্ষা অহংতত্ত্ব, তদাপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকৃতি— "সূক্ষ্মবিষয়ত্ব-মলিঙ্গপর্যবসানম্।"৪

প্রকৃতি পর্যন্ত উহাদের সীমা বলিয়া উল্লিখিত ও সমাধিচতুষ্টয়কে সবীজ সমাধি বলে, যেহেতু উহা বীজের মত অঙ্কুরজনক অর্থাৎ ঐ সকল সমাধিতে সংসারাবস্থার বীজ থাকে বলিয়া সমাধিভঙ্গের পর পুনর্বার তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে— "তাএব সবীজঃ সমাধিঃ"। ৫

অতএব দেখা যায় যে সমাধি নামক যোগাঙ্গের ক্রম বিবর্তনের ভিতর দিয়া সবিতর্ক, নির্বিতর্ক ও সবিচার—এই তিন স্তর পার হইয়া নির্বিচার সমাধিতে দোষ ও সর্বপ্রকার ক্লেশাদিমুক্ত অবস্থায় উপনীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকারে নির্মল হয়—ইহাই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—

৩-৫। পাতঞ্জলসূত্রে ; সমাধিপাদে—৪৪, ৪৫, ৪৬

"নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ" ৪৭ (পাতঞ্জলসূত্রে—সমাধিপাদঃ)। তৎকালে যে জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহাই প্রজ্ঞা এবং এই প্রজ্ঞা কেবল ঋত বা সত্যকে প্রকাশ করে বলিয়া ইহার নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা —"ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা"—৪৮ (পাতঞ্জলসূত্রে সমাধিপাদঃ)। কিন্তু এই প্রজ্ঞা লাভেই সংস্কার দূরীভূত হয় না—ইহাও কৈবল্যলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া তাহারও নিরোধ প্রয়োজন হয়—এই নিরুদ্ধ অবস্থাই নির্বীজ সমাধি—"তস্যাপি নিরোধে সর্ববৃত্তিনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ" —৫১ (পাতঞ্জলসূত্রে সমাধিপাদঃ)। ব্যাসভাষ্যে—"ব্যুত্থাননিরোধ-সমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাম্প্রকৃতাবস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে, তস্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ যস্মাৎ অবসিতাধিকারং সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনিবর্ততে তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষস্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ ততোশুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।" আরও দেখা যায় যে, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়বস্তুতে লীন হয়, আকার লোপে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্বরূপশূন্যের ন্যায় অস্তিত্বহীন অবস্থায় নীত হইলেই সমাধি বা মহাশূন্যের আবির্ভাব ঘটে—"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ—৩ (পাতঞ্জলসূত্রে বিভূতিপাদঃ)।

মহাশূন্যের জন্ম প্রজ্ঞা বা উপায় বা আলোক এবং আলোকাভাসের বা শূন্য বা অতিশূন্যের সমন্বয়ে এবং উহার অপর নাম আলোকোপলব্ধি, ইহার স্বভাব পরিনিষ্পন্ন—তথাপি ইহাকে বলা হয় অবিদ্যা, ইহাকে আবার স্বাধিষ্ঠানচিত্তও বলা হয়, ইহার সঙ্গে বিস্মৃতি, ভ্রান্তি প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতিদোষ সংশ্লিষ্টাবস্থায় আছে। এইরূপে আলোক, আলোকাভাস ও আলোকোপলব্ধি নামক তিনটি বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায়, এই শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্য অবস্থাত্রয় তখনও ১৬০ প্রকার অশুদ্ধির সহিত জড়িত অবস্থায় থাকে এবং দিনরাত্র ব্যাপিয়া বায়ুর সহিত প্রবাহিত হয়। ইহাব নাম বাহন, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি-দোষগুলি নিজ নিজ কাজে রত থাকে। শূন্যতার ক্ষেত্রে বায়ু ও ভাবধারা একত্র প্রবাহিত হয়, অতিশূন্য অবস্থায় বায়ুর উপর ভাবের

প্রাধান্য দেখা যায় এবং মহাশূন্য অবস্থায় ভাব ও বায়ু মিশ্রিত হইয়া সত্তাহীন হইয়া পড়ে। প্রজ্ঞা যদিও খাঁটি বিবেক ও আকাশতুল্য মাধ্যম অবস্থায় থাকে, তবুও যেমন আকাশের ভিতরে গোধূলি, রাত্রি ও দিনের অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রজ্ঞার ভিতরেও পরিবর্তনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অতএব সমাধিতে পৌঁছিলেও সাধকের ভিতরে সর্বশূন্যতা বা নির্বাণ লাভ ঘটে না, তাই সর্বশূন্যতা লাভ করিবার জন্য তখনও সাধনার ধারা অবলম্বন করিতে হয়।

সর্বশূন্যতা

সমাধির পরবর্তী ফল সর্বশূন্যতা, সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত মহাশূন্য অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা উপায়, আলোক বা আলোকাভাস প্রভৃতি দ্বৈত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ অদ্বৈতের দিকে নির্বাণপ্রার্থীর যাত্রা সুরু হয়। সহজযানীরা অদ্বৈতের ভিতর দিয়াই মহাসুখ বা নির্বাণলাভের উপায়স্বরূপ যৌনযোগাভ্যাসের পথ দেখিতে পান এবং তাঁহাদের মতে "Body is the microcosm of the universe."

তিশরণ ণাবী কি অ অঠক কুমারী
নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী ॥ধ্রু॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মা অ সুইনা
মঝ বেণী তরঙ্গম মুনি আ ॥ধ্রু॥
পঞ্চ তথাগত কি অ কেরুয়াল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥ধ্রু॥
গন্ধ পরপর জই সোঁ তইসোঁ
নিংদবিহুনে সুইনা জই সোঁ ॥ধ্রু॥
চিঅ কন্নহার সুনত মাঙ্গে
চলিল কাহ্ন মহাসুখ সাঙ্গে ॥ধ্রু॥

কায়, বাক্ ও চিত্তের তরণীতে আরোহন করিয়া বুদ্ধি, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অষ্টশক্তির আয়ত্তে সন্তুষ্ট না হইয়া শূন্য ও করুণাকে উপলব্ধি পূর্বক

যুগনদ্ধমহাসুখলাভে ও সর্বশূন্যতা বোধে তৃপ্ত সাধক চতুর্থানন্দের আধার নৌকাতে মায়াময় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, পরমানন্দে চিত্ততরঙ্গে দোলায়মান কায়নৌকাতে চলিয়াছেন—"ত্রয়কায়বাক্‌চিত্তং। যস্মিন্ চতুর্থে শরণে লীনং গতং মহাসুখকায়ং নৌকা সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্। অতএব শূন্যতাকরুণয়োরৈক্যং নিজ দেহে যুগনদ্ধরূপং তেন মহাসুখকায়েন। অঠকমারীতি বুদ্ধৈশ্বর্যাদিসুখমনুভূতম্।"

"তেন চতুর্থানন্দোপায়নৌকয়া ভবসমুদ্রং কৃষ্ণাচার্যেণ তীর্ণং। মায়াময়স্বপ্নোপমং চ কৃত্বেতি। মধ্যবেণীকায়াং পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠান চিত্তস্য তরঙ্গং উল্লোলং সুখং মায়েতি ইত্যাত্মবেদনং ন প্রতীক্ষতে।" (টীকা)

বিশুদ্ধ পঞ্চতথাগতাত্মক নিজদেহকে মহাসুখ নৌকারূপে গ্রহণ করতঃ কাহ্ন বাহিয়া চলিয়াছে, মায়াজালরূপ স্কন্ধ, ধাতু প্রভৃতি বিষয়-সমুদ্র বাধাকে অতিক্রম করিতে হইবে—"স্কন্ধশ্চ ধাতুশ্চ তথেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈবস্কৃতপ্রভেদাঃ, তথাগতাধিষ্ঠিত এক একশঃ সংসার কর্মাণি কুতো ভবন্তি।" (টীকা) অর্থাৎ স্কন্ধ, ধাতু ও ইন্দ্রিয় সকল তথাগতাধিষ্ঠিত-সাধককে প্রতিটি এক বার করিয়া মুক্তি পথে বাধা প্রদান করে। কিন্তু আজ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, নিদ্রাস্ত্যান-রহিত সর্বধর্মের স্বরূপবোধে জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নবৎ মনে হওয়াতে সর্বাকাররহিত শূন্যতার ভিতর দিয়া সাধক আজ সর্বশূন্যতায় অর্থাৎ মহাসুখ-চক্রদ্বীপে পৌঁছিয়াছেন—"বাহ্যং গন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ং যথৈবাস্তু তথৈবাস্তু। সর্বধর্মস্বরূপাবগমেনাস্মাৎ প্রতিনিদ্রাস্ত্যান রহিততয়া জাগ্রতাবস্থায়াং স্বপ্নবৎ প্রতিভাতি।" সর্বাকারবরোপেত শূন্যতানৌ-মার্গে চিত্তকর্ণধারংসমারোপ্য তৎপ্রসঙ্গেন কৃষ্ণাচার্যচরণাঃ মহাসুখ-চক্রদ্বীপং গতাঃ।" (টীকা)

'ত্রিশরণ নাবী' কথাটি সাধারণতঃ বুঝায়—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"—বৌদ্ধধর্মের এই তিনটি উক্তিই মানবজীবনের পালনীয় নীতি এবং এই নীতি পালনের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিকপথের সোপান—কায়, বাক্ ও চিত্তের সংযম সাধিত

হয়।—বৈষ্ণবপদাবলীতে আছে :—

কায়িকী বাচিকী মানসিকি তিন
রসিক মরম জানে।
তিনের ত্রিবিধা নবম জানয়ে
শ্রীমতি করুণাগুনে ॥"১

'অঠকমারী' কথাটার ভিতরে দেখা যায় প্রকৃতির আটটি রূপ—ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং মানবদেহও প্রকৃতি জাত। আবার প্রকৃতির প্রথম সাতটি বিকার ও প্রকৃতি স্বয়ং—আটটি তত্ত্বকেও বুঝায়, এতদ্ব্যতীত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—নামধেয় তিনটি উপাদানও 'ত্রিশরণ নাবী' বলিতে বুঝা যায়, কারণ বিশ্বের নৌকাস্বরূপ প্রকৃতির আটটি রূপ ও তিনটি গুণকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের লীলা খেলা চলিতেছে।২

পাতঞ্জল দর্শনের "স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাৎ ভূতজয়ঃ—৩।৪৫" অনুসারে 'পঞ্চতথাগত', 'কি অ কেরু আল' এবং 'গন্ধ পরপর জই সোঁ তই সোঁ'—কথাত্রয়কে বিশ্লেষণ করা হইতেছে। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব—এই পঞ্চবিধ রূপ বা বিশেষ বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থা সর্বভূতে বিরাজমান এবং এই গুলির সংযমসাধনে ভূত জয় হয় অর্থাৎ মহাভূত সমূহ বশীভূত হইয়া যায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত যে পরিবর্তিত হয়, তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্তরই স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব নামে কথিত—

১। স্থূলরূপ—পরিপুষ্ট শব্দাদিগুণের আধার যে স্থূলতম রূপ ভূতগণের বর্তমান পরিদৃশ্যমান অবস্থা প্রকাশ করে অর্থাৎ দৃশ্যমান পৃথিবী, বায়ু ও আকাশই স্থূল রূপের পরিচায়ক।

২। স্বরূপাবস্থা—পৃথিবীর কঠিনত্ব ও কর্কশত্ব, জলের স্নিগ্ধত্ব-শীতলত্ব, তেজের উষ্ণত্ব, বায়ুর বহনশীলতা এবং আকাশের সর্বগতত্ব—

১। সহজিয়া সাহিত্য—মনীন্দ্রবসু

২। "মূল প্রকৃতিবিকৃতি মহতাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত" ৩—সাংখ্যকারিকা।

ইহারাই পঞ্চভূতের স্বরূপ প্রকাশ করে। স্থূল বস্তু বা মানবদেহের কঠিনতার স্রষ্টা পৃথিবী, মজ্জা বা বলাধানের কারণ জল, উষ্ণত্ব বা তীক্ষ্ণত্বের কারণ তেজ, বহনশীলতার কারণ বায়ু এবং সর্বগতিত্বের উপায় আকাশ।

৩। সূক্ষ্মরূপ—পরমাণু, তন্মাত্র ও প্রকৃতি পঞ্চমহাভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহার মধ্যেই পারমাণিক শক্তি ও অনুশক্তি বিদ্যমান—গন্ধাদি পরপর বিদ্যমান—"গন্ধ পরপর জই সোঁ তই সোঁ" (গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, শব্দ)।

৪। অন্বয়িত্বরূপ—সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্টতাকে অন্বয়িত্ব বলা হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামক ধর্মত্রয় প্রত্যেক স্তরের ভিতরে বিদ্যমান অবস্থায় প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপে উদ্ভাসিত হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করিতেছে, তাই 'তিশরণ নাবী' বলিতে ইহাও বুঝাইতে পারে।

৫। অর্থবত্ত্বরূপ—ইহা দ্বারা ভোগ ও অপবর্গপ্রকাশে পঞ্চ মহাভূতের পার্থক্যকে বুঝাইতেছে; পঞ্চ মহাভূত স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী শক্তির সহায়তায় সৃষ্টির ভিতরে সুখদুঃখের সৃষ্টি করিতেছে। যোগী এই সকল তত্ত্বগুলিকে যদি নিজের আয়ত্তাধীন করিতে পারেন অর্থাৎ ভূতজয়ী হইতে পারেন, তবে অনেক অসাধ্য সাধনও সম্ভব হয়। প্রথমে স্থূল-রূপকে জয় করিয়া যথাক্রমে স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব রূপ প্রত্যক্ষ করার ফলে অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব, এই অষ্ট প্রকার শক্তি বা অঠকমারী আগত হয়—"ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ"—৪৫

(পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিভূতিপাদঃ)

"সুণ বাহ তথতা পহারী
মোহভণ্ডার লুই সঅলা অহারী ॥ ধ্রু ॥
ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥ ধ্রু ॥

চেঅন ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা ॥ ধ্রু ॥
স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ
ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুল ॥ ধ্রু ॥
শাখি করিব জালন্ধরি পাত্র
পাখি ণ বাহঅ মোরি পাণ্ডিআ চাদে ॥ ধ্রু ॥ ৩৬

(চর্যাপদ—কৃষ্ণাচার্যপাদ)

এই চর্যাগীতির ভিতরে নির্বীজ সমাধির লক্ষণ সকল বর্ণিত হইয়াছে। সহজাবস্থায় সকলপ্রকার দ্বন্দ্ববিরোধ ও উৎপাদ-অপায়-বিনাশের পরে সাধকের অনুভূত সহজতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাসগৃহ শূন্যতায় বিলীন হওয়ায় তথতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে—মোহভাণ্ডারের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে—সর্বত্রই যেন শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। শূন্যতা, অতিশূন্যতা ও মহাশূন্যতা নামক আলোকত্রয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তথতারূপ খড়্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং এই অস্ত্রের সাহায্যে বাসনাদোষগুলিকে ছিন্ন করিয়া সর্বশূন্যতাবোধে মহাসুখভোগে লিপ্ত—"যোগীন্দ্রেণ তস্য বাসনাদোষং তথতাখড়্গেন প্রহৃত্য মোহং বিষয়াসঙ্গলক্ষণং সকলমপহারিতমিতি" (টীকা)।

আজ জীব সর্বশূন্যের ভিতরে নিজসত্তাকে ভুলিয়া গিয়াছে—নিদ্রাচ্ছন্ন, চেতনা নাই, বেদনা নাই, সহজ সাধনার সিদ্ধিলাভে ভব-নিদ্রায় মহাসুখে সুপ্ত, ত্রিভুবনের ভিতরে কোথাও অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র নাই, শূন্যময় দেখিয়া স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। গমনাগমন বিরুদ্ধাবস্থায় অবধূতিকায় মহানন্দের সৃষ্টি হইয়াছে—"অবণাগবনমিতি পূর্বোক্তক্রমেণ চন্দ্রসূর্যয়োর্যাতায়াতং খণ্ডয়িত্বা। ঘানিকেতি, অবধূতিকাপবনঞ্চ সহজানন্দং প্রবেশয়িত্বা ময়া স্বপ্নবৎ ত্রিভুবনং দৃষ্টং শূন্যঞ্চ। তথাচাগমঃ—

যথা কুমারী স্বপ্নান্তরেষু সা পুত্রং জাতং মৃতঞ্চ পশ্যতি।
জাতেঽপি তুষ্টা মৃতে দৌর্মনস্কা এবং জানীথ সর্বধর্মান্।" (টীকা)

অর্থাৎ স্বপ্নে কুমারী নারী পুত্রপ্রসবে যেমন জন্মের জন্য সন্তোষ

লাভ করে, আবার মরিলেও খুব শোকগ্রস্ত হয় না, তদ্রূপ নির্বীজশূন্য অবস্থাও সুখ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সমস্ত গুণাগুণের অতীত। এই অবস্থার ব্যাখ্যা সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে, জালন্ধরীপাদের মত যোগীপুরুষ ব্যতীত এই সর্বশূন্যতার সাক্ষ্যপ্রদানে কেহ সমর্থ নহে।

"সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা ডাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥ ধ্রু ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি বেণি সারি সুণেআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ধ্রু ॥
জবে করহা করহক লেপি চিউ
বতিশ তান্তি ধনি সএল বিআপিউ ॥ ধ্রু ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু ॥১৭
(চর্যাপদ—বীণাপাদ)

নির্বিকল্প সমাধিতেও নৈরাত্মা ও অনাহতনাদ বর্তমান থাকে বলিয়া ললনা (ইড়া বা চন্দ্র) নাড়ী ও রসনা (পিঙ্গলা বা সূর্য) নাড়ী এই দুইটি একীকৃত অবস্থায় অবধূতিকা (সুষুম্না) নাড়ীর সঙ্গে মিলনে অনাহত নাদ সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য নৃত্যগীতের উপমা গৃহীত হইয়াছে—হেরুক বীণাবাদক নর্তক এবং নৈরাত্মা গায়িকা অর্থাৎ প্রভাস্বর প্রভাবে সৃষ্ট অনাহত শূন্যতার বোধ হইলে জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত—"সূর্যাভাসং তু বিনাকারমুৎপ্রেক্ষ্য চন্দ্রাভাসেন তন্ত্রিকাঞ্চ। বিষয়চক্রী অবধূতিকয়া স একীকৃত্য। অনাহতদণ্ডিকায়াং লগাবয়িত্বা ভো সখি নৈরাত্মে বীণাপাদা বীণাদ্বারেণ শ্রীহেরুকেত্যক্ষরচতুষ্টয়ার্থমনাহতং ঘোষয়ন্তি। অতএব শূন্যধ্বনীতি সন্ধাভাষয়া প্রভাস্বরমনাহতরূপং স এব ভবে বিলস ন ভববন্ধো ভবতি।" (টীকা)

সাহিত্যরস সিঞ্চিত করিয়া এই তত্ত্বকে বর্ণনা করা হইয়াছে—বীণার উপাদান লাউ সূর্য, তাঁত শশী ও দণ্ড অবধূতিরূপে উপমিত হইয়াছে এবং বীণাপাদ হেরুক এই দেহবীণাতে চারিটি অক্ষর অনাহত ভাবে বাজাইতেছেন। সমস্ত অক্ষরের মধ্যে মধ্যের অকারই সারস্বরূপ—এইরূপ অনুভূতির ভিতর দিয়াই চিত্তের দোষাদি বিনষ্ট হয়—তাই শব্দ বা ধ্বনির ভিতর দিয়াই শূন্যতার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়—"আলিকালিবর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং। তথাচ নাম সংগীত্যাং—

অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রো ইতি। তমক্ষরস্বরূপং প্রতীত্য তেনাগ্রহবরস্য চিত্তরাজস্য সন্ধির্দোষছিদ্রগুণিত্বাৎ। তএব পাদাঃ তমেবার্থং শব্দদ্বারেণ প্রতিপাদয়ন্তি। তথাচাগমঃ—

স্থূলং শব্দময়ং প্রাহুঃ সূক্ষ্মং চিন্তাময়ং তথা।

চিন্তয়া রহিতং যত্তদ্যোগিনাং পদমব্যয়ম্।" (টীকা)

অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্রভাবধারা যখন চিন্তারহিত শূন্যতাপ্রাপ্ত হয়—সেই অবস্থাই যোগীদের কাম্য।

প্রভাস্বরপ্রভাবে শব্দশ্রুতকারী উষ্ণ চিত্ত আক্রামিত হইলে বত্রিশটি নাড়ীদেবতা অনাহত নৈরাত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রজ্ঞা ও উপায় অবলম্বনে ভাবাভাববিশিষ্ট শূন্যতাতে পরিপূর্ণ হয়—যস্মিন্নিলক্ষণসময়ে তচ্চিত্তৌষ্ণ্যং তেন প্রভাস্বররাহুকেণ চাপিতং। আক্রামিতং। তস্মিন্ সময়ে দ্বাত্রিংশান্নাড়ীদেবতাবিগ্রহস্য। ধ্বনিনেতি। অনাহতনৈরাত্মজ্ঞানেন প্রজ্ঞোপায়াত্মকং ভাবাভাবব্যাপিতমিতি"। (টীকা)

বজ্রধর শূন্যতার (সর্বশূন্যতার) প্রাপ্তিতে আনন্দে উন্মত্ত যোগী নৈরাত্মাদেবীর (অনাহতনাদের) গানের ভিতরে সমাধিগ্রস্ত অবস্থায় মহানন্দের সন্ধান পাইয়া নৃত্যরত। ইহাই নাটকীয় জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ, ধ্বংস ও মুক্তির অভিনয়—ইহাই নির্বাণের স্বরূপ। সাধকচিত্ত নির্বাণের আনন্দে ভরপুর—"বীণাপাদা বজ্রধরপদেন নৃত্যং কুর্বন্তি। তেষাং দেবী যোগিণী নৈরাত্মাদিকাশ্চ গীতিকয়া সঙ্গায়নং মঙ্গলং কুর্বন্তি। অতএব বুদ্ধনাটকং বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং সমং নির্বাণং ভবতীতি।"

(টীকা)। অর্থাৎ জীবননাটক সমাপনান্তে গৌতমবুদ্ধ এই সর্বশূন্যতারূপ নির্বাণতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ
এবেঁ মই বুঝিল সদগুরু বোহেঁ ॥ধ্রু॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ নঠা
গণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥ধ্রু॥
দেখমি দহদিহ সর্বই শূন
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥ধ্রু॥
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ
মই অহারিল গঅনত পণিআঁ ॥ধ্রু॥
ভাদে ভণই অভাগে লই আ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ধ্রু॥৩৫
(চর্যাপদ—ভাদে পাদ)

মহাশূন্যস্তরে নির্বীজ সমাধির ফল নির্বাণ, কৈবল্য অথবা সর্বশূন্যতা। সমাধি পর্যন্ত বর্তমান প্রকৃতির সপ্তরূপ (ধর্ম, অধর্ম, অনৈশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য ও অজ্ঞান) পরিত্যক্ত হইলে সাধক বুদ্ধিযুক্ত সাত্ত্বিকা প্রকৃতি বা নৈরাত্মাকে অবলম্বনে মহাসুখে অবস্থান করেন; কিন্তু এখন চিত্তের মোহ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হওয়ায় নৈরাত্মাদেবীর অস্তিত্ব ও বিলোপ হইল অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ পুরুষ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইলে প্রকৃতির প্রতি পুরুষের অনুরাগ না থাকায় প্রকৃতিও পুরুষের মোক্ষলাভের পরে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব বলিয়া পুরুষকে পরিত্যাগ করে—

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতিসংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥৬৬
(সাংখ্যকারিকা)

এই রূপেই উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি বা অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্পূর্ণ রহিতাবস্থায় সর্বশূন্যতা উপলব্ধি হয়। আচার্য ভাদ্রপাদ সদ্‌গুরুর

বুদ্ধিবলে মোহমুক্ত হইয়া নির্বাণলাভ করাতে চিত্তের বিলোপ হইল এবং প্রকৃতিপ্রভাস্বরে প্রবেশ করিলেন। সর্বাধর্মানুপলম্ভে দশদিক শূন্য হইয়া উঠিল, সর্বশূন্য প্রভাস্বরময়প্রতিভার উদয়ে এবং চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়াতে পাপপুণ্যের বিচার ও সংসার বন্ধন দূর হইয়া গেল—"মোহমিতি বাহ্যবিষয়সঙ্গেনাল্পকল্পান্তং তাবৎ স্থিতোস্মি। ইদানীং বুদ্ধানুভাবাৎ সদ্‌গুরুবোধপ্রসঙ্গেন ময়া চিত্তস্য স্বরূপমবগতম্।" এবেঁমিত্যাদি ইদানীং পবিপদ্মসংযোগাক্ষরসুখে চিত্তরাজ মম বিনষ্টনমিতি; প্রকৃতি প্রভাস্বরে প্রবিষ্টমিতি।" "সর্বধর্মানুপলম্ভযোগেন যং যং দিগ্‌ভাগং পশ্যামি তং তং সর্বশূন্যং প্রভাস্বরময়ং প্রতিভাতি অতএব চিত্তস্যাস্নুদয়েন পাপপুণ্যাদিকং সংসারবন্ধনং চ জানামীতি।" (টীকা)

বজ্রচগুরুর প্রভাবে শূন্যতা উপলব্ধির ভিতর দিয়া ভাব্যমুক্ত চতুর্থানন্দের (সর্বশূন্যত্বের) প্রাপ্তিতে প্রভাস্বরসমুদ্রে নির্বাণলাভ হইল। অনাদি ভাববিকল্পের আধার চিত্ত আজ সর্বশূন্যত্বের ভিতরে বিলীন হইয়া গেল—"বজ্রগুরুণালক্ষ্যমিতি ভাব্যমুক্তং মহ্যং চতুর্থানন্দোপায়ং প্রদত্তং। ময়াপুনঃসাদরনিরন্তররাভ্যাসেন। গগনেতি প্রভাস্বরসমুদ্রে অহারীকৃতম্।" যদনাদি ভবকল্পাধারচিত্তরাজো ময়া সর্বধর্মানুগলম্ভসমুদ্রে প্রবেশিতং। (টীকা)

"চিঅ সহজে শূণ সংপুনা
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি
ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই ॥ ধ্রু ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর
ভাগতরঙ্গ কি শোষই সাঅর ॥ ধ্রু ॥
মুঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন লেখই।
দুধযাঝোঁ লড় নচ্ছংতেঁ শোষই ॥ ধ্রু ॥
ভব জাইণ আবই এসু কোই,
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ ধ্রু ॥ ৪২ ॥
(চর্যাপদ—কাহ্নপাদ)

পঞ্চস্কন্ধসহ চিত্ত বিলীন হওয়ায় সর্বশূন্যতা সম্পূর্ণরূপে যোগীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে, কৃষ্ণাচার্যের ত্রৈলোক্যস্বরূপ অস্তিত্বের বিনাশ হইয়াছে বলিয়া রাত্রিদিন পরমার্থসমুদ্রে ক্রীড়ামগ্ন—"প্রকৃতিস্বরূপেণ সর্বদৈব ষোড়শীশূন্যতায়াং সংপূর্ণোয়ং মম চিত্তরাজ। অতএব স্কন্ধ-বিয়োগেনেতি। ভো জনা মম স্কন্ধাভাবাৎ বিবাদং মা কুরু।" "বদ কথং কৃষ্ণাচার্যঃন বিদ্যতে ত্রৈলোক্যস্বরূপং তং ভাব্য, অনুদিনং স্ফুরতি-পরমার্থ জলধৌ ক্রীড়তীত্যর্থঃ। তথাচাগমঃ—যথা নদী জলাৎ স্বচ্ছাৎ মীন উৎপততি দ্রুতম্, সংশূন্যাৎ তথা স্বচ্ছাৎ মায়াজালমুদীর্যতে।" (টীকা)

অর্থাৎ যেমন স্বচ্ছ জলপূর্ণ নদীর ভিতরে মৎস বাস করিতে পারে না, পলায়ন করিতে হয়, তাই স্বচ্ছ চিত্ত সর্বশূন্যতাপ্রাপ্ত হওয়াতে মায়ামোহ দূরীভূত হয়। তরঙ্গ নষ্ট হইয়া গেলেও জলের ভিতরে তাহার অস্তিত্ব থাকে, দুধের ভিতরে যেমন ননীর অস্তিত্ব থাকে অদৃশ্য অবস্থায়, সেইরূপ সহজ সর্বশূন্যত্বের ভিতরেও কৃষ্ণাচার্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান—নীল-পীতাদিবর্ণসংস্থানো হি যো ভাবস্তস্য ভংগং দৃষ্ট্বা মূর্খাঃকিমর্থং কাতরং ভবন্তি। কিমম্ভোধের্ভগ্নতরঙ্গং তং সাগরং শোষয়ন্তীতি।" (টীকা)

কৃষ্ণাচার্য মানবদেহের ভিতরে অবস্থিত থাকিয়াও ভবের স্বভাব পরিজ্ঞানে মহানন্দে সর্বশূন্যতায় বিরাজমান—"এতদ্ভবস্বভাব পরিজ্ঞানেন কৃষ্ণাচার্যপাদো ভবেপ্যত্র বিলসতি ক্রীড়তীতি"। (টীকা)

এই সর্বশূন্যভাবেস্থিতিকে সাংখ্যদর্শনে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—"সম্যগজ্ঞানাধিসমাদ্ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিরিবধৃতশরীরঃ।"৬৭

(সাংখ্যকারিকা)

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তি হইলেও এবং কর্মাশয়ের জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগজননের শক্তি না থাকিলেও অর্থাৎ অবিদ্যা নিবৃত্তি সত্ত্বেও কিছুকাল তত্ত্বজ্ঞানী জীবিত থাকে, যেমন বেগাখ্য সংস্কারবশতঃ কুম্ভকারের চক্র-কার্য শেষ হইলেও কিছুক্ষণ ঘুরিতে থাকে।

টীকাস্থিত 'ষোড়শীতি শূন্যতায়াং' কথাটি ব্যাখ্যা করিতে গেলেই সাংখ্যের প্রকৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—"ষোড়শকস্তু বিকারঃ ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥"৩ (সাংখ্যকারিকা)। প্রকৃতির ষোল প্রকার বিকার (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও মন) হইতে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—সর্বশূন্য অবস্থা।

আবার এই অবস্থাকে বেদান্তের ব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে—"We shall see that there is practically no difference between the Vedantic idea of the reality and the Sahaja as conceived by the Sahajiyas"১

"সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলো এ
খসম ভাবেরে বাণত কা কোএ ॥ধ্রু॥
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেড় ন জাঅ
তিম মরণ অঅণারে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ধ্রু॥
জৎপুণাহি অধ্যাতা স্বপরেলা কাহি
আই অণু অণারে জাম মরণ ভব ণাহি ॥ধ্রু॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা
এহ সহাব
জাইণ আবয়িরেণ তংহি ভাবাভাব ॥ধ্রু॥৪৩॥
(চর্যাপদ—ভুসুকুপাদ)

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল নামে যে ত্রিলোক কল্পিত হইয়াছে, সেই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া যে সর্বশূন্যতা বিরাজিত, তাহাকে মহাতরুর সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে। সহজ অবস্থা বা সর্বশূন্যতার ভিতরে অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, উৎপাদ ও ভঙ্গ—দুইই সমান; সমস্ত ত্রিলোক আজ সহজ অবস্থায় সর্বশূন্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে—মুক্তি বা বন্ধনের কোন প্রশ্ন নাই। সুতরাং সাধকের চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া

১। Obscure Religious Cult—S. B. Das Gupta—P 40

গিয়াছে। সবই শূন্য-উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই, জন্মও নাই, মরণও নাই, সংসারও নাই। ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জলের সহিত জল মিশিয়া গেলে যেমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তেমন চিত্ত সমরসগগনে নির্খোজ হইয়া যায় ও আত্মপর ভেদশূন্য হইয়া থাকে। এই সর্বশূন্যতার সংজ্ঞা বলে যে, এই পৃথিবী আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, জন্ম বা মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই, আজ ভুসুকু বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবীতে কিছুই জন্মে না, কিছুই থাকে না বা লয় পায় না—ভাবও নাই, অভাবও নাই—"গুরুচরণরেণুপ্রসঙ্গেন পবিপদ্ম-সংযোগসুখাকারবীজং গৃহীত্বা ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য যোগীন্দ্রস্য সহজচিত্তং স্ফুরিতং। এতস্য খসমোপসুখস্বভাবেন ত্রৈলোক্যে ন কো বিদ্বান্ মুক্তো বেতি।" "যথা বাহ্যনীরান্তরপতনভেদো ন জ্ঞায়তে বুধৈঃ। তথা মনোবোধিচিত্তরত্নযোগীন্দ্রসমরসীভূতং, গগনেতি। প্রভাস্বরে বিষতি তত্র তস্য জ্ঞানোপলম্ভো ন স্যাদিতি।"

"তথাচাগমঃ—ন জাতো ন মৃতশ্চৈব ন রূপী নাধিরূপবান্।
ন সংসারে ন নির্বাণে নাকারস্তেন সূচ্যতে" ॥ (টীকা)

জগতের সমস্ত ধ্যানধারণাভাবনাচিন্তার স্বরূপ উপলব্ধিই এই নিঃস্বভাবত্ব—এই গম্ভীর সহজানন্দলাভ করিতে পারিলে সংসার কারাগারের বন্ধন ও মুক্তির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না—

"এতস্মিন্ গম্ভীরসহজানন্দানুভবাদ্ভাবাভাববিকল্পপরিহারেণ ন সোঽপি যোগী জিন সংসারকারাগারে যাতায়াতং দৃশ্যতে।" (টীকা)

"বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিনী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
ডহি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥

সোণ তরুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥ ৪৯
(চর্যাপদ—ভূসুকুপাদ)

পূর্ববঙ্গে অবস্থিত পদ্মানামক বিশাল নদীতে নৌকা নিয়া যাতায়াত করার সময়ে দস্যুকর্তৃক যাত্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়াতে যাত্রী যেমন সর্বস্বান্ত অবস্থায় সর্বশূন্য হয়, এখানেও পদ্মাখালে অর্থাৎ প্রজ্ঞানদীর ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে অদ্বয়জ্ঞান নামক দস্যু কর্তৃক সমস্ত ক্লেশ লুণ্ঠিত হইল। চিত্ত আজ সমস্ত পরিশুদ্ধ অবস্থায় প্রভাস্বর প্রকৃতিতে মিলিত হওয়ায় রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়জাত কামনার অভাবে নির্বিকল্পজ্ঞানের উদয়ে চিত্ত বিলীন হইয়া গেল—"তথাচাগমঃ—ন ক্লেশা বোধিতো ভিন্ন ন বোধৌ ক্লেশসম্ভবঃ। ভ্রান্তিতঃ ক্লেশসঙ্কল্পো ভ্রান্তিঃ প্রকৃতি নির্মলা ॥" (টীকা)

অর্থাৎ বুদ্ধির উদয়ে ক্লেশ থাকিতে পারে না—প্রকৃতপক্ষে ক্লেশও অস্তিত্ববিহীন, বুদ্ধির অভাবে ভ্রান্তিবশতঃ আমরা ক্লেশ অনুভব করি এবং প্রকৃতিকে নির্মল বলিয়া মনে করি, ইহাও আমাদের ভ্রান্তি মাত্র।

সোনারূপ অর্থাৎ শূন্যতাতে রূপজগতের ধারণাও সব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—সর্বশূণ্যতাবোধে স্বরূপ বা সহজ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সৎ, অসৎ, ন অসৎ ও ন সদসৎ"—এই চারিপ্রকার বোধশূন্যতার ভিতর দিয়া অদ্বয়ে প্রবেশ করার ফলে জীবন মরণের ভেদ জ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। এমনকি চিত্ত বা শূন্যতরু পর্যন্ত আজ নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে—"সোনামিতি শূন্যতাগ্রহঃ তরুময় ইতি ভাবগ্রহঃ। উভয়-বিকল্পং স্বরূপ বিচার্যমানে সতি কিঞ্চিন্নস্থিতম্। অতএব নির্বিকল্প পরিহারেণ মহাসুখরত্ন নিমগ্নোহং।" "যৎপরং চতুস্কোটি বিচারভাণ্ডারং মম তেন অদ্বয়বঙ্গালেন গৃহীতম্। অতএব আত্মনি জীবনমরণ ধ্যানাদি বিকল্পং নাস্তি।" (টীকা)

পঞ্চধাট শব্দটি টীকাতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"পঞ্চপাটনমিতি। পঞ্চস্কন্ধাশ্রিতাহংকারমমকারাদিকং দগ্ধং। ইন্দ্রিয়বিষয়ঞ্চ। অতএব স্বয়ং কল্পপরিহারায় জানীমঃ চিত্তরত্নং"—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পাঁচটি বিষয়ই অহঙ্কার সৃষ্টি করে, সাধকের এখন অহঙ্কার, আকার (বা অকার) ও ইন্দ্রিয় সকল ধ্বংস হইয়াছে। এখন চিত্তরত্ন ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহাই সাংখ্যমতে বিচার্য—একাদশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়স্বরূপ, কারণ বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ও কর্ম মনের অধিষ্ঠানবশতঃ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের পরিণাম বিশেষ হইতেই ইন্দ্রিয়ের কার্যের ভিতরে বিভিন্নতাদৃষ্ট হয়—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ।" ২৭

(সাংখ্যকারিকা)

আবার অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট অহঙ্কার হইতেই উক্ত ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের সৃষ্টি হয় এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পাঁচটি তন্মাত্রার সৃষ্টি হয়—

"অভিমানোহহঙ্কারস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্র পঞ্চকশ্চৈব ॥ ২৪

(সাংখ্যকারিকা)

বেদান্তমতেও অহঙ্কার হইতেই মনের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে—

"অহঙ্কারাত্মনো জাতং প্রাণাবৈ সূক্ষ্মভূতজাঃ।
কার্যকারণভাবান্নো লয়া স্তস্মাচ্ছ ত্তের্মনঃ ॥

(বেদান্তসারঃ রামানুজভাষ্যম্ ৪।২।৩)

"সুনে সুন মিলিআ জবেঁ
সঅলধামে উইআ তবেঁ ॥ধ্রু।

আচ্ছু হুঁ চউখণ সংবোহী
মাঝ নিরোহ অনুঅর বোহী ॥ধ্রু।
বিন্দুনাদ ণহি এপইঠা
অন চাহন্তে আণবিণঠা ॥ধ্রু॥
জথাঁ আইলেঁসি তথা জান
মাসং থাকী সঅল বিহাণ ॥ধ্রু।
ভণই কঙ্কণ কল এল সাদেঁ
সর্ব্ব বিচ্ছরিল তথতানাদে ॥ধ্রু॥৪৮
(চর্যাপদ—কৌঙ্কণপাদ)

শূন্যতা, অতিশূন্যতা ও মহাশূন্যতা নামক শূন্যময় ধাম সমস্তই যেন আজ অস্তিত্বরহিতাবস্থায় শূন্যে শূন্যে মিলিয়া সর্বশূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপভাবে চতুর্থানন্দ লাভ করিয়া সর্বশূন্যতার ভিতরে সাধক বিরাজ মান—

"তৃতীয় স্বাধিষ্ঠানশূন্যে বজ্রগুরোশ্চাধিষ্ঠানাচ্চতুর্থং পদং শূন্যং যদা মীলতি স্বয়ং তদা তস্মিন্ সময়ে। সর্বধর্মমিতি যুগনদ্ধফলোদয়ো ভবতীতি।"

"তস্মাদ্বিচিত্তাদিক্ষণেন চতুর্থানন্দং সংবোধয়িত্বা তিষ্ঠামি ; তেনাহং মধ্যমানিরোধেতি।" (টীকা)

এখানে টীকার ভিতরে আরও দেখা যায়—"সপ্তপ্রকৃতিদোষা-সমাধিমলনিধানাদস্তত্তরবোধিং লভ্যতে"—অতএব প্রকৃতির যে সপ্তদোষ (ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য ও অবৈরাগ্য ও অজ্ঞান অথবা প্রকৃতির সর্ব্ব প্রকার বিকৃতি-বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) সাংখ্য মতে যাহা দেখা যায় তাহা দূরীকৃত হওয়ার পরে পাতঞ্জল-মতে সমাধিযোগে বুদ্ধিযুক্ত সাত্ত্বিকা প্রকৃতি বা নিরাত্মাদেবীর সঙ্গে সাধক মহানন্দে সুরতযোগে বিহার করেন, তাহাও আজ দূরীকৃত হইল অর্থাৎ অনুত্তর সাংখ্যশাস্ত্রের মতে কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইলেন।

ওঁকার ধ্বনির নাদশ্রবণ বা বিন্দুও আর দৃষ্টি গোচর হইতেছে না—

সমস্ত গ্রাহ্য প্রজ্ঞাজ্ঞান লুপ্ত—একমাত্র সুখসংবেদনই আজ এই সর্বশূন্যতার প্রতীক—"নাদমিত্যাদি দীর্ঘহুংকারো নাপায়গ্রাহকজ্ঞানবিকল্পং বিন্দুরিতি। প্রজ্ঞাগ্রাহ্যজ্ঞানবিকল্পঃ নাদঃ। এতদুভয়ং বিকল্পেন তস্মিন্ সময়ে পরিত্যক্তোঽস্মি। অতঃ সর্বধর্মানুপলম্ভং পশ্যন্ চিত্তবোধনঞ্চ প্রণষ্টং মম।" কঙ্কণপাদ বালযোগীদের নিকটে আবির্ভূত সাকার, নিরাকার, কলকলনাদ প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না—তথতার প্রকাশে সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে—"শূন্যতাসিংহনাদেন ত্রাসিতাঃ সর্বণত্রবঃ।" (টীকা)

"গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কুরাড়ী
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ধ্রু॥
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষমে দুন্দোলী
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুনমে হেলী ॥ধ্রু॥
হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা
ষুকড় এ সেরে কপাসু ফুটি (লিটি) লা ॥ধ্রু॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তা এলা
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ
কঙ্গুরি না পাকেলা রে সবরা সবরী মাতেলা
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥ধ্রু॥
চারিবাসে ভাইল াঁরে দিআঁ চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরো হকএলা কান্দশ সগুণ শিআলী ॥ধ্রু॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধ লিবলী
হে রসে শবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষববালী ॥ধ্রু॥৫০

(চর্যাপদ—শবরপাদ)

এই পদটিতে একদিকে দেখা যায় সাহিত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন, আবার দেখা যায় নির্বাণ, কৈবল্য বা সর্বশূন্যতাপ্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ। শূন্যতা ও অতিশূন্যতা নামক দুইটি স্তর পার হওয়ার পর সাধক মহাশূন্য স্তরে অর্থাৎ তৃতীয় বাড়ীতে নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাসুখে

রাত্রি যাপন করিতেছে। কিন্তু এই তৃতীয় মহাশূন্যতার স্তরেও সাধকের মনে মহাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, পাতঞ্জল মতে এই সমাধিলাভ সত্ত্বেও কৈবল্য লাভের জন্য এবং চর্যার মতে সর্বশূন্যতা প্রাপ্তির জন্য স্বাত্ত্বিকা প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতির (যাহা প্রকৃতিবিকৃতি—বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্জিতা অথবা ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য ও অজ্ঞান বর্জিতা) সান্নিধ্য হইতেও বিছিন্ন হইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে সাধক—"গগণেত্যুক্তিদ্বয়েন শূন্যাতিশূন্যং বোদ্ধব্যম্। তল্লগ্ন বাটিকাসন্ধায়া তৃতীয়ং মহাশূন্যং চ। হৃদয়েনেতি। প্রভাস্বর-চতুঃশূন্যেন কুঠারিকাং কৃত্বা এতদালোকাদি শূন্যত্রয়স্য দোষং ছিত্বা। কণ্ঠেতি। সম্ভোগচক্রে নৈরাত্মধর্মাধিগমেনানুদিনং যোহপি যোগীবরো জাগ্রতি তস্য ত্রৈলোক্যং সুঘটং ভবতীতি।" "অতএব শবরোহি মহাসুখেন ভবে শূন্যে নৈরাত্মাজ্ঞানমুদ্রাং গৃহীত্বা বিলসিতি ক্রীড়তি।" (টীকা)

গৃহের চারিদিকে জনমানব নাই, জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র কার্পাস ফুল ফুটিয়া এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। কঙ্গুদানা হইতে প্রস্তুত মদ্যপানে নৈরামণি ও সাধক মাতাল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ শুদ্ধ বা মূল প্রকৃতির ও পুরুষের মিলনের দৃশ্য বা সমাধি। কিন্তু সাধক এই মহাসুখে তৃপ্তি লাভ করিলেন না, প্রকৃতির স্বরূপ বোধে সর্ব-শূন্যতার পথে যাত্রা করিলেন—তাই নৈরাত্মা ও সাধকে ঘটিল বিচ্ছেদ, শবরের ঘটিল মৃত্যু এবং মৃতদেহের দাহ করা হইল। ইহার ফলে সমস্ত বাসনাকামনা ক্রন্দনরত হইল। সাধক প্রাপ্ত হইলেন নির্বাণ, সহজাবস্থা বা সর্বশূন্যতা—'ক'কারের পার্শ্ববর্তী 'খ'কার নামক চতুর্থ স্তর সর্বশূন্যতার আবির্ভাব। "ককারস্য পার্শ্ববর্তী খকারশ্চতুর্থশূন্যং মমেদানীং স্ফুটীভূতম্।" (টীকা)

"Mahayana Buddhism does not recognise sunyata of the knowledge of the essencelessness of the world to be the highest truth."১

১। Obscure Religious Cut—S.B. Dusgupta P-57

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে অথর্ববেদ (১০।৮।২৭) এবং ঋক্‌বেদ (১।১৬৪।২১) হইতে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকের ভিতর দিয়াও পুরুষ ও প্রকৃতির এই তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতি এই বিশ্বসংসারে বহু প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। বদ্ধপুরুষ বিষয়সুখে লিপ্ত হইয়া সেই প্রকৃতির ভজনায় রত থাকে এবং মুক্ত পুরুষ এই প্রকৃতিকে ভোগ করিবার পরে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীপ্রজাঃ সৃজমাণাং স্বরূপাম্।
অজো হ্যেক : জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥"

একটি পিপুলগাছের দুইটি ডালে দুই পুরুষ—তাহার মধ্যে একটি পুরুষ পিপুল ফল আস্বাদ করিতেছে এবং অন্য একটি পুরুষ আস্বাদ হইতে বিরত রহিয়াছে। এখানে বৃক্ষ প্রকৃতি ও দুইটি পুরুষ যথাক্রমে বদ্ধ-পুরুষ ও মুক্ত-পুরুষ—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তরূপ বিনিবৃত্তা শুদ্ধা মূলপ্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ (অথবা ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য ও অজ্ঞান)—এই সাতটি বিষয় বর্জিত বস্থায় সমাধিসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে মহাসুখে নিমগ্ন থাকে এবং প্রকৃতির এই রূপকেই নৈরাত্মা বা সহজসুন্দরী নামে অভিহিত করা হইয়াছে চর্যাপদে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—ডোম্বী, শবরী, যোগিনী প্রভৃতি মহাশূন্যস্তরকেই যোগে সমাধি বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেই সর্বশূন্যত বা কৈবল্য লাভ সম্ভব হইবে না। মহাশূন্যতার পরবর্তী স্তরে সমাধি ফলস্বরূপ এই সর্বশূন্যতা বা কৈবল্য আবির্ভূত হয় অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিলে পুরুষের যখন আর কোন অবলম্ব থাকে না—তখনই ঘটে সর্বশূন্যতা। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও, যতদিন পর্যন্ত দেহের পতন না হয়

ততদিন পর্যন্ত কুম্ভকারের চক্র ছাড়িয়া দিলেও কিছুক্ষণ যেমন বিনা কারণে ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ সাধকও কিছুদিন জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবন যাপন করেন, মৃত্যুর পরে কৈবল্য বা সর্বশূন্যত্ব প্রাপ্ত হন—

"প্রাপ্তে শরীরভেদে চারিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি" ॥৬৮

(সাংখ্যকারিকা)

পাতঞ্জল যোগেও সমাধি লাভের পরে আরও সাধনা করিতে করিতে সাধক কৈবল্য, নির্বাণ বা সর্বশূন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—

"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি। ৩৩

(যোগসূত্রে কৈবলপাদ)

যখন পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারে এবং সর্বশূন্যত্বের সন্ধান লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের চিরবিচ্ছেদ ঘটে, তখন লজ্জাশীলা বধূরমত প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করে—

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেহপিতয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥৬৬

(সাংখ্যকারিকা)

পুরুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, যেহেতু আমি শব্দাদিরূপে ও ভিন্নরূপে প্রকৃতিকে দেখিয়াছি, আমার সঙ্গে প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতি ও যখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, পুরুষ তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত এবং স্বরূপশূন্যত্ব উপলব্ধি করিয়াছে এবং উভয়ের ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—আর সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। চর্যাতেও দেখা যায়—

হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ধ্রু॥
ফেট লিউ গো মাএ অন্ত উড়ি চাহি
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি ॥ধ্রু॥

পহিল বিআন মোর বাসনা পূড়
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুরা ।।ধ্রু।।
জান জৌবন মোর ভইলে সি পূরা
মূল নখলি বাপ সংঘারা
ভণথি কুক্কুরী পাএ ভব থিরা
জো এত্থু বুজএঁ সো এত্থু বীরা ।।ধ্রু।।২০

(চর্যাপদ-কুক্কুরীপাদ)

প্রকৃতি বা আসঙ্গরহিতা ভগবতী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সর্বশূন্য মনঃস্বামী সুরত সংযোগে যে মহানন্দ ভোগ করেন তাহার শেষ হইল, ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের ভিতরে যেন শূন্যতা অনুভব করিতেছেন—বাসনা ভস্মীভূত হইল "অহং ভগবতী নৈরাত্মা নিরাসা। আসঙ্গরহিতা। খমনেতি সর্বশূন্যং মনঃস্বামী অস্য সুরতাভিষঙ্গেণ মম বিশিষ্ট সংযোগাক্ষর সুখানুভবঃ কস্মিন্ অপি কথাবেদ্যো ন ভবতীতি।" "বিষয়াদিবৃন্দং ময়া নৈরাত্ময়া তস্মিন্ সময়ে নিষ্কৃন্তিতং। স্বয়মেব আত্মানং সংবোধ্য বদতি, ভো মাতঃ নৈরাত্মে। তদিদানীং যং যং বিষয়াদিং পশ্যাম্যত্র স কোহপি ন বিদ্যতে সর্বেষাং মহাসুখময়ত্বাৎ।" (টীকা) "এইখানে দেবী নিজে বলিতেছেন, আমি হইলাম আশারহিতা বা আসঙ্গরহিতা। খমনই আমার ভর্তা বা স্বামী। আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না। 'খমন' শব্দের অর্থ শূন্য মন।"[১]

এই সাধনার ভিতরে সাধকগণ দেহকেই সাধনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেহস্থ নাড়ী সমূহের ও সন্ধান লাভ করিয়াছেন। "অস্য কায়স্য নাড়ী দ্বাত্রিংশদ্দেবী অস্য পিণ্ডীক্রমানুপূর্ব্য সদ্‌গুরুবচন প্রমাণতো বিচার্যমাণে সতি সৈব বাসনা বরাক্ষী কথং বিদ্যতে। (টীকা) দেহের নাড়ী ও সমস্ত বিষয় অবগতের পর সাধকের বাসনা চিরতরে বিনষ্ট হয় ও তিনি 'সর্বশূন্যতা' অনুভব করেন।

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪র্থ অধ্যায়

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, চর্যাপদের শুধু সাহিত্য নিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব, কিন্তু পরবর্তী যুগে ইহার দার্শনিক তত্ত্বেরও আলোচনা আরম্ভ হইল। এই চর্যাপদের দার্শনিক ভিত্তি যে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন, এই তত্ত্বই আলোচিত হইল—এই দার্শনিক নূতন অবদান সুধিজন বিবেচ্য।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোঁহাকোষ ও প্রকীর্ণ কবিতা

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পরবর্তী যুগে পুনরায় ধর্ম ও ভাষার বিবর্তনের ভিতর দিয়া যেসকল সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে, তাহারই ফল দোঁহা-কোষ ও প্রকীর্ণ কবিতা। "দোঁহাকোষধৃত যে পদগুলি ধর্মতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, সাধন-ভজন ও ভারতীয় পরিবেশে রচিত, তাহা চর্যাপদের সমগোত্রীয় নয়।.........এইসকল সাহিত্যের ভিতর দিয়া শূন্যবাদের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল।" ১

"বিসঅ বিসুদ্ধে এঁউরমই কেবল সুন্ন চরেই।
উড়ী বোহিঅ কাউ জিম পলুটিঅ তহিঁ বি পতেই" ॥ ২

বিষয় সম্বন্ধে যাহার ভিতরে বিশুদ্ধভাবের উদয় হইয়াছে, তিনি শূন্যে বিচরণ করেন। সমুদ্রে উড্ডায়মান কাক যেমন কূল কিনারা না পাইয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, তদ্রূপ সাধনার পরিণতিও শূন্যে নির্বাণ।

"জহি মনপবন ন সঞ্চরই রবিশশী নাহ পবেশ।
তহ তট চিত্ত বিশাম করু সরহে কহিঅ উবেশ" ॥ ৩

এইখানে উপনিষদের অমৃতময়ী ভাষা (ন তত্র সূর্যো ভাতি ইত্যাদি) বাঙ্গালী কবির মুখ হইতে নিঃসৃত। যেখানে স্বরূপ শূন্য

১। দাদূ-ক্ষিতিমোহন সেনগুপ্ত—পৃ ৬২৫

২-৩। বৌদ্ধ গান ও দোঁহাকোষ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ১০০, ৬১

বিরাজিত, যেখানে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত, যেখানে চিত্তের বিলোপ ঘটে, সেখানে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে না—সেখানে শূন্যত্ব প্রতিষ্ঠিত।

"সহজেঁ ভা (বা) ভাব ন পুচ্ছই।
সুন করুণ তহি সমরস ইচ্ছিঅ" ॥১

সহজ বলিতে ভাব ও অভাবের প্রশ্ন আসে না, শূন্য ও করুণার দ্বারাই সহজ শূন্যের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট।

"সুন সুন জগু তিহুঅন সুন" ।২

"সচল নিচল জো সঅলাচার।
সুন নিরঞ্জনম্ করু বিআর" ॥৩

সমস্ত ত্রিভুবন অস্তিত্ববিহীন—শূন্য, লোকাচারের ভিতরে কোন তত্ত্ব নাই, শূন্যতা ও নিরঞ্জনই একমাত্র শাশ্বত সত্য।

কৃষ্ণাচার্যের দোঁহাতে দেখা যায় যে, মহাসুখের ভিতরে চারিটি পদ্ম ও চারিটি পত্র আছে, ঐ চারিটি পদ্মের মৃণাল চারি প্রকার শূন্যত্ব (শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য) এবং চারিটি পত্র উহাদের উৎস—

In a Doha of Kirshnacharya, it has been said that in the abode of Mahasukha there are four stalks and four leaves. Here the four stalks are four sunyas and four leaves are four sources." ৪

"চিত্ত খসম জহি সমসুখ পইঠ্‌ঠই।
ই (ন্দী অ-বিসঅ তহি মত্ত) ন দিসই" ॥৫

চিত্ত আকাশস্বরূপ (শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞা) সমসুখে প্রবেশ করিলে ইন্দ্রিয়বিষয় আর কিছু থাকে না—"খসমেন শূন্যতা জ্ঞানে(ন) সমসুখে প্রবিশতি। তৎক্ষণে ন ইন্দ্রিয় বিষয়া ন দৃশ্যন্তে।" (টীকা)

"জগই নিখন্তমু দিহি পহু, কে তু মিসুন পবেশ গও।

১-৩। বৌদ্ধগান ও দোঁহাকোষ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—পৃ ৫১, ৪১
৪। Obscure Religious cult—S.B. Das Gupta-P54
৫। দোঁহাকোষ—প্রবোধ বাগচি—পৃ ৪২

উঠহু করুণ সতথু মহু, কামসি মহাসুহ বজ্জধরু ॥
সুন্নু সুন্নু পর উআর গও, জিম পগুলোঅ মরন্তত্ত।
বিঅসিঅ যন্মু কামসুহ, মহু, তিম লোঅ সব্ভ সুহন্তত্ত ॥"
"রম রম মাই বজ্জ হরাই, সহজ সরঅ ন বাচাঈ।
সও লোঅ পরদন্দ আঈ জিম তুম্মি সুন্ননিক জুঅই।
কারমু সব্ভ ধম্মহ তুম্মিই কেঅচ্ছপি সহজ সরূঅ ন গাই
কামহ মই পরমা আই, জিম তুম্মি সম লোঅহ জাঈ ॥" ১

সমস্ত জগৎকে নিমন্ত্রক করিয়া কে তুমি প্রভু শূন্যে প্রবেশ করিতেছ। মধুর করুণ রসে উত্থিত হইয়া মহাসুখ বজ্রধরকে কামনা করিতেছ। যেখানে জীবজন্তু জীবন ধারণ করিতে পারে না, এমন শূন্যে শূন্যে তুমি উড়িয়া বেড়াও। শূন্যময় ত্রিভুবনে শূন্য সহজস্বরূপ বজ্রধর ক্রীড়া করিতেছেন—এই সহজ শূন্য বজ্রধরই সৃষ্টির কারণ। শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়া শূন্যেই বিলীন হয়—ইহাই পরমার্থ সত্য।

দোঁহাকোষে আরও প্রচুর শূন্যবাদমূলক বিষয়বস্তু রহিয়াছে এবং প্রকীর্ণ কবিতাও তদ্রূপ—একটি প্রকীর্ণ কবিতার উদাহরণ উপস্থিত করা হইতেছে—শিব ও পার্ব্বতীর উলঙ্গ কামলীলার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে—

"রই কেলি-হিঅ-নিঅংসণকর কিশলয়রুদ্ধনয়নযুগলস্য।
রুদ্দস্স তইঅ নঅনং পব্বইপরিউম্ বিঅং জনই ॥"

(গাথাসপ্তশতী—৫৫)

রতিকেলিরত শিবকর্তৃক পার্বতীর বসনমুক্ত হওয়াতে লজ্জিতা পার্বতী কিশলয় সদৃশ দুই হস্তে শিবের দুই চক্ষু আবৃত করিলেও শিবের তৃতীয় নয়নটিকে যুগপৎ আনন্দ ও উৎসাহে চুম্বন করিতেছে। এখানে প্রকৃতির উলঙ্গরূপ দর্শনে বাহ্যিক দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তৃতীয় নয়ন উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির স্বরূপ দর্শনে প্রকৃতির প্রতি আসক্তিহীন হওয়াতে তাহার জন্মমৃত্যু দূর হয়। প্রকৃতি পুরুষের মুক্তি

১। বৌদ্ধগান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃঃ ১৬৫

সাধন করিয়া লজ্জাশীলা রমণীর মত প্রস্থান করে এবং পুরুষ মুক্তি, নির্বাণ বা শূন্যত্ব লাভ করে—ইহাই সাংখ্যের মত। (সাংখ্যকারিকা—৫৮-৬৩—পৃঃ ৮৬ দ্রষ্টব্য)

ক্ষিতিমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'দাদূ' নামক একটি হিন্দি কাব্য-সংকলন গ্রন্থে এমন কতকগুলি শূন্যবাদ মূলক প্রকীর্ণ কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা বাংলা কবিতা বলিয়াই মনে হয়, কোন কারণে হিন্দি কবিতারূপে পরিচিত।

"শূন্য সরোবর মীন মন, নীর নিরঞ্জন দেব।
দাদূ যহু রস বিলসিয়ে ঐসা অলখ্ অভের ॥" (দাদূ পৃ-১৮৩)

সহজ শূন্য সরোবরে নিরাকার নিরঞ্জনদেব জলস্বরূপ—মনরূপ মৎস এই জলে বিচরণ করিতেছে, এই তত্ত্বরসই দাদূর বিলাসের বস্তু, এই রহস্য অজ্ঞেয়।

"কায়াসুঁ নিপংচকা বাসা আতমসুঁনি প্রাণপ্রকাশা।
পরমসুঁনি ব্রহ্ম সোঁ মেলা আঁগে দাদূ আপ একেলা" ॥

(দাদূ—পৃঃ ১৯১)

এখানে শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য—এই চারিপ্রকার শূন্যের বিবরণ বর্ত্তমান। চিত্তের লয় হইলে অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় নির্মিত গৃহ ভগ্ন হইলে ঘটে কায়াশূন্য [শূন্য], পরবর্তী স্তরে প্রাণের অনুভূতি শুধু বর্তমান থাকে বলিয়া আত্মশূন্য [অতিশূন্য], জীবনের অনুভূতি লয় হইলে পরমশূন্য (মহাশূন্য) এবং নির্বাণ অবস্থায় ব্রহ্মশূন্য [সর্বশূন্য]।

"কোমল কুসুমদল, নিরাকার জোতিজল যার নাহি পার।
শূন্য সরোবর জঁহা, দাদূ হংসা রহৈঁ তহা বিলসি
বিলসি নিজসার ॥" [দাদূ—পৃঃ ৬২৫]

এই কবিতার মধ্যে মুক্তি, ব্রহ্মশূন্য, সর্বশূন্য, কৈবল্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বর্ণিত অবস্থার বর্ণনা আছে—কোমল কুসুমদল বলিতে

ষট্‌চক্রের ছয়টি পদ্ম বুঝাইতেছে, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে নাদ ও জ্যোতিঃপূর্ণ জলপথ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যোগবলে দাদূ শূন্যতা উপলব্ধি করিতেছেন এবং এই কূলকিনারাহীন শূন্য সরোবরে নিরুপদ্রবে মহাসুখে হংসের মত বিচরণ করিতেছেন।

"থকিত ভয়ৌ মন কহ্যৌ ন জাই।
সহজি সমাধি রহ্যৌ ল্যৌ লাঈ॥
সাইর বুংদ কৈসৈঁ করি তোলৈ।
আপ অবোল কহা কহি বোলৈ॥" (দাদূ—পৃ ৬২০)

কায়াস্থিত মন কোথায় হারাইয়া গেল—কায়াশূন্য অবস্থায় চিত্তের লয়ে সমাধিদ্বারা সহজ স্বরূপের উপলব্ধি হওয়াতে, সমুদ্রের ভিতরে বিন্দুমাত্র জল যেমন লয়প্রাপ্ত হয়—তদ্রূপ সাধকের অস্তিত্বও শূন্য সাগরে বিলীন হইয়া গেল। সেই অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার নয়।

এইরূপ আরও বহু দাদূরচিত শূন্যবাদমূলক কবিতা আছে— "মধ্যযুগে ভক্ত দাদূর বাণীর মধ্যে যে শূন্যবাদ আছে, তাহা লইয়াই এই প্রসঙ্গ।"... "মধ্যযুগে ভক্তরা যাহাকে শূন্যতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা একটা নাস্তিত্বধর্মাত্মক বস্তুমাত্র নয়। 'পরম অস্তিত্ব'কে বুঝাইতে গিয়া মাঝে মাঝে নেতি দ্বারা বুঝাইতে হয়, এই শূন্য তাহা নহে, আর নাই বস্তুর উপর কি কোন সত্যসাধনা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? দাদূ প্রভৃতি সাধকরা পরম আস্তিক। এইরূপ নাই বস্তুকে তাঁহারা মোটেই আমল দেন নাই, তাঁহারা যাহাকে শূন্য বলিয়াছেন, তাহা মোটেই নাইতত্ত্ব নহে।" (দাদূ—পৃঃ ১৮০)

দোঁহাকোষের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শূন্যতাকে বজ্ররূপে অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই বজ্রযান তত্ত্বের ভিতর দিয়াই নানাবিধ দেবদেবীর ভিতরে বজ্রসত্তাকেই প্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতীকস্বরূপ লওয়া হইয়াছে শূন্যতা—

"In this mode of transformation the most important is the transformation of the idea of Sunyata (Vaucity) into the idea of Vajra or thunderbolt. The sunyata nature of the world is its ultimate nature—immutable as the thunderbolt. So it is called Vajra."

"The transformation of Sunyata into Vajra will explain the title Vajrayana and in Vajrayana all the gods, the goddesses, the articles of worship, Yogic practice and elaborate rituals have been marked with the Vajra to specialise them from their originally accepted nature. This supreme deity is Vajrasatta. (Vajra-Sunyata, Vaucity, Satta, quintessence). ১

দোহাকোষ এবং প্রকীর্ণ কবিতার ভিতরে বহু জায়গায় শূন্যবাদ মূলক বিষয়বস্তু পাওয়া যায়—তাহার মধ্যে, অল্প কয়েকটি মাত্র উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

———

১। Obscure Religions Cult—S. B. Das Gupta—P. 29

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বাউলগান ও বৈষ্ণবসাহিত্য

'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র ভূমিকাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন—"কালিন্দী নদীর কূলে গোকুলের মাঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোকের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন, সেই বাঁশীর সুরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।" (পৃ—vii)

জীবদেহকে কল্পনা করা হইয়াছে বাঁশীর সঙ্গে এবং অনাহত নাদকে বাঁশীর শব্দের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—

> "সাতগুটি বিন্দ তাত করি অনুপাম।
> সুবর্ণের সান্ধী হিরার বান্ধিল কাম ॥
> হরিষে পুরিআ কাহ্নাঞি তাহাতে ওঁকার।
> বাঁশীর শবদে পারে জগ মোহিবার ॥" (বংশীখণ্ড)

এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীস্থ সাতটি ছিদ্র যথাক্রমে জীবদেহস্থ ছয়টি চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামে এবং সপ্তম ছিদ্রটি 'সহস্রার' রূপে বর্ণিত—এই সহস্রারে উপনীত হইলেই সাধক 'ওঁ' বা শূন্যত্ব অনুভব করেন। "আবার বিষ্ণুর ভূতিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির ভিতরে ক্রিয়াশক্তির একটি মন্ত্রময়ী স্থিতি আছে। এই ক্রিয়াশক্তি যখন জাগ্রতা হয়, তখন তাহা নাদরূপতা গ্রহণ করে। এই পরম নাদ যেন দীর্ঘ ঘণ্টাস্বনের মত, পরম যোগীরাই শুধু এই নাদশক্তিকেই সাক্ষাৎ করিতে পারেন। সমুদ্রের বুদ্বুদের ন্যায় কচিৎ এই নাদ উন্মেষ লাভ করে, উন্মেষহীন অবস্থায় যোগীরা ইহাকে 'বিন্দু' বলিয়া থাকেন।" ১ ॥

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শন ও সাহিত্যে—শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃ—৫

মেরুদণ্ডের বাম ভাগে চন্দ্ররূপিণী ইড়া (গঙ্গা), ডান ভাগে সূর্য-রূপিণী পিঙ্গলা (যমুনা] এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না নামক নাড়ীত্রয় জীবদেহে বিদ্যমান এবং ইহাদিগকে নদীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সাধক এই যমুনা নদীর তীরেই বংশীধ্বনি সাধনারত অবস্থায় শুনিতে পান—

"কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ এ গোঠ গোকুলে ॥"
"বাঁশীর শবদে প্রাণ হরিআঁ।
কাহ্ন গেল কোন দিশে ॥" [বংশীখণ্ড]
"কি কহবরে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে অনুভোর ॥"
"বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবধূ বাহির করয় ॥" ১

* * *

কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥" ২

যোগী পূর্বোক্ত তিন নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া 'প্রজ্ঞা'রূপ নৌকারোহণে সাধনারতাবস্থায় পূর্বোক্ত ষট্‌চক্র অতিক্রম করেন এবং সহস্রার শূন্যতা প্রাপ্ত হন। সসীম হইতে অসীম এবং আকার হইতে শূন্যতার পথে যাত্রাই কৃষ্ণতত্ত্ব। সাধক মণিপুর নামক তৃতীয় চক্রকে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ অনাহত চক্রে প্রবেশ করিলে অনাহত নাদ রূপ বংশীধ্বনিতে আকুল হইয়া উঠে। অনাহত ধ্বনি যেন বংশীধ্বনির আকার ধারণ করিয়া রাধাকে অর্থাৎ সপ্তরূপনিবৃত্তা শুদ্ধাসাত্বিকা প্রকৃতিকে আহ্বান করিতেছেন, প্রকৃতিও তাহার অবিদ্যারূপ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের মুক্তির জন্য ধাবমানা, সাংখ্যের-

১-২। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী। বিমানবিহারী মজুমদার—পৃ ঃ২৩,২৪

মতে পুরুষের মুক্তিসাধনের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য। (পৃঃ৪—সাংখ্যকারিকা ২১)।

বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্বের মতানুসারে রাধাকৃষ্ণের ব্যাপারটাকে আনা হইয়াছে শিব ও শক্তি অথবা উপায় ও প্রজ্ঞানামক তত্ত্ব হইতে। জগতে সমস্ত পুরুষের ভিতরে শিবত্ব এবং সমস্ত নারীর ভিতরে শক্তিত্ব বিরাজিত—ইহাই প্রচলিত ধারণা। "জীব কামরসে লিপ্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, আকারভেদে কাম নানাস্থানে জীবকে বাঁধিয়াছে তাই কামচক্র বা রাধাচক্র জীবাত্মার অধিষ্ঠান বলিয়া, উহার নাম স্বাধিষ্ঠানচক্র! কামই প্রেমে পরিণত হয়, তখন কামচক্র রাধাচক্র হইয়া দাঁড়ায়" ।১

"Now the conception of Krisna and Radha of the Vaisnabas was interpreted by the Sahajiyas in a sense akin to the conception of Siva and Sakti or Upaya and Prajna—and all the males and females were thought of as the physical manifestation of the principle of Krisna and Radha"' ২

পুরুষকৃষ্ণ জীবের 'মূলাধার'চক্রে যে প্রকৃতিরূপিনী 'কুণ্ডলিনী'-শক্তি সর্পাকারে কুণ্ডলিতাবস্থায় নিদ্রিতা এবং রাধারূপে পরিকল্পিতা-নারী, তাহাকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছেন সাধনার বলে। কিন্তু মহাকালী আজ মহাকালের নিদ্রায় নিমগ্না—তাই পুরুষকৃষ্ণ রাধার নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছেন, কিন্তু বালিকা রাধার চিত্তে কোন বিকার নাই, সাধকের কোন স্পন্দন নাই—যেহেতু দেবী 'মূলাধারে' তমোনিদ্রায় নিদ্রিতা। রজঃপ্রবৃত্তি ব্যতীত বালিকার যেমন কামবাসনা প্রকট হয় না, তদ্রূপ তমঃশক্তিও রাজসিক শক্তির সাহচর্য ব্যতীত প্রকাশ পায় না—তাই তমোময়ী রাধাকে রজঃসম্পন্ন ভোগের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণের সমস্ত সাধ্যসাধনা নিষ্ফল হইল। এইবার রাধাকে অর্থাৎ

১। নাথসাহিত্যের ইতিহাস, দর্শনও সাধনপ্রণালী—কল্যানী মল্লিক—১১শ পরিচ্ছেদ।

২। Obscure Religious Cult—S. P. Dasgupta, P. 140

তমোময়ী নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন—

"বামহাতে ধনু ডাহিনহাতে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ুচণ্ডীদাস বাসুলী বরে॥ (বাণখণ্ড)

এইবার রাজসিক বাণের আঘাতে অর্থাৎ সাধনার ফলে পুরুষ প্রকৃতিকে রজোময়ী করিয়া তুলিলেন, কুলকুণ্ডলিনীর ভিতরে চঞ্চলতার সৃষ্টি ঘটিল, রাজসিকা রাধা অস্থির হইয়া উঠিলেন অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী সাধকের রাজসিক সাধনার ফলে স্বাধিষ্ঠান চক্রের দিকে ধাবমানা হইলেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' -বাণখণ্ডে'র ভিতরে যে একটি নূতন সাধনতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত বিবরণ পরবর্তী 'বাউলগানে'র ভিতরে উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একান্ত দৈহিক স্থূলতার মধ্যে এবং নিখিল মানবের আদিম রিপু কামের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ কামের ভিতর দিয়াই প্রেমের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। বাউলদের মতে প্রেমের ভিতর দিয়া যে রসের আবির্ভাব ঘটে তাহাই সহজ স্বরূপ শূন্যতা। বাউলপন্থী বৈষ্ণবদের ভিতরে প্রচলিত আছে যে, 'বাণ' পুরুষশক্তির এবং 'গুণ' প্রকৃতিশক্তির প্রতীক —ইঙ্গিতার্থক ভাষায় এই সাধন প্রণালীর নাম 'লিঙ্গযোনিসাধনা' অর্থাৎ গুণে (যোনিদেশে) বাণ (লিঙ্গ) যোজনা করিয়া ঊর্ধ্বদিকে লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে এবং 'শূন্যমণ্ডলে' পৌঁছিতে হইবে। নরনারীর পরস্পর যৌনমিলনের নাম 'বাণক্রিয়া' এবং এই ক্রিয়ার পাঁচটি প্রথা আছে—মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন, কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সাধনায় বাউলগণ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম চারিটি অঙ্গকে সাধনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে—যম নিয়ম, আসন, ও প্রাণায়াম। বায়ু ও কামই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ;

রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক প্রাণায়ামের বিধিত্রয়ের ভিতর দিয়া বায়ুকে জয় করিতে পারিলে এবং যৌনবৃত্তিকে 'বাণসাধনার' ভিতর দিয়া সংযত করিতে পারিলে যোগাঙ্গের অবশিষ্ট প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাসের চেয়ে সহজতর হইবে—তাই ইহা সহজ সাধনা, বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার আরও কয়েকটি সমর্থন সূচক কবিতা—

"উভয়ে সমান হইলে তবে ইহা মিলে
সাধারণী হইলে ইহা যায় রসাতলে ॥" (প্রেমবিলাস)
"দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে।
দোহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয় ॥
তবে সে সহজসিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়।" (প্রেমানন্দ লহরী)
"প্রকৃতিপুরুষ দোহে একরীতি
সে রীতি সাধিত হয়।" (চণ্ডীদাস)

"সাধনার দিক দিয়া মদন রতিশক্তির প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রতীক। প্রকৃতিদেহের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানগুলি স্পর্শ, বিশেষতঃ চোখের দৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি: মাদন প্রকৃত ক্রিয়ার প্রতীক—বাউলদের ভাষার হিল্লোল। এইসময় উত্তরোত্তর উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, এই সময়ে দক্ষিণের 'পিঙ্গলা' নাড়ীতে সামান্য কিছু নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত করিতে হয়। প্রথম 'মদনে' বামের 'ইড়া' নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস গ্রহণ আরম্ভ করিয়া 'মাদনে' দাক্ষণের 'পিঙ্গলা' অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় কিছু সময় শ্বাস গ্রহণ করিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। বাউলদের 'বাম' ও 'দক্ষিণ' শব্দ দুইটি বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। 'বামে' চন্দ্র নাড়ী 'ইড়া'র সাম্যাবস্থা, 'দক্ষিণে' 'পিঙ্গলা' সূর্যনাড়ীর চাঞ্চল্যজনক অবস্থা। 'দক্ষিণ' কামের অবস্থা, এখানে বিন্দুচাঞ্চল্য স্বাভাবিক, এইজন্য সর্বদা তাঁহারা দক্ষিণ পরিত্যাগ করেন, চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদে আছে—

"দক্ষিণ দিকেতে কদাচ না যাবে, যাইলে প্রমাদ হবে"

কিন্তু কাম সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ 'মাদন' সাধনার সময় সামান্য কিছুক্ষণ দক্ষিণ অবলম্বন করার তাৎপর্য এই যে, কামের বৃদ্ধিতে বিলাস পূর্ণতা লাভ করে। বিলাস দ্বারা কামচেতনাকে উদ্বুদ্ধ না করিলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে না।

কৃষ্ণদাস 'রত্নাকর' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"কামরাগ হয় অতি রসের উল্লাস।
দক্ষিণা রাগেতে হয় যথাযোগ্য বিলাস॥" ৪৭৫॥

যথাযোগ্য বিলাসের জন্যই মনে হয়, এই কামের উত্তেজনার প্রয়োজন হয়। মদন-মাদন বাম ও দক্ষিণ নেত্রে অবস্থিত বলিয়া চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদেও উক্ত আছে—"মদন বৈসে বাম নয়নে, মাদন বৈসে দক্ষিণ নয়নে॥"

তৃতীয় শোষণ বাণ। এই বাণের ক্রিয়ায় বিশেষ যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। সাধারণতঃ যোগশাস্ত্রে যাহাকে 'বজ্রোলী' মুদ্রা বলে, অনেকটা তাহারই ক্রিয়ার দ্বারা এখানে লক্ষ্য করা যায়। যোগ শাস্ত্রের এই নামটি তাহাদের হয়ত অনেকেই জানে না, তবে এই ক্রিয়াটি তাহারা গুরুর উপদেশে প্রথম হইতেই আরম্ভ করে, আর মিলন ক্রিয়ার সময়, তাহারা রূপ-রতি-রস শোষণ করে। সাধনক্রিয়ার এই কথা তিনটির একটা বিশেষ অর্থ আছে। বাউলরা রূপ বলিতে 'রজঃ', রতি বলিতে 'স্ত্রীবীর্য' এবং রস বলিতে 'শুক্র'কে বুঝিয়া থাকে। মন্থনে বিচলিত বিন্দু একটি বিশেষ আভ্যন্তরীণ রসক্ষরণ করে এবং রক্তের কিছু অংশ সাধক শোষণ বাণে আকর্ষণ করে।

তারপরেই 'স্তম্ভন' বাণ। স্তম্ভনে উভয় দেহের রসের একটা স্থিরতা সম্পাদিত হয় এবং কোন চাঞ্চল্যের আর সম্ভাবনা থাকে না, এই অবস্থায় ক্রিয়া চলিতে থাকায় ক্রমে দেহের বিভিন্ন স্পর্শকাতর অংশস্পর্শও নানাভাবে এই স্থির অচঞ্চল আনন্দানুভূতিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া চরম অবস্থায় উপনীত করা হয়।

ইহার পরেই সম্মোহন বা মোহন বাণ এই সময়ে ক্রমে দেহস্মৃতি

লুপ্ত হইয়া যায়—কেবল বিপুল আনন্দের এক তরঙ্গায়িত আনন্দ অনুভূত হয়। ইহাই বাউলদের 'জ্যান্তে-মরা' অবস্থা। ইহাই তাহাদের প্রেমের অবস্থা। এখন কাম বা দেহভোগের অবস্থা উত্তীর্ণ। এখন উভয় পক্ষেরই প্রকৃতি বা পুরুষ বলিয়া কোন অভিমান নাই। কেবল একটা বিপুল আনন্দের অনুভূতি বর্তমান। ইহাই কামের মধ্য হইতে প্রেমের উদ্ভবের স্বরূপ।"[১]

কৃষ্ণের বাণাহতা রাধা অর্থাৎ তামসী প্রকৃতি বাণাহতা হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল, পুরুষের সঙ্গে আর তাহার সাহচর্য বজায় রহিল না—পাগলের মত রাজসিকা প্রকৃতি চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু সাধক পুরুষ কৃষ্ণকে আর প্রকৃতির সাতটি রূপ—ধর্ম, অধর্ম, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য ও অজ্ঞান আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না, ধ্যানযোগে পুরুষ প্রকৃতিকে স্পর্শ করাতে প্রকৃতির সৃষ্টির সহায় পূর্বোক্ত সাতটি রূপের সঙ্গে অষ্টম রূপ অর্থাৎ জ্ঞান ফিরিয়া পাইল অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরুষের স্পর্শে প্রকৃতি তাহার অষ্টধাতু অর্থাৎ অষ্টরূপ ফিরিয়া পাইল। প্রকৃতি বুঝিতে পারিল যে, পুরুষ অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হইয়া শূন্যতা বা নির্বাণ লাভ করিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য পুরুষের মুক্তির জন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়া, তাহার আর প্রয়োজন নাই—প্রকৃতির উদ্দেশ্য শেষ হইয়াছে—

"কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহরিল অষ্টধাতু আইল আবার॥
ধেয়ান করিআঁ করে ঝাড়ে বনমালী।
ধীরে ধীরে গাওখানি তোলে চন্দ্রাবলী॥" (বাণখণ্ড)

এই অষ্টধাতু কথাটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। মূল প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই সাতটি বিকৃত উপাদানে বিভক্ত হইয়া থাকে সৃষ্টি কার্য পরিচালনায় জন্য এবং পুরুষের মুক্তির জন্য। পুরুষ মুক্ত হইলে আবার প্রকৃতি ও সপ্তটি

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পৃঃ ৪১০-১১

উপাদান—এই আটটি উপাদান একত্রিত হইয়া মূল অবিকৃতি প্রকৃতিতে পরিণত হয়। (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪—সাংখ্যকারিকা—৩,২১)

'রাধাবিরহ খণ্ডে' দেখা যায় প্রকৃতি ও পুরুষের চরমতম বিকাশ ও পুরুষের কৈবল্য প্রাপ্তি অর্থাৎ শূন্যতাবোধ—

"আহোনিশি যোগ ধেআই।
মনপবন গগনে রহাই ॥
মূল কমলে করিয়ে মধুপান।
এঁবে পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেয়ান ॥
দূর আনুসর সুন্দরী রাহী।
মিছা লোভ কর পাঁয়িতে কাহ্নাঞি ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মনপবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিল কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥
গেআন ছেদিল মদন বাণ।
তে আর না ভোল তোহ্মার যৌবন ॥
দেহে এবে মোর নাহি বিকার।
আন্ধার দেখীলো সব সংসার ॥
রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী।
নাগর বর দেব চক্রপাণী।
ধেআনে থাকিল নিচল মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীগণে ॥" (রাধাবিরহ খণ্ড)

চর্যাপদে যেমন সাংখ্য-পাতঞ্জল সমর্থিত সহজিয়া মত ও শূন্যবাদের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বিষয়বস্তুও তাহাই। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে আগাগোড়াই প্রেমবাক্য—আর চর্যাপদে দুই একটি প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্মের দিক দিয়াও চর্যাপদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তনের কতক মিল রহিয়াছে, বৌদ্ধ সহজপন্থীরা তান্ত্রিক ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় চর্যাতে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা নামে অভিহিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের অফুরন্ত রূপের উৎস শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভিতরে পাওয়া যায়, করুণা বা প্রেম—মহাসুখানুভূতি। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মত চর্যাপদেও যোগসাধনার কথা রহিয়াছে—

"কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ আচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারে॥"

শূন্যতত্ত্বের অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতিকে নিয়া চর্যাপদেও প্রেম কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে—পুরুষের নাম দেওয়া হইয়াছে—কপালী, শবর, যোগী ইত্যাদি এবং প্রকৃতির নাম দেওয়া হইয়াছে—শবরী, চণ্ডালী, যোগিনী প্রভৃতি। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আসরে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার যুগ অবসানের পর বড়ু চণ্ডদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, চর্যা ও বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতরে সেতুরূপে বিরাজিত।

সাংখ্য-পাতঞ্জলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের সম্পর্ক সম্বন্ধে 'ভাষা-সর্বস্ব' টীকা হইতে উদ্ধৃত—"আহোনিশি যোগ ধেআই" ইত্যাদি—আমি সর্বক্ষন যোগধ্যানে রত রহিয়াছি। মন ও বায়ুকে লয়স্থানে রক্ষা করিতেছি। পরম শিবের সহিত বিলাসান্তে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। এখন আমাকর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান অধিকৃত।" "(মনের স্থিতি আজ্ঞাচক্রে। সহস্রদল কমলের অধোভাগে বায়ুর লয়স্থান। 'গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশদ্বারমিতি যাবৎ')"—টীকা

"ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ইত্যাদি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে মন ও পবনকে লীন করিয়াছি। নবদ্বার (চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ) এবং দশম দ্বারে ক পাট দিলাম। এখন আমি যোগমার্গে আরূঢ়।

উপরে স্পষ্টতঃ ষট্‌চক্র ভেদের উল্লেখ হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে

ষট্‌চক্র ও তাহার ভেদক্রমের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে এবং পৃষ্ঠাস্থির অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্রে সুষুম্না নাড়ী মস্তকে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই বজ্রাখ্যা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে পরস্পর চিত্রিনী ও ব্রহ্ম নাড়ী অবস্থিত। শরীরের স্থান বিশেষে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত আধারাদি করিয়া সাতটি পদ্ম কল্পিত হয়। সুষুম্না নাড়ীর অগ্রভাগে পায়ুদেশের কিছু ঊর্ধ্বে আধার পদ্ম। ইহার চারিটি দল। প্রত্যেক দলে চারিটি বর্ণ, মধ্যে 'ধরাচক্র' নামক একটি চতুষ্কোণ চক্র; মধ্যস্থলে ধরাবীজ ও কর্ণিকা মধ্যে একটী ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই পদ্মে লিঙ্গরূপী সয়ম্ভু বর্ত্তমান এবং এই সয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ও ব্রহ্মদ্বারে মুখ রাখিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। লিঙ্গমূলে ছয়দল বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, ছয়দলে ছয়টী বর্ণ। মধ্যভাগে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল, মণ্ডলের মধ্যে অর্ধচন্দ্র ও তাহাতে বরুণ বীজ আছে। এই পদ্মে বরুণ শক্তি বিরাজিতা। নাভিমূলে দশাক্ষরযুক্ত দশ দলে প্রকাশিত 'মণিপুর' পদ্ম। মধ্যস্থলে ত্রিকোণ বৈশ্বানরমণ্ডল, ত্রিকোণের ত্রিপার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যে বহ্নিবীজ। এই পদ্মে 'লাকিণী' শক্তি আছেন। হৃদয়ে দ্বাদশ দল সমন্বিত অনাহত চক্র, দ্বাদশ দলে দ্বাদশ বর্ণ, মধ্যে ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল ও তাহাতে বায়ু বীজ। অনাহত পদ্মে (বাণ লিঙ্গ) শিব ও কাকিণী শক্তির বাস। কণ্ঠেস্থিত বিশুদ্ধ নামক পদ্মের ষোড়শ দলে ষোড়শ বর্ণ, কর্ণিকাতে বৃত্তাকার চন্দ্রমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং নভোবীজের স্থান। উক্ত পদ্মে সদাশিব ও শাকিনী দেবী অধিষ্ঠিতা। ভ্রূমধ্যে বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট আজ্ঞা পদ্ম ও কর্ণিকা মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রে (শবরূপ) শিব ও কাকিনী শক্তির স্থান নিরূপিত। তদূর্ধ্বে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা ও তাহার উপরি ভাগে চন্দ্রবিন্দু, সর্বোপরি (অধোমুখ) সহস্রদল পদ্ম। উহার পঞ্চাশৎ দলে পঞ্চাশৎ বর্ণ, কর্ণিকাতে চন্দ্রমণ্ডল ও ত্রিকোণ যন্ত্র। সহস্রদল পদ্মে শক্তিনীর সহিত পরম শিব অবস্থান করেন।" (টীকা)

যমনিয়মাদি অভ্যাসরত সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রদল কমলে পরম শিবের সহিত মিলাইয়া দিবে এবং গলিত পরমামৃত পানে পরিতৃপ্তা কুণ্ডলিনীকে আধারকমলে ফিরাইয়া আনিবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ছয়টি চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে গমন করিলেই সাধক সহজ স্বরূপ শূন্যতা প্রাপ্ত হইবে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বিষয়বস্তু।

ষট্‌চক্রের বিচারে সহস্রার শূন্যে বিরাজিত শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন প্রকৃতি ও পুরুষরূপে দ্বিধাবিভক্ত হইলেন এবং রজঃ স্রাবের সঙ্গে রসরাজ লীলা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিন দিন তিন রূপ ধারণ করতঃ সহজ মানুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর প্রকৃতি ও পুরুষের শৃঙ্গার দ্বারা উর্দ্ধগত হইয়া স্বস্থানে যুগলরূপে নিত্য রসলীলা আস্বাদন করেন—ইহাই বাউল গানের মূল ভাবধারা। “নারী রজঃস্বলা অবস্থায় সাধিকা রূপে একটি সাধকের সহিত মিথুনীভূত অবস্থায় মিলিত হইবেন। সাধক-সাধিকা এই তিন ক্রিয়ার শেষে ‘সহজ মানুষে’র আগমন হয় বলিয়া অনুভব করেন। এই সঙ্গমসাধনারত প্রকৃতি-পুরুষের অর্থাৎ রজোবীর্যের যে মিলনাত্মক নিবিড় আনন্দময় অবস্থা, তাহাই তাহার স্বরূপ। তিনি নিরন্তর যে শৃঙ্গাররত, সেই শৃঙ্গার কামগন্ধ হীন—একান্ত প্রেম শৃঙ্গার। তিন দিন ধরিয়া যে রেচক, পূরক ও কুম্ভক চলিতে থাকে, তাহার ফলে নাড়ীমণ্ডলী পরিষ্কৃত হয়। বায়ুর সাম্যাবস্থার সঙ্গে সুষুম্নার পথ সরল হয় এবং রজোবীজ ক্রমাগত পাক খাইতে খাইতে অটল স্থির হয়। তৎকালীন অচঞ্চল ও নিবিড় প্রেমানুভূতির মিলনে সহজ মানুষের স্বরূপানুভূতির মিলন। এই চরম আনন্দানুভূতিকে স্থায়ী করিতে হইলে কুম্ভকের সাহায্যে তাহাকে উর্ধ্বে লইয়া যাইতে হইবে।” “এই সহজ মানুষ এক অপ্রাকৃত দেহধারী। কেবল অনুভূতিগম্য, নিবিড় অচঞ্চল মিথুনানন্দ স্বরূপ। সেইজন্য তিনি ভাবের মানুষ।” ১

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৪২১

"সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে।
যে জানে নীরের খবর নীর খাটায় তারে খুঁজলে পায় অনায়াসে
বিনা মেঘে নীর বরিষণ, করিতে হয় তার অন্বেষণ
যাতে হল ডিম্বের গঠন, থাকিয়ে অবিলম্ব শুন্তোবাসে
যথা নীরে হয় উৎপত্তি সেই আবেশ জন্মশক্তি
মিলন হল উভয় রতি ভাসলে যখন নরেকারে এসে।
নীরেতে নিরঞ্জন অবতার নীরেতে সব করবে সংহার
সিরাজ সাঁই কয় বারেবার দেখরে লালন আত্মতত্ত্ব বশে।" ১

"শূন্যভরে এক দারাক পয়দা তা দেখে লোকে হাসে।
শিকড় কাটলে গাছ মরে না, ভাই আজব রং মরি হুতাশে।
গাছের উল্টা যাহার মূল, গাছের শিকড়ে তুই ফুল।
ফুলটি রত্ন সমতুল, ভাইরে দেখ সবে ঘরে ঘরে।
নীচে দুই চাকা ঘুরে, ছয়জন সেই রথে চড়ে।
জাইট সমতুল পড়বে খসে ভাইরে।
মন্থুরা ছাড়িয়া পালারে।
শুনেছি গাছের মাসে মাসে ফুটে ফুল
ভাইরে গাছের ফল ঝরে ভিতরে।"২

শূন্য হইতে সৃষ্টি বিবরণ দিতে গিয়া উল্টামূল বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রজোবীজ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে প্রতি মাসেই নারীর রজঃস্রাব ঘটে—যাহার উপর জন্ম নির্ভর করে। উপনিষদে এই রজোবীজ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, এমনকি শুক্রকে ব্রহ্ম বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে—

"ঊর্ধ্বমূলোহবাক্ শাখঃ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥"

(কঠোপনিষৎ—২।৩।১)

১। লালন গীতিকা—মতিলাল দাস—পৃঃ ২২৫
২। হারামনি—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন—পৃঃ ১০৫

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, আত্মাস্বরূপ রেত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রমণক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইল—সুতরাং বাউলদের এই ভাবধারা শাস্ত্রসম্মত এবং চৈতন্যদেবও এই ভাবধারা নিয়া সাধনারত হইয়াছিলেন। "স ইমমেব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবৎ (৯।৪)

"স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত যোগসাধনার বীজরূপে বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি অবলম্বিত চর্যাপদ এই ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব পদে ও বাউল গানে এই অদ্বয় সত্তাকে পরিবেশন করিয়াছে। চর্যার 'যুগনদ্ধই' বৈষ্ণবের 'যুগলমিলন' ও বাউল গানের 'রজোবীজ' মিলনে পরিণত হইয়াছে।" ১

"রাধাকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে তারি চ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"
"কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় মধ্যম স্নান॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যামপট্ট সাটী পরিধান॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত-আদি ৮)

নারী রজঃস্বলা হইলে সাধনার উপযুক্ত সময়। সাধক ও সাধিকা এইদিন সঙ্গমে রত হইবে—প্রথম দিন 'গুণের মানুষ' আসিবে এবং এইদিনে সঙ্গমকে বলা হয় 'কারুণ্যামৃত স্নান', দ্বিতীয় দিনের সঙ্গমের নাম 'তারুণ্যামৃত স্নান' এবং তৃতীয় দিন ঈশ্বর উদয় হইবে এবং এই দিনের সঙ্গমের নাম 'লাবণ্যামৃত স্নান'। তারপর সহজের আবির্ভাবের

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-পৃঃ ৩৮৩

আশায় সপ্তদশ দিবস পর্যন্ত সঙ্গম ক্রিয়া চলিবে—অনেকে শেষ দিন উল্টা বিহার করে—ইহাই নাকি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবগণের ভিতরেও এই সাধনার প্রচলন ছিল।

"অধোদৃষ্টি করিতেই (অর্জ্জুন) মৎস কৈল ছেদ।
উল্টা জানিবে তৈছে সাধনার ভেদ॥
এমত জানিবে মন বাণের ভজন।
তাহাতে লইয়া পঞ্চ বাণের কারণ॥
সাধন সমর্থ হৈলে রিপু পরাভব।
দিনে দিনে রসোল্লাস পাবে অনুভব॥"
"যেসব নায়িকা এবে করিয়া গণন।
যার সঙ্গে যেই কর্ম করিল সাধন॥
শ্রীরূপ করিলা সাধন মীরার সঙ্গিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণাবাই সাথে॥
লক্ষীহীরা সঙ্গে করিলা গোসাই সনাতন।
পিরিতি প্রেমে সেবা সদা আচরণ॥
গোঁসাই লোকনাথ চণ্ডালিকা কন্যা সঙ্গে।
দোহজন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম।
গোঁসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ॥
শ্যামা নাপিতানীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই।
পরম পিরিতি কৈলা যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী পিরিতি উল্লাসে।
কিরাবাই সঙ্গে করে রাধাকুণ্ড বাসে॥
গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই॥
রায় রামানন্দ যজে দেবকন্যা সঙ্গে।
আরোপেঁতে স্থিতি তেহঁ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥

মহাপ্রভু মর্ম সাধিলেন যার সাথে।
বিচারিয়া অনুভব দেখ চরিতামৃতে ॥
শাঠিকন্যা সঙ্গে প্রভুর সদা ব্যবহার।
ত্রিভুবনে তুলনা নাহিক যাহার ॥" ২

ধর্মীয় সংস্কৃতি, নাগরিক সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতির বাহিরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর্ণজ্ঞানহীন ও সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত 'বাউল' নামধারী একদল গায়ক আধ্যাত্মিক ভাবের চরম পরিণতি শূন্যবাদকে অবলম্বন করিয়া এমন এক সঙ্গীতধর্মী ও মোহময় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাহারা স্বর্গের সুখকামনা করে না, তাহারা চাহে মুক্তির আনন্দ—তাহাদের মতে প্রেম হইল চিন্ময়ের প্রকাশ, প্রেমরস স্বর্গের অমৃতের চেয়ে মহত্তর—

"প্রেম আমার পরশমণি তারে ছুঁইলে কাম হয়রে সেবা।
তাই গোলোক চায় ভূলোক হৈতে মানুষ হৈতে চায় দেবা ॥"

মুসলমান সমাজ হইতে আগত বাউলগণ সাধারণতঃ সুফী নামে পরিচিত। তাহাদের মতে অসীম, অনন্ত ও অব্যক্ত এক শক্তি হইতে অনুলোম গতিতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপে সৃষ্টির প্রকাশ, তদ্রূপ আবার বিলোম গতিতে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বা শূন্যে পরিণতিমুক্তি—শূন্যবাদীরা যেমন শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন বলে, তাহারাও তেমন এক ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়া থাকে। তাহাদের মতে সৃষ্টিক্রমে পাঁচটি স্তর আছে—

১। হাউৎ—সর্বোচ্চ স্তর—স্থান, কাল ও আপেক্ষিকতার বাহিরে শূন্যস্থান—সমস্ত সৃষ্টির আদিমূল। ইহা নির্গুণ, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, অসীম ও অনন্ত।
২। লাহুত—কল্পিত ঈশ্বরের শক্তি অনুভূত হয়, সৃষ্টির প্রথম স্তর
৩। জবরুত—সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর—জীব এখানে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে

২। বিবর্তবিলাস—চতুর্থ বিলাস।

৪। মালকুত—সূক্ষ্ম দেহীদের স্থান

৫। নাছূত—রক্ত মাংসের শরীর ও জড় প্রকৃতির স্তর।

"ছিয়া (কালো) সফেদ (সাদা) লাল-জরদে (হলুদ) নূরের আসন
ঘিরে রয়।

মোকাম নাছূত, লাহুত, মালকুত, জবরুত চারি হয়॥

চার মোকামে মঞ্জিল দ্বারে গুপ্ত বেশে কিরণ দেয়।

লা মোকামে নূরের আসন, হাউতে নবোত বাজায়॥" ১

"অধরাকে ধরবে, ওরে সহজ মনচোরা।
ঠিকানা দেখি যেয়ে কোন্‌নগর পাড়া॥
ঠিকানা বলি সহর দিল্লী, লাহুতের মোকামে গলি।
নাছূতের উর্ধ্ব ভাগে দিতে ছিল পাহাড়া।
জীবন জেলার নীচে, ও মন, চৌষট্টি হল করা আছে॥
সহস্র পরদার নীচে, সোনার করা।
সহস্র পরদার নীচে, সোনার হল করা॥
হৃদয়ের পূবের হাওয়ায় ঘোড়া, সওয়ার হয় তাতে মনচোরা।
স্টেশনে এসে দেয় পাহাড়া দেখনা এসে তোরা॥
রূপ নগরে বিহার করে হাওয়ার ঘোড়ায় লাগাম ধরে।
ভাটা জোয়ার বন্ধ করে ধরগে যেয়ে তোরা॥" ২

অজস্র শূন্যবাদমূলক গান বাউলগণ রচনা করিয়াছেন—"সহজ ব্যক্তির যে আমি তা মূর্তামূর্তের মিশ্রণ, তা দেশযুক্ত নির্দেশ, কালযুক্ত অকালিক, তা শূন্য ও অশূন্যের সুন্দর সমন্বয়। শূন্য স্বরূপে তার স্থিতি।" ৩

"শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর।
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ জোড়ে সমানভাবে নিরন্তর॥

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—২৫৪

২। হারামণি—মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন—৭১

৩। বাংলার বাউল কাব্য ও দর্শন—সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃ ১৪

কমলের সহস্রেক দল, তাতে বিরাজ করে সোনার মানিক কিবা সে উজ্জ্বল।

তারে যেই চেয়েছে, সেই পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর॥

কমলের ডাঁটাতে কাঁটা, আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেটা।

কেবল পায়রে দেখা যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর॥

ফিকিরচাঁদ ফকিরে বলে. সে সাপকে ধরে বশ করেছে যেজন কৌশলে।

কেবল সেই পেয়েছে নিজের কাছে সোনার মানিক মনোহর॥" ১

এইবার বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে শূন্যবাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু গান উদ্ধৃত করা হইতেছে। মণীন্দ্রনাথ বসুর সহজিয়া সাহিত্য (পৃ ৬২)

"শুনহ কহিয়ে সার।

"এসপ্ত স্বর্গ উপরে বৈকুণ্ঠ অপার ঐশ্বর্য সার॥
বৈকুণ্ঠ উপরি অনন্ত গোলোক জগৎমোহন ধাম।
যাহার উপরি নিত্য বৃন্দাবন যাহাতে বিহারে শ্যাম॥"
"গোলোক উপরে অযোনি মানুষ নিত্যস্থানে সদা রয়।
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি লীলাকায়া যেবা হয়॥
তাহার উপরে নিত্য বৃন্দাবন সহজ মানুষ জানে।"

(চণ্ডীদাস পদাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ ৩৬৩)

"প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান॥"
"মথুরায় দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হইয়া॥
বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজ গুণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥

১। বাংলার বাউল কাব্য ও দর্শন—সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নং ৫৯

পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥"
"বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের শোভা পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধ রূপ নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাহা, নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥" ১
"বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বভাগে নিত্য পর্বস্থান।
ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠ গোলোক আছের অগোচর ॥
নিত্য বৃন্দাবন নাম গুপ্ত চন্দ্রপুর।
অবিচ্ছিন্ন প্রেমধার আনন্দের পুর ॥

* * *

পবনের গতি নাহি, সূর্য নাহি চলে।
অচল কৃতির পথ সহস্রার দলে ॥"

(পঞ্চানন মণ্ডলের সংগৃহীত 'যোগীর গান')

দেখা যায় যে বৈষ্ণব সাহিত্যও ষট্‌চক্র, সহস্রার ও শূন্যত্বকে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে। আশা দাসের 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাধনা' (পৃ ১৫৭-৫৮)-তে বর্ণিত হইয়াছে—"বৌদ্ধদিগের প্রজ্ঞা ও উপায়জনিত অসীম আনন্দানুভূতি 'মহাসুখ' আখ্যা পাইয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাহাকেই মহাভাব বলিয়াছেন। সুতরাং প্রজ্ঞোপায়ের অদ্বয় মিলন স্বরূপ মহা সুখানুভূতি রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সুখৈকানুভূতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। উভয়ানন্দানুভূতিতে কোন অবসাদ নাই, কোন নির্বেদ নাই। কিন্তু বৌদ্ধপ্রজ্ঞা পরমশক্তিরূপিণী, সৃষ্টির মূলীভূত কারণ—আদি জননী। আর বৈষ্ণবদের রাধা কেবল প্রেমরূপিণী। হেবজ্রপ্রতিমাজ্ঞান ও পূর্ণতায়, অনুরাগ ও নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে দ্বন্দ্ব জটিল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে কেবল আনন্দ ও রস। বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য আপন দেহে উভয় তত্ত্বের—প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনজনিত সামরস্য বা মহাসুখ উপলব্ধি করা। সাধক

শূন্যরূপিণী নৈরাত্মা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ অনুভব করেন। নৈরাত্মা দেবী প্রজ্ঞা, তিনি নারী-রূপিণী এবং সাধক পুরুষের প্রতীক। সুতরাং বৌদ্ধদের নিকট যাহা ছিল যোগ সাধনা মাত্র, বৈষ্ণবদের নিকট তাহাই প্রেম সাধনায় পরিণত হইয়া মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতিকে নূতন ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে।"

স্বরূপের সন্ধানে গমনশীল সাধক পুরুষ রাধারূপিণী প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সর্বশূন্যত্ব ভাবের সাহায্যে মহাসুখ, নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করিতে পারেন—

"শুনহ কারণ নন্দের নন্দন প্রকৃতি ভাবিয়া শ্যাম।
প্রকৃতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া জপিছে তাহার নাম॥ ১

"আদ্যাশকতি রাধাকৃষ্ণ আদি পুরুষ।
এক ব্রহ্ম দুই রূপে করয়ে বিলাস॥" ২

"এই সব রস যাঁহাতে প্রকাশ স্বরূপ তাঁহার দেহে।
তাঁহারে ভজিবে স্বরূপ পাইবে শ্রীচৈতন্য দাস কহে॥ ৩

উক্ত 'স্বরূপ' কথাটিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিলে দুইটি অর্থ পাওয়া যায়—একটি নিজের প্রকৃত তত্ত্ব এবং অপর অর্থ—অরূপ বা শূন্যত্ব—সু+অ (অস্তিত্ব)=স্ব=নিজ অর্থাৎ স্ব (বিশেষণ) এবং রূপ (বিশেষ্য) =স্বরূপ। আবার সু+অরূপ=বিশেষ অরূপ=শূন্যত্ব।

"সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতি আশ্রয়।
প্রকৃতি পরমপুরুষ আশ্রয়॥
অতিসত্ত্ব পুরুষ কহিতে না পারি।
না কহিলে কেহ নহে ইহার অধিকারী॥
অতিসত্ত্ব পুরুষ মানুষ আশ্রয়।
মানুষ সভার শ্রেষ্ঠ সারয়॥
কতমত আছেত কত জনে।
কিন্তু না জানে সেই রাধার স্মরণে॥

১-৩। মণীন্দ্রনাথ বসুর সহজিয়া সাহিত্য—পৃঃ ৯২, ১০৮, ৩৩

সেইত মানুষের অদ্ভুত চরিত।
অদ্ভুত শৃঙ্গার তার অদ্ভুত চরিত ॥
মানুষ সেই জগতের সার।
লোচন কহে মহাবিষ্ণু না জানে কেমনে জানিবে জীব তার ॥" ১

নিত্যধামে শুধু শূন্যতাই বিরাজ করিতেছে। সত্ত্বরজস্তম :—এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে প্রকৃতির পরিচয় এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টি। প্রকৃতির আশ্রয় মানুষ এবং মানুষের আশ্রয় প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি গুণময়ী ও অচেতনা, আবার পুরুষ নির্গুণ ও সচেতন। পুরুষের মুক্তিসাধনের জন্য অন্ধ ও পঙ্গুর মিলনের মত পুরুষ ও প্রকৃতির যে সংযোগ—তাহাই সৃষ্টির উৎস।

———

১। মনীন্দ্রনাথ বাবুর সহজিয়া সাহিত্য—পৃ—৩০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শূন্য পুরাণ ও নাথ সাহিত্য

বাংলাদেশে এক সময় বৌদ্ধ ও নাস্তিক একার্থবাচক হওয়াতে নির্যাতনের হাত হইতে আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার জন্য বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধ, ধর্ম ও ও সংঘ'—এই ত্রিরত্নের দ্বিতীয় 'ধর্ম'কে শূন্যপ্রভু নিরঞ্জন নামে অভিহিত করিয়া উপাস্য দেবতারূপে গ্রহণ করেন এবং নিজেদের 'সদ্ধর্মী' বলিয়া প্রচার করেন—ইহারই ফল—"শূন্যপুরাণ' রচনা। বৌদ্ধমতে বজ্রসত্ত্বই শূন্যতত্ত্ব এবং 'শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন' অরূপ ও শূন্যে অবস্থিত মহাশূন্যমূর্তি। উর্দ্ধ ও অধোদেশে এবং চতুর্দিকে সর্বত্রই শূন্যত্ব বিরাজ করিতেছে—অনন্ত প্রসারিত মহাশূন্য 'সবি ধুন্দুকার'। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণ হইতে—

"নহি-রেক নহিরূপ নহি ছিল বন্নচিন্।
রবিশশী নহি ছিল নহি রাত্তি দিন ॥১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরুমন্দার নহি ছিল নহি ছিল কৈলাস ॥২
নহি ছিল সিষ্টি আর না ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥৩
দেবতা দেহার নছিল পুজিবাক দেহ।
মহাশূন্যর মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥৪
রিসি যে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পরবত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥৫
শূন্যথল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥৬
নহি সিষ্টি ছিল আর নহি সুরবর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥৭

বারবরত ন ছিল রিসি জে তপসী।
জলথল নাহি ছিল গঙ্গা বারানশী ॥৮
পৈরাগ মাধব নহি কি করিব বিচার।
সরগমরত নহি ছিল সবই ধুন্দুকার ॥৯
দশদিশ পাল নহি মেঘতারাগণ।
আউ মিতু নহি ছিল যম্মের কারণ ॥১০
চারিবেদ নাহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপ্তবেদ করিলেন্ত পরভু করতার ॥১১
জীবজন্ত নহি ছিল ন ছিল বিস্মুপাত।
দেবথল নহি ছিল নহি ছিল জগন্নাথ ॥১২
শূন্যত ভরমন পরভু শূন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মায়াধর ॥১৩"

ভারতের বেদবেদান্তোপনিষৎপুরাণদর্শনাদি সমুদয় শাস্ত্রে বহুবিধ সৃষ্টিপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই এমন একটি সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টির প্রবাহ দৃষ্ট হয়না। শূন্য পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি প্রণালীর বিবরণের তাৎপর্য এই যে, এখানে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকারের পরিবর্তে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে ইহা প্রতিষ্ঠিত, এমন কি 'ডারউই নথিওরী'র সহিতও ইহারে তুলনা করা করা যায়, সমস্ত প্রকার অস্তিত্ব বর্জিত মহাশূন্যের ভিতরে প্রথম উৎপত্তি হইল 'অনিল দুইজন অর্থাৎ বায়ু, ইহার ভিতর প্রথম সৃষ্টির বিকাশ চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়-বিহীন এক অসম্পূর্ণকায় নিরঞ্জন। বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয় এই যে, এই প্রভু নিরঞ্জনও সর্বপ্রথমে সৃষ্টি ক্ষমতা লাভ করেন নাই—ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিণতি সম্পন্ন হইয়াছিল। বহু যুগ-যুগান্তর যাবৎ মহাশূন্য হইতে আদিসৃষ্ট এই নিরঞ্জনকে ধ্যানের ভিতর দিয়া 'ব্রহ্মজ্ঞান'লাভে এই সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করিতে হইয়াছিল—"চৌদ্দযুগ গেল পরভুর এক বস্তুজ্ঞানে।" পরবর্তী যুগে 'শূন্যতত্ত্ব' ও

'ব্রহ্মতত্ত্ব' একত্ব প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চম বেদরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব—এই চতুর্বেদের প্রতিপাদ্যবিষয় 'ওঁ' ধ্বনি নহে, এই ধ্বনির আবিষ্কারক ধর্মনিরঞ্জনের উপাসকগণ। পরবর্তীকালে এই ওঁকার ধ্বনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও নাথধর্ম কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং এই শূন্যের প্রতীক ওঁ পঞ্চমবেদরূপে শূন্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—"সামজজু ঋক অথর্ববেদ। ওঁকার লইয়া ধর্মর পঞ্চমবেদ ॥"

নিরঞ্জনের হাই হইতে উল্লুক নামক পক্ষীর সৃষ্টি হইলে তাহাকে প্রভু বাহনরূপে গ্রহণ করিলেন ও ধ্যানমগ্ন হইলেন। তিনি উল্লুককে নিজ মুখামৃতদানে সতেজ করিলেন বটে, কিন্তু উল্লুক তাঁহার ভর সহ্য করিতে পারিলেন না, কারণ উল্লুককে তিনি যে মুখামৃতদান করেন, তাহার কিছু অংশ মুখের বাহিরে পড়িয়া চারিদিকে জলরূপে পরিণত হইল। উল্লুকের বীরপাক হইতে একটি হংসের এবং নিরঞ্জনের পদ্মহস্তস্পর্শে জল হইতে একটি কূর্মের আবির্ভাব ঘটিল। এই উভয় প্রকার বাহনও যখন প্রভুর ভর বহনে অসমর্থ, তখন উল্লুকের পরামর্শমত নিরঞ্জন কর্তৃক কণপৈতা নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা হইতে সহস্রফণাযুক্ত বাসুকিনাগের সৃষ্টি হইল। বাসুকির আহারের প্রয়োজন হইল এবং পুনরায় উল্লুকের পরামর্শমত জলমধ্যে কুণ্ডল নিক্ষিপ্ত হইলে ভেকের সৃষ্টি হইল এবং বাসুকি তাহাদের আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। বাসুকির পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া নিরঞ্জন জলের মধ্যে স্থিতিশীল জগৎ সৃষ্টি করার অভিলাষে গলদেশের এক কণিকা ময়লা বাসুকির মস্তকে স্থাপন করিলেন। এই কণিকা পরিমান ময়লা হইতে বাসুকির মস্তকোপরি বসুমতীর সৃষ্টি হইল—ইহাই বর্তমান পৃথিবীর আদিরূপ—

"চৌদ্দযুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্ধশ্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই" ॥২৬
"বদনের নাল দিলেন উল্লুকের মুখে ॥
কিছু সংহারিল কিছু শূন্যে হইল স্থিতি।
পরভু বিম্বুকে জল বুইল আচম্বিতি ॥"৫০

নীরেতে কাআ নাম নিরঞ্জন।
মহাতেজে নিরমল ভইল জল ভাসে দুই জন” ৫১
“উল্লুকের বীরপাক খসিয়া পড়িল।
জনমিল পরমহংস জলেত ভাসিল” ॥৫৪
“প্রলঅ হইলাক জল বড় বলবান।
পদ্মহস্ত দিলা জলে স্বরূপ নারাণ ॥৭১
পদ্মহস্ত দিয়া পরভু জলে থির থির।
পদ্মহস্তে জনমিল জে কূর্মশরীর ॥”৭২
“ছিড়িআ ফেলেন্ত জলে কণক পৈতা।
জনমিল বাসুকিরাজ সহস্রেক মাথা ॥”৯৪
“কাণের কুণ্ডল জলে ফেলিলন্ত তখন ॥৯৮
ফেলাইয়া দিল জলে হীরে জনম করি।
জনমিল ভেক তার হইল চাইর ভরি ॥”৯৯
“সেই অঙ্গমলা দিল বাসুকির মাথে।
ছিষ্টির সাজন প্রভু কৈলা হেনমতে ॥১০৮
বাসুকির মাথে পরভু রাখিল বসুমতী।
নঅদীপ বসুমতী রাখিল খিআতি ॥”১০৯

বাসুকির মস্তকস্থিত বসুমতীকে নঅদীপ আখ্যাতে ভূষিত করিয়া নিরঞ্জন প্রভু ও উল্লুক পৃথিবীর উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ভ্রমণ রত হইলেন। ইতিমধ্যে নিরঞ্জনের ঘর্ম হইতে আদ্যাশক্তির উৎপত্তি হইল এবং আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া উভয়ে তপস্যার্থ বল্লুকানদীর তীরে গমন করিলেন। এই দিকে আদ্যাশক্তির যৌবনের প্রভাবে কামদেবের সৃষ্টি হয় এবং কামদেবের প্রভাবে নিরঞ্জন ও উল্লুক উভয়ের তপস্যাভঙ্গ হওয়াতে তাঁহারা উভয়ে গৃহগমন করেন, ইতিমধ্যে কামদেবকে তাঁহারা মৃত্তিকার পাত্রে কালকূট বিষসহ পুরিয়া বিষমধু তৈয়ার করিলেন। গৃহে ফিরিয়া তাঁহারা যখন আদ্যাশক্তিকে পূর্ণযৌবনাবস্থায় দেখিলেন, তখন আবার তাঁহারা আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া পাত্র অন্বেষণে যাত্রা করেন।

যাইবার সময় তাঁহারা গৃহে 'বিষমধু' রাখিয়া গেলেন এবং আদ্যাশক্তিকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ঐ 'বিষমধু' খাইলে মৃত্যু হইবে। আদ্যাশক্তি যৌবনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের মৃত্যু ঘটাইবে বলিয়া বিষমধু পান করিলেন, কিন্তু উহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না, তৎপরিবর্তে গর্ভোৎপন্ন হইল। এই গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জন্মিল বটে, কিন্তু গর্ভ হইতে বাহির হওয়ার কোন পথ না পাইয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া বাহির হইলেন, বিষ্ণু নাভিচ্ছেদ করিয়া বাহির হইলেন এবং যোনিদেশ ছেদন করিয়া বাহির হইলেন শিব। এইবার তিন ভাই একত্রিত হইয়া বল্লুকাতীরে তপস্যা করিবে বলিয়া গমন করিলেন। তাহারা তিন ভাই তপস্যায় বসিলে নিরঞ্জন তাঁহাদের পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিজে দুর্গন্ধযুক্ত শবরূপে প্রথম ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে ব্রহ্মা তাঁহার ছলনা ধরিতে পারিলেন না. গলিত শবের দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া জলের আঘাতে সরাইয়া দিলেন। বিষ্ণুর নিকট গমন করিলে বিষ্ণুও তাহাই করিলেন। এইবার শিব যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলে শিব তাঁহার ছলনা ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুর্গন্ধযুক্ত শবকে কাঁধে তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইহার ফলে শিব দৃষ্টিশক্তি পাইয়া ত্রিলোচন হইলেন অর্থাৎ তৃতীয় নয়ন লাভে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। শিবের প্রার্থনায় নিরঞ্জন দয়াপরবশ হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকেও দৃষ্টিদান করিলেন—শিবের মুখামৃত সিঞ্চনে তাঁহারা উভয়ে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। এইবার উল্লুকের পরামর্শমত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ভার দিলেন। আদ্যাশক্তিকে জগতে যোনিরূপে স্থাপন করিলেন এবং জন্মান্তরে শিব ও আদ্যাশক্তির বিবাহ হইল। এইরূপে জগতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ভিতর দিয়া সৃষ্টি প্রবাহ চলিতে লাগিল। ইহাতে দেখা গেল যে শূন্য হইতে ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়া সৃষ্টি সংঘটিত হইতেছে —স্রষ্টা বলিয়া কোন কাহারও ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয় না—

"পৃথিবী ভরমিঞা দুহে পরিসরম হইঞা।
অর্ধঅঙ্গের ঘাম প্রভু ফেলিল মুছিঞা ॥১২১

তাহে অন্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে।
ঘামেতে জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে ॥"১২২
"সহিতে না পারে গৌরী যৌবনের ভার।
এতদিনে পিতা খুড়ো আইলনা ঘর ॥১৫২
আদ্যাশক্তি বলে মোর কুথা হবে থিত।
কামদেবঠাকুর বলি জনমিল তুরিত ।"১৫৩
"কামদেব মনোহরে যতন করিএ।
মৃত্তিকার ভাণ্ডে মুনি রাখিল লুকাএ ॥১৬৩
মৃত্তিকার ভাণ্ড মুনি ভরপুর করিল।
উল্লূকার কালকূট বিষ উপজিল ॥"১৬৪
"কি দিয়া রাখিয়া গেলে বোলেন্ত পার্বতী।
বিষমধু রাখিলাম বলে জুগপতি ॥"১৭৪
"বিষ খাইএ তেআগিব তনু ভাবেন পার্বতী ॥১৭৮
বিষমধু খেঅণাক বলে নারায়ণ।
বিষমধু খাইলে তুমি তেজিবে জীবন ॥১৭৯
উল্লূক বোলেন্ত পরভু করিনু নিবেদন।
এই গরভে জনমিবে তিন পুরুষ রতন ॥"১৮৫
"গর্ভে থাকি তিন দেব ভাবিতে লাগিল।
বস্তুতেল ভেদ করি বস্তা বাহিরিল ॥
"তাহা দেখিএ বিষ্টু ভাবে মনেমন।
বিষ্টু বাহির হইলেও নাভি করিআ ছেদন ॥১৮৫
সদাশিব বোলে আমি কি বুদ্ধি করিব।
যোনিচ্ছেদ করি আমি বাহির হইব ॥১৮৬
ব্রজনখ দিয়া শিব যোনিচ্ছেদ কৈল।
যোনিদুআর দিয়া শিব বাহির হইল ॥"১৮৭
"শবরূপ হইয়া প্রভু ছলিতে চলিল ॥
দুইচক্ষু অন্ধ বস্তা জোগে বসে আছে।
ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তারে কাছে ॥১৮৯

দুর্গন্ধ পাইআ বম্ভা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঙ্গুলী জল দিআ ভাসাইআ দিল ॥১৯০
তথা হইতে মহাপরভু ভাইসিতে ভাইসিতে।
সবরূপ হআ গেল বিষ্টুর আগুতে ॥১৯১
দুর্গন্ধ পাইএ তবে বিষ্টু মহাবলী।
ভাসাইআ দিলা তারে দিআ তিন অঙ্গুলী ॥১৯২
ভাইসিআ ভাইসিআ পরভু করিলা গমন।
সিবের নিকটে গিয়া ভাসে নারায়ণ ॥১৯৩
দুর্গন্ধ পাইয়া সিব ভাবে মনে মন।
কুথা কার জন্ম নহি মরিল কোন জন ॥১৯৪
ধেআনেত জানিল এহি পরভু নারায়ন।
বুঝিতে তিনজনার মন ভাসিলা সনাতন ॥১৯৫
দুহাতে ধরিআ মড়া তুলিআ লইল।
দুর্গন্ধিত সব লইআ সিব নাচিতে লাগিল ॥১৯৬
পচা গন্ধ মড়া [illegible] আইলা নারায়ন।
চিনিতে নারিল আহ্মার ভাই দুইজন ॥১৯৭
শ্রীধর্ম বোলেন তুহ্মি আহ্মার চিনিলে।
দুই চক্ষু অন্ধ ত্রিলোচন হইলে ॥১৯৮
চক্ষুদান পাইএ সিব আনন্দিত মন।
চরণে ধরিআ সিব করন্তি বচন ॥১৯৯
আর এক নিবেদন করি নারাঅনে।
চক্ষুদান দেহ তুহ্মি ভাই দুই জনে ॥২০০
এত সুনি পরাৎপর বোলে ত্রিলোচন।
তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুই জন ॥২০১
মুখর অমৃত দিআ দুহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইএ দুহার দিব্য চক্ষু হইল ॥২০২
*বম্ভা ছিস্টি করিব জে বিষ্টু করিব পালন।
ত্রিলোচনে দিল তার সংহার কারণ ॥২১২
আদ্যাশক্তি পানে চাইএ কহে মায়াধর।
সুনু সুনু আদ্যা শক্তি আহ্মার উত্তর ॥২১৩

নরলোকর জনম হেতু তুহ্মি দেহ মন ।
তুহ্মা হতে হঅ জেন ছিস্‌টির পত্তন ॥২১৪
আত্যাশক্তি বোলে পরভু সুন মায়াধর ।
কেমন করিব ছিস্‌টি সংসার ভিতর ॥২১৫
অজোনিসম্ভবা ভোগা নাহিক আহ্মার ।
কেমন উপায় করি কহ করতার ॥২১৬
মহাপরভু বোলে সুন আহ্মার বচন ।
জেরূপে করিবে তুমি ছিস্‌টির পত্তন ॥২১৭
জোনিরূপা হএ তুমি সর্বজীবে রবে ।
মানুষ আদি জীবজন্তু গর্ভেত জনমিবে ।২১৮"
"এহি রূপে কর ছিস্‌টি কাহজে তুহ্মারে ।
মহেস করিবে বিভা জন্ম জন্মান্তরে" ॥২২১

ভারতের বেদবেদান্ত উপনিষদ্‌পুরাণদর্শনাদি শাস্ত্রে বহুবিধ সৃষ্টি-প্রণালী রচিত হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই একটি সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টিপ্রবাহ দৃষ্ট হয় না। শূন্যপুরাণে বর্ণিত এই সৃষ্টি প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া এই সৃষ্টিপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এমনকি 'ডারুইন থিওরীর' ভিতর দিয়া বিচার করিলেও এই সৃষ্টিতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায়। সমস্ত প্রকার অস্তিত্ব-বর্জিত মহাশূন্যের ভিতরে প্রথম উৎপত্তি হইল—"অনিল দুইজন" অর্থাৎ বায়ু, ইহার ভিতরে প্রথম সৃষ্টির বিকাশ চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় বিবর্জিত এক অসম্পূর্ণ কায়া নিরঞ্জন। বিশেষরূপে স্মরণীয় এই যে, এই প্রভু নিরঞ্জনও সর্বপ্রথমে সৃষ্টিক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই—ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই পরিণতি সম্পন্ন হইয়াছিল। বহু যুগ-যুগান্তর যাবৎ মহাশূন্য হইতে সৃষ্ট এই নিরঞ্জনকে ধ্যানের ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান নামে কথিত এই সৃষ্টিক্ষমতা লাভ করিতে হইয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত 'শূন্য পুরাণের' মুখবন্ধ হইতে অভিমত—"১ম ধর্মপালের সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের পুনরভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইলেও, ২য় ধর্মপালের সময়ই প্রকৃত প্রস্তাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন, শূন্যবাদই মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র এবং নানা দেবদেবীর উপাসনা এই সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

আমরা শূন্যপুরাণ আলোচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি যে, মহাযান-দিগের শূন্যবাদই শূন্যপুরাণের লক্ষ্য। রামাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"নাহি ছিসৃটি''''শুন্যে করি ভর"। (৭—১৩)

রামাই পণ্ডিতের এই উক্তি কোন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রমূলক নহে, উহা মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শূন্যবাদমূলক। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ২য় ধর্মপালের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল দেবদেবীর প্রচলন ছিল, ঐ সকল দেবদেবীর মূর্তি গৌড়, মগধ ও উৎকল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শূন্য পুরাণেও আমরা এই সকল দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। সাধনমালা, সাধন সমুচ্চয়, সাধন কল্পলতা প্রভৃতি সাধন সম্বন্ধীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও বিবিধ দেবদেবীর সাধনার প্রারম্ভে শূন্য ভাবনা করার বিধান আছে।"

(মুখবন্ধ পৃঃ VII)

ধর্মের প্রতীক হিসাবে 'ওঁকার' শূন্যপুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে—"ওঁকার জঅঙ্কার জঅদেব ধম্ম করতার নির খাএ নিরমান খাএ জোগাএ সদ্ধেশ্বরী অমৃতমুখে বিদি বৈস (কাল) বিদিশাল কেমন ঘরে রামন্তি বাম রামেশ্বর। মচ্ছকুম্ভীর সতেক হাত অগ্নি সতেক হাত জল এতটা জলে স্নান করেন নির্লেপ নৈরাকার। (অথ ধর্মস্থান)।

"যতদূর ধম্মর ওঙ্কার জাঁন। গাএন্তের মহাপাপ দূরত পালান ॥১
শামরজুঝ অথববেদ। ওঁকার লইআ ধম্মর পঞ্চমবেদ ॥
সুন সুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥২
বিসনাথ বিসকম্মা ওঙ্কার পাড়িল।
আমিয়াত বিসকম্মা পরণাম করিল॥" ৩১ (অথ চাষ)

এখানে দেখা যায় যে,—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব নামক চতুর্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ওঁকার ধ্বনি নহে এবং এই ওঁকার ধ্বনির আবিষ্কারক ধর্মনিরঞ্জনের উপাসকগণ—ইহাকে পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও নাথ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই শূন্যের প্রতীক ওঁকারবিষয়ক দর্শনই পঞ্চম-বেদরূপে শূন্যপুরাণে আখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চমবেদ কথিত মন্ত্রাবলীই ধর্মপূজাতে ব্যবহৃত হইত—

"নাটগীতে করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
অমর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদমন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিয়া সে শ্রীধর্ম দুয়ারে॥" (অথ টীকা প্রতিষ্ঠা)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণে শহিদুল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা—"ধর্মপূজা বিধানে দেখিতে পাই যে, ধর্মপূজায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ সূর্য প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার পূজা আছে, ব্রহ্মাণী মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তির পূজা আছে; বিষহরী, বাসুলী মঙ্গলচণ্ডিকা ষষ্ঠী বিশালাক্ষী—এই লৌকিক দেবতাগুলির পূজা আছে। এতদ্ভিন্ন ধর্মপূজায় ক্ষেত্রপাল নবগ্রহ দশদিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা আছে। এই সকল দেবতা আবরণদেবতা, এই সকল পূজা আনুষঙ্গিক। আসল পূজা হইতেছে শ্রীশ্রীধর্ম ভট্টারকের। ধর্ম্মের চারি দুয়ারের চারি দ্বারপাল,—পূর্বদ্বারে মহাকাল, দক্ষিণদ্বারে জঙ্গল (জম্ভরক), পশ্চিমদ্বারে ঝাঝরীক, উত্তরদ্বারে নন্দী। ধর্মের চারি মহাপাত্র—মদন, ডামর সাঞি, কামদেব এবং পড়িহার। তাঁহার চারিকোটাল—সূর্য, হনুমান, চন্দ্র এবং গরুড়। ইঁহারাও পূজা হইতে বঞ্চিত হন না। ধর্ম্মের অন্য নাম নিরঞ্জন। ধর্মপূজা বিধানে তাঁহার ধ্যান—

"ওঁ যস্যান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদি রূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্বসংকল্পহীনং
তত্রৈকোঽপি নিরঞ্জনোঽমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ॥"

আদিঅন্তহীন, দেহেন্দ্রিয়রূপবর্ণহীন, প্রাকৃতিক বস্তু, গ্রহনক্ষত্রাদি ও দিগ্‌বিদিগ্‌শূন্য, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্বের চিহ্ন-বিচ্যুত এবং পাপপুণ্য-নির্বাণাদিশূন্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার অস্তিত্ব না থাকাতে ধর্মনিরঞ্জন শূন্যময়।

ভারতীয় জীবন সাধনার প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য। নাথসাধকশ্রেণীর দর্শনে যে সকল সাধনার পদ্ধতি রচিত হইয়াছে, তাহা এই বৈরাগ্যের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া মানবজীবনের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি-বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বচিন্তার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে।

"তান্ত্রিক বৌদ্ধদের ভগবান বুদ্ধ বা বজ্রসত্ত্বই (বজ্র বা হেরুক) সমস্ত গুহ্য যোগশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক। নাথদের বিশ্বাস আদিনাথই প্রথম নাথ এবং সমস্ত গুহ্য যোগশাস্ত্রের তিনিই স্রষ্টা। তিনি হিন্দুদের শিব, বৌদ্ধদের বজ্রসত্ত্ব। নাথধর্মের তত্ত্ব বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, ইহাকে সর্বভারতীয় সিদ্ধাচার্যগণের অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" "আবার তত্ত্ব নিয়া বিচার করিলে দেখা যায় বৌদ্ধদের শূন্যতাকরুণা ও সহজিয়াদের প্রজ্ঞা ও উপায় নাথসাহিত্যের হরগৌরী। নাগার্জুনমতে শূন্য চারি প্রকার—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য। নাথমতে শূন্য তিন প্রকার—আদি শূন্য, মধ্যশূন্য, ও অন্তঃশূন্য। অর্থাৎ প্রণবের তিন অবস্থা—সূক্ষ্মত্ব, কারণত্ব, নিরঞ্জনত্ব। নাথ সাধকগণ শূন্য মূর্তিতেই পরমাত্মার ধ্যান ও আরাধনা করিয়াছেন।"

"নাথধর্ম নিরীশ্বরবাদীধর্ম—শূন্য নিরঞ্জনের উপাসনাই এই ধর্মের নীতি এবং যোগাবলম্বনে সর্বশূন্যতা লাভই ছিল কাম্যবস্তু। চন্দ্রসূর্য তথা প্রাণঅপান বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাণায়ামাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য কৌশলাত্মক যৌগিকসাধন পন্থা অবলম্বনে ধ্যানযোগে সমাধিই নাথ-ধর্মের কাম্য এবং 'হুঙ্কার' এবং 'ওঙ্কার' ইহাদের পরমতত্ত্ব, মহাতন্ত্র ও মহাজ্ঞান।"

(বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি—আশাদাস, পৃঃ ২১, ৪৯, ৬০)

"প্রাচীনকাল হইতেই ইহার (যোগসাধনার) দুইটি ধারা অনুসরণ করা হইতেছে, একটি পাতঞ্জলনির্দিষ্ট অভিজাত ধারা, আর একটি লৌকিক ধারা। লৌকিক ধারাটিই উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কালক্রমে বিভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার নাথধর্ম ইহাদেরই অন্যতম মত।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্রের গান' —ভূমিকা)।

রাজমোহন নাথ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় নাথগ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'হাড়মালা' নামে একখানা পুস্তকে পাতঞ্জলযোগের যম ও নিয়ম (যাহা শুধু মন ও দেহের বিশুদ্ধিকরণের উপায় মাত্র) বাদ দিয়া আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই ছয়টি অঙ্গকেই যোগসাধনারূপে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেহস্থ নাড়ীগুলিরও একটি সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন এবং শূন্যকেই ধ্যেয় বস্তুরূপে বর্ণনা দিয়াছেন—

"শূন্যে বামপদ নিয়া দৃঢ় কর মতি। বামপদের উপর দক্ষিণ পদ দিবে। তাহার উপর দিয়া বামপদ থুইবে ॥১৫৩

দুইপদ পৃষ্ঠে দিয়া ধরিবে পদাঙ্গুলি। এতেকে ইহার নাম আসন কমলী। ভ্রূমধ্যে ধ্যান করি রহিবে সাবহিত। পরম শূন্যেতে গিয়া নিয়োজিবে চিত ॥"১৫৪ ॥ "অধোমুখে হইয়া বায়ু পুরিবে শরীরে। বামনাসা পুরি বায়ু করিবে কুম্ভক। মূলাধার আকুঞ্চিয়া চালিবে পবন দক্ষিণ নাসাতে বায়ু করিবে রেচন ॥"১৫৮

"একবার প্রাণায়াম করিয়া বায়ু পুরে,
চারি কর পুরি বায়ু কুম্ভক যদি করে ॥১৫৯
দুইবার বায়ুদেবী করিবে রেচন/এইরূপে বায়ু দেবী করিবে সেবন।"

"নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবে সাবহিত/পরম শূন্যেতে নিয়া নিয়োজিবে চিত। মূলেত নিখিল ধ্যান করিবে স্থিরমতি/প্রত্যাহার ইহার নাম শুনহ পার্বতী ॥"১৬৩

ধ্যান বিবরণ কথা কহি শুন তুমি ॥১৬৪ আসন করিয়া মেরু

করিবেক স্থির/নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবে যোগীবীর। নাভিমধ্যে ব্রহ্ম তাঁহাকে ধেয়াই/সবার উপরে শক্তি আছে জ্যোতির্ময়॥"১৬৫

"শক্তি ধ্যান করিয়া শূন্যেতে দিবে মন
শূন্যের উপর মহাশূন্য করিবেক ধ্যান।
ধেয়াইতে ধেয়াইতে যদি শূন্য হয় মতি
ধ্যান যোগে সিদ্ধি হইয়া হইব মুকতি॥"১৬৮

মেরুদণ্ডস্থিত ৩০ খানা অস্থিগ্রন্থি ভেদ করিয়া সাধনার গতি বর্ণনা করা হইতেছে—"দুই বায়ু মিলি যদি হয় একাকার।
হংস বায়ু হয় তবে হংসের আকার॥"১৭১

"মূলাধার ভেদি হংস করিল গমন
মেরুদণ্ড গ্রন্থির পাইল দরশন।"
মেরুদণ্ড ত্রিশ গ্রন্থি আছে ক্রমে ক্রমে।
একে একে গ্রন্থি ভেদি দিনে দিনে॥১৭৫

"একগ্রন্থি ভেদিলে দেহের শোষে নীর॥১৭৬ তৃতীয়েতে গেলে হংস ক্ষুধা হয় দূর। চতুর্থেতে গেলে ক্ষুধা হয়ত প্রচুর। পঞ্চমেতে গেলে হংস ব্রহ্মাকে দেখায়। ষষ্ঠেতে গেলে হংস হয় জ্যোতির্ময়॥১৭৭ সপ্তমেতে গেলে চিরকাল জীয়ে। অষ্টমেতে গেলে হংস ব্রহ্মার লাগ পায়॥"১৭৮ দ্বারীরূপ ধবি ব্রহ্মা আগে ধ্যান করি।"

"এইরূপে হংসরাজ ফিরয়ে শরীরে।
নবমে আলগ হয় শূন্যের উপরে॥১৮১
দশমেতে শূন্যে হংস অল্পে অল্পে চলে।
একাদশে মন তার না হয় চঞ্চলে॥
দ্বাদশে কম্পিত নহে যোগীর মন।
ত্রয়োদশে যোগিনীরে পূজে সর্বজন॥১৮২
চতুর্দশ গেলে হংস ভেদে দিনকর।
পঞ্চদশে গেলে হংস দেখে দামোদর॥"
"ষোড়শ গ্রন্থি ভেদিলে পায় সর্বনিধি।
অষ্টাদশ গেলে হয় অনাদির সিদ্ধি॥

উনবিংশে গেলে হয় শীঘ্র মুকুতি।
গ্রন্থভেদের কথা শুনহ পার্বতী ॥১৮৮
দ্বাবিংশ ভেদিলে হংস নানারূপ ধরে।
ত্রয়বিংশতি ভেদিলে হংস ভুবন সঞ্চরে ॥
চতুর্বিংশতি ভেদিলে হংস হয় জ্যোতির্ময়।
পঞ্চবিংশতি ভেদিলে হংস ব্রহ্মপদের নির্ণয় ॥১৮৯
ষড়বিংশতি ভেদিলে নাই যমলোকের ভয়।
সপ্তবিংশতি ভেদিলে মহলোকে যায় ॥
অষ্টাবিংশতি ভেদিলে তপলোকে যায়।
উনত্রিংশ ভেদিলে শক্তিলোক পায় ॥১৯০
ত্রিংশগ্রন্থি ভেদিলে হংস দেখয়ে শঙ্কর।
ত্রিশগ্রন্থি ভেদের দেবী কহিনু ত্রিশফল ॥"

শূন্যের বর্ণনা—"শূন্যরূপে নিরাকার প্রণব তার নাম।
সদায়ে পররূপ শূন্যরূপ তার।
অনন্ত রূপ তার শূন্য আকার ॥
তিলমাঝে তৈল যে ঘৃত দুগ্ধ মাঝে।
পুষ্পমাঝে গন্ধ যে স্বাদ ফল মাঝে ॥
কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেন আকাশেতে বাই।
নিরঞ্জন রূপ দেবী জান সর্বদাই ॥
দেহের মধ্যেতে থাকে না নাশয় শরীরে।
মনের মধ্যেতে থাকে মন অগোচরে ॥২০৬
নাসাঅগ্রে ধ্যান করি শূন্যে অধিষ্ঠান।
আদিঅন্তে মধ্যে শূন্য করিবেক ধ্যান ॥
দৃষ্টিশূন্য মনশূন্য বুদ্ধিশূন্য তার।
সর্বশূন্যময় প্রভু শূন্য আকার ॥২০৭

এখানে একটি উপাখ্যানাকারে ষট্‌চক্রভেদ ও সহস্রার শূন্যে সাধকের সিদ্ধিলাভের বিবরণ আছে। প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণ ও

অপানবায়ুদ্বয় সুষুম্নাতে প্রবেশ করে এবং কুম্ভক ও ধ্যানের সাহায্যে মূলাধার চক্র হইতে হংসরূপে পরিণত হইয়া গ্রন্থিভেদ করিতে থাকে। অষ্টম গ্রন্থিভেদ করিয়া মণিপুরচক্রে উপস্থিত হয় এবং উক্ত চক্রস্থিত ব্রহ্মা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে দেবী ছিন্নমস্তার সাহায্যে যুদ্ধে ব্রহ্মাকে পরাস্ত করিয়া অনাহত নাদাবলম্বনে দশমগ্রন্থি ভেদ করে। এইবার হংসের শূন্যত্ব প্রাপ্তি ঘটে এবং অনাহত চক্র হইতে পঞ্চদশগ্রন্থি ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ চক্রে বিষ্ণুর দর্শন লাভ করে। এইবার হরির সহিত সংগ্রামরত হংস উনবিংশ গ্রন্থিভেদে মহলোক ও তপলোক দর্শনের পর আজ্ঞাচক্র ভেদ করে এবং শিবের দর্শন পায়। শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ত্রিংশ গ্রন্থিভেদে সহস্রারে শূন্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই পুস্তকে আরও একটি নূতন তত্ত্ব দেখা যায়—বাহাত্তর হাজার নাড়ী মানবদেহে বিদ্যমান, তাহার মধ্যে চৌষট্টিটি নাড়ীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার ভিতর পনরটি নাড়ীকে যোগসাধনাতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গুদ, লিঙ্গ ও কলিকাকে 'ত্রিকুল' নাম দেওয়া হইয়াছে—ইহার মধ্যে সূর্য ও চন্দ্রের বসতি। পনরটি নাড়ী—ইঙ্গিলা, পিঙ্গিলা, সুষুম্না, চিত্রা, হস্তিনী, বারুণী, গান্ধারী, পূষ্যা, সরস্বতী, অলম্বুসা, যশস্বিনী, কুহু, তপস্বিনী, বিসঙ্করী ও শক্তিনী। এতদ্ব্যতীত মানবদেহে দশপ্রকার বায়ু বর্তমান আছে—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, ধনঞ্জয়, দেবদত্ত ও কৃকর। এই সকল নাড়ী ও বায়ু দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং এই সকল নাড়ী ও বায়ুকে জয় করিতে না পারিলে যোগসাধনা সফল হইবে না। এই সকল নাড়ীচক্র -ভেদ, বায়ুচক্রভেদ ও পূর্বোক্ত নবচক্রভেদ নাথযোগীদের যোগলব্ধ প্রণালী। এই সকল সাধনা ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞাত ছিল এবং তাঁহারা যোগীদের সঙ্গে শত্রুতাসাধনে রত ছিলেন—"নাড়ীভেদ রচিলেক দ্বিজ শত্রুগণ"। ৫৪

"বায়ুভেদ রচিলেন দ্বিজশত্রুগণ।" ৬১

নাড়ীবিবরণ— "সুষুম্না নাড়ী আছে শরীর বিস্তারি।
সুষুম্নার বামভাগে বৈসয়ে ইঙ্গিলা।

তাহার দক্ষিণভাগে বৈসয়ে পিঙ্গিলা।
ডানবামে গজপতি করে দুই নাড়ী।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আছে সুষুম্নারে বেড়ী।
মূলাধার আদি করি নাসিকার দ্বারা।
বিস্তারিয়া আছে তাহা কুটিল আকার ॥৫০
অব্যক্ত চিত্রানাড়ী সুষুম্না ভিতরে।
পঞ্চবর্ণ জ্যোতির্ময় বিদিত সংসারে ॥
সরস্বতী নামে নাড়ী বৈসে জিহ্বামূলে।
লিঙ্গমূলে কুহুনাড়ী বৈসে কুতুহলে ॥৫১
গান্ধারী নামেতে নাড়ী বাম চক্রে স্থিতি।
দক্ষিণ লোচনে নাড়ী পূষ্মার বসতি ॥
শঙ্খিনী নামেতে নাড়ী বৈসে বাম কানে।
যশস্বিনী নামে নাড়ী দক্ষিণ শ্রবণে ॥৫২
বারুণী নামেতে নাড়ী বাম হাতে স্থিতি।
অলম্বুষা নামে নাড়ী দক্ষিণে বসতি ॥
বিসন্ধরী নামে নাড়ী উদরের কোলে।
যোগাভ্যাস বায়ু স্থির করায় তাহারে ॥"৫৩

তারপর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বৈসন্ধরী (বিশুদ্ধ) ও আগ্য (আজ্ঞা)—এই ছয়টি চক্রের ভিতরে বিভিন্ন দেবদেবীর অধিষ্ঠান বর্ণনা করিয়া সহস্রার নামক শূন্যদেশে সাধকের সাধনার পরিণতি শূন্যত্বলাভ হইবে—ইহাই সাধনার মূল বক্তব্য।

নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত 'গোপীচন্দ্রের গান' নামক গ্রন্থে একটি অপূর্ব তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে। যোগ সাধনার পথে প্রেমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তাহাই এই কাব্যে সগৌরবে ঘোষিত হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা যায় যে. যোগতপস্যার দ্বারা কোনও মহাপুরুষ কামকে জয় করিতে পারেন নাই—এমনকি মহাতপা বিশ্বামিত্র পর্যন্ত অপ্সরা

মেনকার কাম কৌশলের কাছে পরাজিত হইয়াছেন। প্রেমের দুইটি ধারা—নিজকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া প্রেমকেই পরবর্তী যুগে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই কাব্য সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রেম কখনও পরকীয়া নহে—প্রেম শুধু প্রেম। কি সংসার জীবনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে,—সর্বত্রই প্রেমের ভিতর দিয়া যে আনন্দ, যে শান্তি পাওয়া যায়, তাহা মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক, উভয় জীবনেই উর্ধ্বগমনের পক্ষে প্রবল সহায়ক। কিন্তু নাথ সিদ্ধাদের মতে নারী মূর্তিমতী অশুদ্ধ মায়া, মানুষকে নারী কামাচারী করিয়া ধ্বংস ও মৃত্যুর মুখে টানিয়া লয়—

"দিবাতে যে বাঘিনী জগৎ মোহিনীরে
রাত্রি হৈলে সর্ব অঙ্গ শোষে।
হরি নিল দুগ্ধ ফুটি বাঘিনী আউটেরে
বিড়ালে বসিয়া প্রতি আশে॥

(গোর্খবিজয়—পঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ১২৩)

কিন্তু রাজা গোপীচন্দ্রের জীবনে এই বাঘিনী নারীর প্রেম ইন্দ্রিয়মনে এবং নারীর প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষাতে অমৃতবর্ষী হইয়াছিল। তাই বোধ হয় আমাদের দেশে মাতাপিতাই পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূর মিলন ঘটাইয়া দেয় এবং গোপীচন্দ্রও সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার পূর্বে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"এত যদি মাতা জরু প্রাণের বৈরী।
তবে কেন বিবাহ দিলেন একশত সুন্দরী॥"

(গোপীচন্দ্রের গান—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৫)

দেখা যায় যে, গোপীচন্দ্র ও অদুনা-পদুনার ভিতরে এক অপূর্ব অমৃতময় প্রেমের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমন কি অদুনা ও পদুনার ভিতরেও সতীন-সুলভ হিংসাদ্বেষ ছিল না এবং প্রেমের পথে গোপীচন্দ্র নাথধর্মের নিরীশ্বরবাদ বা শূন্যবাদের তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মাতা ও পুত্রের আলোচনার ভিতরে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

গোপীচন্দ্র—"চারিচকারি পুকুরখানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিক্ষের বোটা আমি কোন বিরিক্ষের ফল ॥৩৬৫
কোথা আছি কোথা বারি মা কোথা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিদ্রা যাই ॥
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে মা নড়ে পবন পানি।
সপ্তহাজার আনল নড়ে মা নিনড় কোন খানি ॥
কোনঠে হইল গয়াগঙ্গা কোনঠে বানারসী।"৩৭০

ময়নামতী—"ওরে যাদু ধন চারচকারি পুকুরখানি মধ্যে ঝলমল।
মন বিরিক্ষের বোটা তুই তন বিরিক্ষের ফল ॥
গাছের নাম মনোহর ফলের নাম রসিয়া ॥৩৯৫
গাছের ফল গাছে পাকে বোটা পড়ে খসিয়া।
কাটিলে বাঁচে গাছ না কাটিলে মরে।
তুই বিরিক্ষের একটি ফল জননী সে ধরে ॥
হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বারাণসী।
মুখ তোর জপতপ মস্তকে তুলসী ॥ ৪০৪
মনে আদ্ধ তনে খাও আত্মায় বসিয়া খাও।
জীতালয়ে শুয়ে থাক মহতী নিদ্রা যাও।
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবনখানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপালখানি ॥
বিনা বাতাসে যাদু চোখের পাতা নড়ে।" ৪০৬

দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ এবং দেহগত সংযমের ভিতর দিয়া শূন্যত্বের সাধনাই নাথধর্মের মূলতত্ত্ব। ভোগ বিলাসে রত তাঁহার স্বামীর মত পুত্র গোপীচন্দ্রও ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া অকালমৃত্যুর কবলে পড়িবে—ইহাই ছিল মাতা ময়নামতীর আশঙ্কা। তাই দেহ-সংযমের সাধনার জন্য পুত্রকে সন্ন্যাসে প্রেরণ করেন। কিন্তু যোগের চেয়ে প্রেম সংযম-সাধনার শ্রেয়তর পথ। রাজা গোপীচন্দ্র প্রেমের ভিতর দিয়া যে রসের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কোনপ্রকার প্রলোভন বা আনন্দই

তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়সংযম গোপীচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন কোন অরণ্য বা পর্বতে তপস্যার ভিতর দিয়া নহে—প্রেমের পথে। রাজা গোপীচন্দ্রকে গুরু হাড়িপা হীরানটীর নিকট বিক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য তাঁহার সংযম পরীক্ষা। হীরানটী রাজার চেহারা দেখিয়া তাঁহার সহিত কামনা চরিতার্থ করিতে চাহেন—

"যত্তকে ধর্মী রাজা সরিসরি যায়,
অভাগিয়া হীরানটী গাও ঘেসিয়া যায়,
মদনের জ্বালা নটী সহিতে না পারিল
রাজার সহিত নটী কৌতুক জুড়িল॥
গোটা চারি কথা রাজা নটীকে বলিতে লাগিল।
কি তুমি নটী নেহালাও তোমার পাজায় পাজায় চুল॥ ১৪১৫
দুই স্তন যেন তোর ধুতুরার ফুল।
উপরত দেখা যায় যেন শান্ত মহাকালের জল।
তলত ভাঙ্গিয়া দেখ ছাই আর আঙ্গার॥
হীরানটী বলে—ওগো মহারাজ
নারী হইয়া ফল দেই তোমাক পুরুষ যাচিয়া। ১৫০০
এই ফল কেন ফেলে দেন পায় লুঠিয়া॥"
"যেমন অতুনা পতুনা রানীক ছাড়ি আইছি নাট মন্দির ঘরে।
তার বান্দির পায়ের রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে॥"১৫১০
"মদনের জ্বালা নটী সহিবার না পারিল।
রাজা হস্ত তুলি নটী হিদে তুলি দিল।
মাও মাও করিয়া স্তন খাইতে লাগিল।" ১৫১৫

রাজা গোপীচন্দ্র স্বীয় স্ত্রীদ্বয় অতুনা ও পতুনার সহিত স্বকীয়া প্রেমের ভিতর দিয়া যে সংযম লাভ করিয়াছিলেন, সে সংযম তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল,—"পরস্ত্রীষু মাতৃবৎ"। এই সংযম যখন মানুষ লাভ করে তখন সহজেই সে সাধনায় সাফল্য লাভ করে—সহস্রার শূন্যত্বে পরিণতি লাভ করে—

"দেহের মধ্যে নিরঞ্জন ভুলে ফিরে অকারণ
সকল দেবতা বসে শরীর ভিতরে।
উত্তম আত্মা মহাদেব চিনিতে না পারে কে
ভিন্ন দেব পূজেত বর্বরে॥
দ্বিতীয়ে বসে হরি উপরেতে ব্রহ্মপুরী
ব্রহ্মলোক সব বৈসে তাথ॥
উদয়পুরে মুনিগণ তাতে বৈসে নারায়ণ
শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ॥"

বৈষ্ণবগণ পরকীয়া প্রেমের ভিতর দিয়া যে সাধনার রীতি বলেন, সেই সাধনা স্বকীয়া বিবাহিতা পত্নীকে নিয়াও করা যাইতে পারে—ইহার প্রমাণ গোপীচন্দ্র ও অদুনা-পদুনার প্রেমের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।

পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খ বিজয়'-এর অন্তর্গত 'যোগচিন্তামণি' নামক পুস্তকের ভিতরে ষট্‌চক্র ভেদ হওয়ার পরে সহস্রার শূন্যকে আরও তিনটি স্তর কল্পনা করিয়া নবচক্র নামক একটি নূতন তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে—

"মূলাধার—অধ এক পদ্ম সহস্রার,
সূর্যের আশ্রয় স্থান রক্তবর্ণ তার।
তদুপরি মূলাধার উর্ধ্বে স্বাধিষ্ঠান,
কতদূর মণিপুর চক্রমূর্তিমান।
অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য নিরমল।
সর্ব-উর্ধ্ব-শূন্যে চক্রদশ শতদল।
তাহার উপরে অদ্ভুত পদ্ম আছে,
এই নবচক্রবোধ যে জন জান্যাছে।
সেই সে পরমহংস সকলেরপর।
ধরাধামে বিরাজে দ্বিতীয় মহেশ্বর॥" (পৃঃ ২১৮)

আজ্ঞাচক্রস্থিত ওঁকারকে শূন্য এবং তৎপরবর্তী সহস্রারকে তিনটি

স্তর—অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য নাম দিয়া নবচক্ররূপ তত্ত্ব প্রকাশিত :

"বিসর্গের অধস্থিতি শূন্যেতে বিহরে,
দ্বিবিন্দু বিসর্গ অধ দশ শতদল।
পূর্ণ পূর্ণেন্দু শুভ্র অতিনিরমল॥" (পৃঃ ২২৭)

"তদন্তে শূন্যাকার সাকার রহিত।
দেবগণ গুপ্তরূপে নিত্য করে সেবা,
তথাপি না জানে স্থান কিবা দেবীদেবা।" (পৃঃ ২২৮)

"সবানী কলাপূর্ণ সূক্ষ্মময় স্থান,
শিবপদ সেই প্রসিদ্ধ আখ্যান।
শূন্যরূপী সর্বআত্মা সকলের সার,
বিনাশে অজ্ঞান মোহ ঘোর অন্ধকার।" (পৃঃ ২২৮)

'গোর্খবিজয়ে' দেখা যায় যে, মীননাথ যোগভ্রষ্ট গুরুকে যোগশক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উল্টা সাধনার বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন—

"উলটিয়া যোগ কর আপনাকে স্থির কর
নিজমন্ত্র করহ স্মরণ।
উলটি ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা
খালেতে জল ভরিতে বারণ॥" (পৃঃ ৭২)

মানব দেহে 'হং' এবং 'সঃ' এই দুইটি অক্ষর সংযুক্ত হইয়া হংস নামে বিদ্যমান—ইহাই "সোঽহং" তত্ত্ব। শূন্যগৃহের বিকল্পময়ভূমি এই কায়াজগৎ এবং এই বহির্জগৎ সম্বন্ধে শূন্যত্ব চিন্তাই সাধককে মুক্তির পথে চালনা করে।

পাতঞ্জল যোগের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া নাথসাধনা দেহপিণ্ডের ভিতর দিয়া বহুপ্রকার যৌগিকতত্ত্বের আবিষ্কারে যোগের চরম পরিণতি সৃষ্টি করার জন্যই বোধ হয় নাথদিগকে যোগী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নাথমতে সাধক যখন চিরচঞ্চল চিত্তকে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ—শিখার ন্যায় শূন্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম, তখন মহাশূন্যের ওঁকার ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়—'ওঁ' হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগে বাংলাদেশে যখন দুইটি পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় সংস্কৃতি চলিতেছিল—একটি ব্রাহ্মণ্যধারা ও অপরটি অব্রাহ্মণ্যধারা। এবং মুসলমানদের দ্বারা উভয়পক্ষই নির্যাতিত হইতেছিল, তখন তাহাদের ভিতরে চেতনার সঞ্চার হইল যে, আত্মরক্ষার জন্য পরস্পর মিলিত হইতে হইবে। তাই বৌদ্ধ প্রবর্তিত ও নাথধর্মসমর্থিত শূন্যবাদকে বজায় রাখিয়া তাহার ভিতরে প্রচলিত দেবদেবীর স্তব সহকারে 'মঙ্গল কাব্য' নামক একপ্রকার ধর্মীয় পুস্তক রচিত হইল। "মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।"১

শ্রীঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মপুরাণে' সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণনাতে 'শূন্যপুরাণে' যেরূপ শূন্য-প্রভু নিরঞ্জন উল্লুকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই গৃহীত হইয়াছে—

"এক ব্রহ্মা সনাতন　　　নিরাকার নিরঞ্জন
ত্রিগুণ নিদান শূন্যভরে।"৮৫
"ভ্রমণ বাসনাচিতে　　　উপনীত আচম্বিতে
নাসাপথে জন্মিল উল্লুক।"৮৯

শ্রীমাণিক গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্যে শূন্যবাদকে অবলম্বন করিয়া শূণ্য-প্রভু নিরঞ্জনের সৃষ্টি-প্রণালীর ভিতরে বিষ্ণুর দশ অবতাররূপে দশটি রূপের বর্ণনা আছে—

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩।

"নাহি আদি মধ্য অন্ত   করপদকায়প্রাপ্ত
শোকমৃত্যু জরামৃত্যু ভয়।
উলূক উদরে ভর   শূন্য গতি নিরন্তর
শূন্যরূপী সদানন্দময়।"১৪

"নিরাকার সআকার   হলে দশ অবতার
আপে হতে আপনি অভেদ।"২৮

ময়ূরভট্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ও তৎকালীন উচ্চজাতিগণ কেহই বাংলা ভাষাতে রচিত ধর্মগ্রন্থকে এবং লৌকিক পূজাপার্বনাদিকে মানিয়া লইতে চাহিবেন না। সুতরাং তিনিই প্রথম শূন্যবাদমূলক ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতির ইতিহাস সংস্কৃত ভাষাতে রচনা করেন এবং রামাই পণ্ডিতকে ব্রাহ্মণবংশজাত বলিয়া প্রচার করেন। তিনিও শূন্যবাদকে বজায় রাখিয়া পুরাণোক্ত দেবতাদের তৎরচিত 'শ্রীধর্মপুরাণে' স্থান দিলেন। তিনি একদিকে শূন্যবাদের সমর্থন করিয়া, অপরদিকে দেবতাবাদকে জীবিত করিতে চাহিলেন এবং দশ অবতার গ্রহণকারী বিষ্ণু বলিয়া শূন্য-প্রভু নিরঞ্জনকে বর্ণনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কোন প্রকার আকৃতি না দিয়া সংস্কৃত ভাষাতে শুধু জ্যোতির্ময় বলিয়া বর্ণনা করিলেন—

"নমো নিরঞ্জন ধর্ম সর্বসাক্ষী সনাতন।
জ্যোতির্ময় জগদ্বীজ প্রসীদ পরমেশ্বর॥" (সূচনা)

"নম নিরঞ্জন   ব্রহ্ম সনাতন
পরমেশ পরাৎপর।
অচিন্ত্য অব্যয়   অচ্যুত অক্ষয়
স্বয়ংজাত সুরেশ্বর॥
ব্রহ্ম বিষ্ণুভব   দেবদেবী সব
তব অংশে উপাদান।
মৎস্যাদি আকার   দশ অবতার
মূর্তিভেদে ভগবান।" (পৃঃ ২৭)

এমনকি ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি মূর্তিরও সূচনা করিয়াছেন—

"পুরা কূর্মাকৃতির্বিষ্ণুর্দেবেভ্যো দত্তবান্ বরম্।
ততঃ কূর্মশ্চ নাগশ্চ পূজ্যতে সর্বজাতিঃ॥" (পৃঃ ১॥)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মঠাকুরের এই কূর্মমূর্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ বলিয়াছেন যে, এই কূর্মমূর্তি সূর্যদেবতা তথা রাজশক্তির প্রতীক, আবার কেহ ইহাকে কোন কূর্মপূজক অনার্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু এই কূর্মমূর্তির তত্ত্বালোচনায় ময়ূরভট্ট লিখিত স্তোত্রে দেখা যায় যে, যেহেতু বিষ্ণু কূর্মের আকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেহেতু ধর্মের প্রতীক কূর্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শূন্যরূপী ধর্মঠাকুরের সঙ্কোচনে প্রলয় এবং সম্প্রসারণে সৃষ্টি এবং সাংখ্যের মতে সমস্ত জাগতিক সৃষ্টিতে প্রকৃতি প্রকাশ পায়, আবার প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি শূন্যময়ী প্রকৃতির দেহে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বিলীন হইয়া গেলেও সূক্ষ্মভাবে তাহার অস্তিত্ব থাকে। সাংখ্যদর্শনে আছে যে, মানুষের উপলব্ধির বাহিরে থাকিলেই তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিবেনা—এইরূপ নহে। অতিশয় দূরত্ব, অতিরিক্ত সামীপ্য, ইন্দ্রিয়হীনতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, বলবৎ দ্রব্যের দ্বারা অভিভব, মনের অনবধানতা এবং তুল্যরূপ মিশ্রণের ফলে মানুষের উপলব্ধি না হইলেও উহার অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং পুনরায় উহা সৃষ্টির উৎসে পরিণত হয়।

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্॥ ৯ (সাংখ্যকারিকা)

সুতরাং কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকাতে কার্যরূপ কূর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলীন হওয়া সম্পর্কে কূর্মের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"যথাহিকূর্মস্যাঙ্গানি কূর্মশরীরে নিবিশমানানি তিরোভবন্তি, নিঃসরন্তি চাবির্ভবন্তি, ন তু কূর্মস্তদঙ্গানি উৎপদ্যন্তে, প্রধ্বংসতে বা।" শূন্য-প্রভু নিরঞ্জন বা ধর্মঠাকুরও তদ্রূপ,—তাই তাঁহাকে কূর্মমূর্তিতে কল্পনা করা হইয়াছে।

নাথপন্থী যোগসাধনার গ্রন্থেও কূর্মের সঙ্কোচনের সঙ্গে যৌগিক প্রক্রিয়ার তুলনা করা হইয়াছে—

"কূর্ম যেমন সঙ্কোচ করয়ে শরীর
এইরূপ সঙ্কোচ করিবে যোগীবীর ॥" (হাড়মালা)

এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেও কূর্মের সঙ্কোচন ও প্রসারণকে যোগের প্রতীক-স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। আগমবাগীশ রচিত 'বৃহৎ তন্ত্রসার'-এ (পৃঃ ৫২) কূর্মের আকৃতিকে গ্রহণপূর্বক সাধনার একটি চক্র প্রবর্তন করা হইয়াছে—

"কূর্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কূর্মাজ্জপযজ্ঞকম্।
তস্য যজ্ঞফলং নাস্তি সর্বাননর্থায় কল্পতে ॥"৭৮

এই কূর্মচক্র সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া জপ বা যজ্ঞাদি সাধনাকে মূল্যহীন বলা হইয়াছে, সুতরাং ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্ত্তি পরিকল্পনা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

'শিবমঙ্গল' নামক মঙ্গলকাব্যের ভিতরেও শূন্যবাদমূলক কথা বহু স্থানে পাওয়া যায়—

"না আছিল স্বর্গ মর্ত্য না আছিল পাতাল।
জলমধ্যে ভাসে প্রভু আপনি দয়াল ॥" (মৃগলুব্ধ—দ্বিজ রতিদেব)
"একমাত্র অরূপ বিশেষরূপ ধরে ॥
সূক্ষ্ম হতে স্থূল কিন্তু মায়ামূল তার।"
(শিবসঙ্কীর্তন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য)

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত 'শিবায়নে' যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, লৌকিক শিব পৌরাণিক শিবে পরিণত হইয়াছে, তবু শূন্যবাদের কবল মুক্ত হইতে পারে নাই—

"একব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ নিরাকার।" (পৃঃ ৮)

এই কাব্যে দেখা যায় যে, শূন্যময় নিরঞ্জন হইতে সগুণ শিবের

উৎপত্তি এবং সৃষ্টির বাসনায় তাঁহার অষ্ট-মূর্ত্তিতে প্রকাশ, প্রথমে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের আকারে শিবের পঞ্চ-মূর্ত্তির সঞ্চার হইল। এইবার সমস্ত সৃষ্টির আধারস্বরূপ গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত সপ্তভূমি ও সপ্তসিন্ধুর উৎপত্তি হইল এবং অষ্টম মূর্তিরূপে অর্ধনারীশ্বর শিব অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি হইল। আবার একস্থানে দেখা যায়—শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কথিত হইতেছে যে, শূন্য হইতে শিবের উৎপত্তি এবং শিবের পত্নীরূপে মহামায়ার উৎপত্তি ঘটে; তাঁহাদের উভয়ের মিলনের ফলে একটি ডিম্বের আবির্ভাব ঘটে। এই ডিম্ব হইতে মহাবিষ্ণুর জন্ম হয় এবং শিব তাঁহাকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন—

"মহাপ্রলয়ের সংজ্ঞা ব্রহ্মার নিপাত।
নাঞি শূন্য জলস্থল নাহি বহ্নি বাত॥
পঞ্চভূত নাহি থাকে না থাকে বিষয়।
রাত্রি দিন নাই অন্ধকার নিরাশ্রয়॥"
"নারীরূপে হইল মহামায়ার উদয়।
উপজিল মনসিজ দোহার হৃদয়॥
অন্তরীক্ষে বেহার করিতে নাঞি স্থল।
চাহিলা পরমেশ্বর নিজ পদতল॥
চরণের রজ শিব করিয়া সঞ্চয়।
তত্বে বাড়াইল—হইল অপূর্ব আশ্রয়॥"
"সেই স্থলে আদ্যা দেবী আর আদি দেবে।
আছেন অনেক কাল মনোভবভাবে॥
সৃষ্টি সৃজিতে চিত্তে উপজিল চিন্তা।
এই যুক্তি ঈশ্বরে দিলেন দেবী নিত্যা॥
আপন সদৃশ এক দেহ প্রতিবিম্ব।
সেই যেন সৃজে পালে এই ব্রহ্মাডিম্ব॥

সোমদৃষ্টে সদাশিব চাহিলেন বাম।
দেখিলা পুরুষ এক ইন্দিবর শ্যাম ॥ (পৃঃ ১৭-১৮

শিব এই জিম্বজাত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীকে মহাবিষ্ণু নাম দিলেন এবং সৃষ্টির ভার অর্পণ করিলেন—

"দিলাঙ্ তোমারে ভার অণিমাদি সিদ্ধি।
শুদ্ধ সত্বময় তুমি বুদ্ধে মহাবুদ্ধি ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিলয় বিষয় এই তিন।
তোমারে দিলাঙ্ তুমি আপনি প্রবীণ ॥" (পৃঃ ১৮)

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিজমাধব রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনাতে শূন্যবাদকেই বরণ করা হইয়াছে। ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের সরস্বতীই বাসলীদেবীরূপে পূজিতা হইতেন এবং পরে মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। প্রথমেই শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনের বন্দনা করিয়া নিরঞ্জনকে ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুরূপে পালনকর্তা এবং শিবরূপে সমস্ত সৃষ্টি নিজের ভিতরে লয় করেন—এইরূপ বর্ণনা দেন। সরস্বতীর বন্দনাতে শুধু অরূপা শূন্যময়ী সরস্বতীর রূপ দেওয়া হইয়াছে—

"দেবী সরস্বতী বন্দোঁ্যা হৃদয়ে সতত।
দেবতা বলিতে নারে তাঁহার মাহাত্ম্য ॥
ধবল বসন দেবী ধীর গম্ভীর।
পঞ্চাশ অক্ষরে যার নির্মাণ শরীর ॥
(দেহস্থিত শূন্য নাদধ্বনির সমষ্টি ওঁ) (পৃঃ ৪)

সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যাতে দেখা যায় যে, শূন্য-প্রভু নিরঞ্জনের সৃষ্টি বাসনা হইলে গায়ের ময়লা হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। তাঁহার নিঃশ্বাস হইতে দেবী মহামায়ার সৃষ্টি হইল, নাভি হইতে ব্রহ্মা এবং তাঁহার শরীর হইতে ধ্যানবলে বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। শিবকে মহামায়া দান করেন বিষ্ণুর পরামর্শ মতে নিরঞ্জন এবং বিষ্ণুকেও তিনি

সৃষ্টি-পালনের ভার অর্পণ করেন এবং শিবকে সৃষ্টি-বিলীন করার ভার দেন—

"না আছিল রবিশশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
না আছিল এ মেরুমন্দার।
না আছিল সুরাসুর রাক্ষস কিন্নর নর
সকলই আছিল শূন্যাকার ॥
অক্ষয় অব্যয় সেই মহাশয়
নিরঞ্জন পুরুষ প্রধান।
আপনে সদয় হৈয়া বেড়ায়ে জলে আসিয়া
সৃষ্টি করিতে দিলা মন ॥
সৃষ্টি করিতে চাহে গায়ের মৈল ফেলায়ে
তথি করিলা পদভর।
প্রভুর পদভর পাইয়া পৃথিবী যায় বাড়িয়া
ভাসে ক্ষিতি জলের উপর ॥
(প্রভু) সৃষ্টি সৃজিতে হাসে দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে
নাভিতে জন্মিল প্রজাপতি।
করে জাপ্যমালা লইয়া অন্তরে হরিষ হইয়া
ধ্যানে নিবেশ কৈলা মতি ॥
ব্রহ্মার ধ্যান কায়ে বিষ্ণু রুদ্র জন্মায়ে
দেবী সমর্পিব কার স্থানে।
বুঝিয়া বিষ্ণুর বাণী কহিলা যে চক্রপাণী
দেবী সমর্পিবা ত্রিলোচনে ॥" (পৃঃ ৮-৯)

এই গ্রন্থের ভিতরে দেখা যায় যে, চণ্ডীর উপাসনা বলিতে মূর্তিপূজার পরিবর্তে ধ্যান ধারণা ও তপস্যাকে বুঝাইতেছে এবং দেব নিরঞ্জনের প্রাধান্যকে সর্বত্র বজায় রাখিয়াছে। কলিঙ্গরাজকে যোগাঙ্গ 'প্রাণায়াম' অবলম্বন করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

"নাসিকা ধরিয়া হাতে সুষুম্না নাড়ীর পথে
ভূতশুদ্ধি করে দণ্ডধর ॥" (পৃঃ ২৭)

শূন্য পুরাণের বর্ণনানুযায়ী শিবের তপস্যাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে বল্লুকানদীর তীরে এবং চণ্ডীর আদেশে বিশ্বকর্মা কর্তৃক তাঁহার সাজসজ্জার অঙ্গ হিসাবে যে কাঁচুলী নির্মিত হয় তাহাতেও শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনের নাম লিখিত ছিল—

"বল্লুকার কূলে হর করে দেবার্চ্চা।
তুলিতে শ্রীফলপত্র করে লাগে খোঁচা॥" (পৃঃ ৫০)
"প্রথমে লিখিল বিশাই ধর্মনিরঞ্জন।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥"

শাপমুক্তির পরেও কালকেতুকে মুক্তির জন্য শিবের নিকট হইতে 'মৃতুঞ্জয় বাণ' (যোগসাধনা) শিক্ষা করিয়া শূন্য সহস্রারে পৌঁছিতে হইয়াছিল।

"আপনার শরীর চিন্ত হইতে অমর।...
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুইপাশে॥
জোয়ার ভাটি বহে তাহে বড় খরশান।
ভাটিবন্দী করিয়া জোয়ারে দিবা টান॥
সে জোয়ার ঠেকি হংস হইব সুস্থির।
কায়াপিণ্ড দেখা হইব নিশ্চল শরীর॥
শিবে সহস্রদলপদ্ম কহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিষে অমৃত"॥ (পৃঃ ১১১-১২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত কবিকঙ্কন চণ্ডীতে শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনকেই আদিদেবরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শূন্য হইতেই সৃষ্টিপর্বের বর্ণনা সহকারে আদিদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে—

"আদিদেব নিরঞ্জন যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলান মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ॥"

"প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা আগ্যাদেবী মহামায়া
সৃষ্টি করিবারে কৈল মন।" (পৃঃ ২৯-৩০)

মুকুন্দরাম সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয়কে বিষ্ণু, দেবরাজ ও শিবরূপে কল্পনা করিয়াছেন—

"প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।
রূপমান হইল তার তনয় মহান্॥
মহতের পুত্র হইল নাম অহঙ্কার।
তাহা হৈতে কৈলা সৃষ্টি সকল সংসার॥
অহঙ্কার হৈতে হৈলা এই পঞ্চ জন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই পঞ্চ জনে লোকে বলে পঞ্চভূত।
তাহা হৈতে প্রাণীবর্গ হইলা বহুত॥
গুণভেদে এক জন হৈলা তিন জন।
রজগুণে দেবরাজ মরাল বাহন॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ॥"

এখানে বিশেষত্ব এই যে, সৃষ্টির কারণরূপে দেবরাজকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইনি দেবরাজ ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মা—তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

ভোলানাথ ঘোষ সম্পাদিত কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় যে, শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনের প্রাধান্যকে তিনি অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যে পরিণত করিয়াছেন—অর্থাৎ শূন্যময়ী প্রকৃতির প্রতীক হিসাবে তিনি অন্নপূর্ণাকে বর্ণনা করিয়াছেন—

অন্নপূর্ণা মহাশয়া সংসার যাহার মায়া
পরাৎপরা পরম প্রকৃতি।
অনির্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি॥

অচক্ষু সর্বত্র চান অবর্ণ শুনিতে পান
আপদ সর্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥
বিনা চন্দ্রানল রবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থলে বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ॥
গুণ সত্ত্ব তমো রজে হরিহর কমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ ॥
শুনি বিধি হরিহর তিন জন পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ ॥” (পৃঃ ১৯)

এইবার শূন্য পুরাণ অনুসারে বর্ণনা—

“তিনের জানিতে সত্ত জানাইতে নিজতত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।
পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ॥
পচাগন্ধে ব্যস্ত হরি উঠে গেল ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচাগন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারিমুখ হইলা বিধাতা ॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিবঅঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই
যত্ন করি বসিলা চাপিয়া ॥

দেখিয়া শিবের কর্ম তাহাতে বসিল মর্ম
ভার্যারূপে ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥ (পৃঃ ১৯)

মাণিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে'-ও শূন্য পুরাণের সমর্থন দেখা যায়—

"হস্তপদ নাহি নাহি স্কন্ধ মাথা
ধর্মগোঁসাই জন্মিলেন যেন কুসুমের ফল গোটা॥"
"মুখের অমৃত আহার খসিয়া পড়িল।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে জল উপজিল॥"

'শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণে' যদিও দ্বিজবংশীদাস সর্বপ্রথমেই মনসাদেবীর অধিবাস ও আবাহনের পরে গণেশের বন্দনা ও দশাবতারের স্তোত্র রচনা করেন, তবুও শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনের প্রাধান্য অস্বীকার করেন নাই এবং পরাশর মুনির নিকট হইতে মার্কণ্ডেয় মুনি যে সৃষ্টির বিবরণ শ্রবণ করেন, তাহাতেও শূন্যতত্ত্বের উল্লেখ আছে—

"প্রথমে বন্দিনু দেব নিরঞ্জন।
পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার অনাদি নিধন॥
নির্গুণ সগুণ কিছু নাহি রূপ রেখা।
আছে হেন শব্দ কারো সঙ্গে নাহি দেখা॥" (পৃঃ ৮)

"প্রণমহ নিরঞ্জন, আদিদেব নারায়ণ নির্গুণ সগুণ নিরাকার।
এইরূপে নিরবধি স্থাবর জঙ্গমাদি, সর্বঘটে যিনি পরাৎপার॥
নাহিরূপ নাহি রেখা, সর্বভূতেতে ব্যাপক, আদিঅন্ত নাহি কভু তার।
অতিগুপ্ত মহাশয়, নাহি তার পরিচয়, তত্ত্বে নাহি তত্ত্ব পাই তার॥" (পৃঃ ৮)

"নাহি দিক নাহি রাত্রি ভূতল আকাশ।
চন্দ্রসূর্য হইলেক তাহাতে প্রকাশ॥
আছিল প্রকৃতি মাত্র নাহি রূপরেখা।
ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র, আছি যেন একা॥ (পৃঃ ৯)

সুকুমার সেন মহাশয় সম্পাদিত বিপ্রদাস রচিত 'মনসাবিজয়' কাব্যেও সিদ্ধিদাতা গণেশের স্তবের পরে শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনের বন্দনা করেন এবং শূন্যপুরাণ কথিত সৃষ্টিতত্ত্বকে সাংখ্যমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতিকে আদ্যাশক্তির অষ্টরূপে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ আকাশ, পবন, তেজ, জল, বসুমতী, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি রূপের সমন্বয়ে অষ্টমঙ্গলাদেবী—

"করি নিরঞ্জন বন্দো ত্রিদেবের স্রষ্টা।
তাহা কেহ নাহি জানে সেই সব দ্রষ্টা॥" (পৃঃ ১)
"যখন ছিল না গোসাঞি সৃষ্টি স্থিতি লয়।
পবন আকার গোসাঞি ছিলা জ্যোতির্ময়॥
নাহি আদ্য অন্ত মধ্য কেবল করণ।
পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিলা সৃজন॥
আকাশ পবন তেজ জল বসুমতী।
মনবুদ্ধি অহঙ্কার কৈল সৃষ্টি স্থিতি॥
আদ্যশক্তি সৃষ্টি করিলা মহাশয়।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলা তেজময়॥
সত্ত্বরজতম গুণে ব্রহ্মা হরিহর।
সৃজন পালন ক্ষয় করে নিরন্তর॥" (পৃঃ ৫)

শিব যখন বল্লুকার তীরে তপস্যামগ্ন তখন ধর্মঠাকুর দ্বাদশবৎসরের তপস্যার ফলে শিবের আলয়ে গমন করেন এবং শিবের অনুপস্থিতিতে গঙ্গার নিকট এই নির্দেশদান করেন যে, শিব যেন গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন এবং কালীদহে কমল তুলিতে গমন করেন—

"ধবলছত্র ধরি শিরে দণ্ডকমণ্ডলু করে
উল্লুক করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্যকলেবর
হরের আশ্রমে দরশন॥" (পৃঃ ৬)
"শিরে জটা মেলে যেন লয় তোমা শিরে॥

তবে যদি অতি খেদ করে দেবরায়।
কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায়॥" (পৃঃ ৭)

ধর্মদেবতার নির্দেশে শিব কালীদহে গমন করিলে, সেখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্যে ও জীবজগতের কামলীলাদর্শনে শিবের চিত্তবিকার ঘটে এবং তাহার ফলে তাঁহার যে বীর্যপাত হয়, তাহা পক্ষীকর্তৃক ভক্ষিত হয়। পক্ষী শিববীর্যের তেজ সহ্য করিতে অপারগ হওয়াতে উহা উদ্গার করিয়া পদ্মপাতাতে নিক্ষেপ করে এবং পদ্মপত্রের নাল বাহিয়া উহা অধোদিকে গমন করতঃ পাতালে বাসুকির মস্তকে পতিত হয়। ব্রহ্মা ধ্যান বলে ইহা জানিতে পারেন এবং ঐ বীর্য হইতে মনসা নাম্নী নারীর সৃষ্টি করেন এবং বাসুকির ভগ্নীরূপে পরিচয় দেন—

"পদ্মপত্রে শুক্রচন্দ্র হইলা অস্থির।
অম্বু ভেদিয়া পড়ে বাসুকির শির॥" (পৃঃ ১২-১৩)
"মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইহার।
নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার॥"

এই মনসাদেবী লৌকিক দেবতারূপে পরিচিত। কিন্তু 'মনসামঙ্গল' কাব্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সবাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ব ভারতীয় মহাযান অথবা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের দ্বারা জাঙ্গুলী নামে এক দেবী পূজিতা হইতেন এবং কথিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য আনন্দকে এই জাঙ্গুলী দেবীর গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। পণ্ডিতদের অনুমান এই যে, এই জাঙ্গুলী দেবীর সঙ্গে এই সর্পদেবী বিষহরি বা মনসার সাদৃশ্য ও মৌলিক সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে পঞ্চাশ শতাব্দীতে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়, এমনকি শূন্যপুরাণের ধর্মপূজাবিধানেও বিষহরির স্তোত্রে মনসার নাম জাঙ্গুলী বলিয়াই প্রচলিত। সেন রাজত্বে বৌদ্ধ দেবদেবীগণ বৌদ্ধ পরিচয় ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিল।

এখন এই 'মনসা' দেবীর দার্শনিক, তান্ত্রিক ও বৈদিক পরিচয়ের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা হইতেছে যে,

পদ্মা বা মনসাদেবীর এই প্রথম পরিচয়। মূলাধার চক্রের অধিষ্ঠিতা দেবী এই মনসা—"এই শক্তি সর্বনিম্ন চক্র বা পদ্মমূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিতা হইয়া নিদ্রিতা আছে, সাধকের সর্বপ্রধান কর্তব্য এই সুপ্তা-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা....একটি একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি উর্ধ্বে উত্থিত হন—সর্বোচ্চস্থানে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমাস্থিতি।"[১] সুতরাং শূন্যদেশ সংস্রার হইতে কামবাসনায় এই সর্পাকারা মনসাদেবীর সৃষ্টি এবং সর্বনিম্ন মূলাধারচক্রে তাঁহার স্থিতি, এখান হইতে স্বাধিষ্ঠান; মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রে ভেদ করিয়া সহস্রার শূন্যে গমন করাই সাধকের সাধনা।

মনস্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'মনসা' শব্দ গঠিত—মনের করণ বা ক্রিয়ার প্রতীকস্বরূপ মনসাদেবীকে কল্পনা করা হইয়াছে। মানুষের জীবন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির সমষ্টিমাত্র, এই মনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ সর্পের নির্দেশেই বাইবেলের মতে আদিম মানুষযুগল আদম ও ইভের সংযোগ ঘটে। বৈদিক ঋষিগণও এই মনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং মন শাস্ত্র-সমাহিত না হইলে সাধনা সফল হইবেনা, ইহাই ছিল বেদের ঘোষণা—

"যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবংতদু সুপ্তস্য তথৈবেতি।
দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ
শিবসঙ্কল্পমস্তু। ১

*　　　　*　　　　*

সুসারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥"

অর্থাৎ মন চির জাগ্রত ও পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা মনের মত দ্রুতগতিসম্পন্ন। একাদশেন্দ্রিয়ের ভিতরে মন সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—ত্রিকালের পরিচালকরূপে ইহা প্রতিটি জীবের ভিতরে চির বিরাজমান। সমস্ত কর্মজ্ঞানাদির প্রক্রিয়া,

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাসগুপ্ত : ৪র্থ অধ্যায়

যাগযজ্ঞাদি, যাবতীয় বিষয়গুলি মনের বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত, এমন কি মানুষের চেতনা, ধৃতি, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলির উপরেও মনেরই প্রভাব দেখা যায়। ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই ত্রিবেদকথিত যাগ-যজ্ঞাদি, ধর্মকার্য এবং বিধিসমূহের ভিতরেও মনের প্রাধান্য বর্তমান। দক্ষ সারথি যেমন অশ্ব ও লাগামের সাহায্যে রথ চালনা করে, তদ্রূপ মনের দ্বারাও মানুষের জীবন চালিত হয়। এই মনের দুইটি দিক—একটি অমৃতময় এবং অপরটি বিষময়। বৈদিক ঋষিগণের কামনা যে, মন অমৃতময় ও শান্তসমাহিত হইয়া উঠুক। 'কঠোপনিষদ্'-এ বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম এবং দশটি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এমনকি বেদান্তের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন—

> "বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
> ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।" (কঠোপনিষদ্)
> সেন্দ্রিয়স্য তু মনসো বুদ্ধেস্তু সদ্ভাবঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রুতিস্মৃত্যো।"
> (বেদান্তসূত্রভাষ্য—২।৩।১৫)

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনেও মনের বৃত্তিকে ইন্দ্রিয়বর্গের কার্যরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং বৃত্তির নিরোধেই জীবের মুক্তি হইবে, অর্থাৎ স্বরূপশূন্য অবস্থায় উপনীত হইবে—ইহাই ঘোষিত :

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"—১।২, "তদা দ্রষ্টু স্বরূপেবহস্থানম্"—১।৩

"উভয়াত্মকং মনঃ" (সাংখ্যসূত্র—২।২৬)

বৈদিক যুগেই মনকে ঋষিগণ দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং সেই ঋষিকল্পিত মনদেবতার প্রভাব উপনিষদ্, বেদান্ত ও দর্শনেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে—মনের শান্তভাবই জীবের মঙ্গল সাধন করে। পরবর্তীযুগে বৌদ্ধগণও বুঝিয়াছিলেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—এই উভয় বস্তুর কার্য্যের গুণ, পরিণাম ও বিশেষ অবস্থার ভিতর দিয়াই মনের সঙ্কল্প সৃষ্টি হয়।

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পমিন্দ্রিয়ঞ্চসাধর্ম্যাৎ।

গুণপরিণাম বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥" ২৭ (সাংখ্যকারিকা)

'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় যে, চণ্ডী পর্যন্ত মনসার বিষময় দৃষ্টিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, আবার বিষহরির অমৃত দৃষ্টিতে প্রাণ লাভ করেন অর্থাৎ মনের বৃত্তি জীবনে বিষময় হয়, আবার বৃত্তির নিরোধ জীবনে অমৃত আনয়ন করে। তাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিতা সর্পাকার দেবীকে 'জাঙ্গুলী' নামে উপাসনা করিতেন এবং এই ভাব অবলম্বনে বাংলার কবিগণও মনসা, বিষহরি, পদ্মা প্রভৃতি নাম দিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এ দেখা যায় যে, সংস্কৃত উপ-পুরাণেও মনসা দেবীকে কশ্যপমুনির মানসী কন্যারূপে কথিতা এবং শৈবী ও গৌরী নামে অভিহিতা—

> সাচকন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
> তেনৈব মনসা দেবী মনসা যা চ দিব্যতি॥
> মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
> তেন যা মনসাদেবী তেন যোগেন দিব্যতি॥
> জপেৎগৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
> শিব শিষ্যা চ যা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্তিতা॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় সাহিত্য

বৈষ্ণবপ্রেমধর্মরসপুষ্ট ভাগবতাদি সংস্কৃত গ্রন্থসকলের বাংলা ভাষাতে অনুবাদ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে লীলারসের প্রাচুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পার্থসারথি রূপের উপরে এক বিরাট আবরণের সৃষ্টি করাতে রাধা প্রেমমুগ্ধ কৃষ্ণপ্রেমই জনসমাজে ও ধর্মজগতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যে প্রবর্তিত লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী কথিত উপাসনা ষোড়শ শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রেমবাদী বৈষ্ণবধর্ম শক্তিবাদী তান্ত্রিক ধর্মকে কোনঠাসা করাতে বাঙ্গালী চরিত্রের ভিতরে রাজসিকসত্তার অভাব দেখা দিয়াছিল। তান্ত্রিক আগমবাগীশ ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া শক্তিবাদী তান্ত্রিক ধর্মের পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাংলার ধর্মজগতে একটা আধুনিক জাগরণের সৃষ্টি ঘটে এবং সাধক কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকের সাধনার ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া শক্তি-সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিণতি আসিল যুগাবতার রামকৃষ্ণের ভিতরে। অপরদিকে রাজা রামমোহন প্রচারিত 'ব্রহ্মবাদ' আলোচনার ভিতর দিয়া এবং বাদ-প্রতিবাদের ফলে শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় আলোচনা বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অংশ দখল করিল। তৎকালীন সাহিত্যই বাংলার তরুণদের ভিতরে যে চরিত্রের দৃঢ়তা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং রাজসিক শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাই বাংলার জাতীয় জাগরণের সহায় হইয়াছিল। শিবমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভিতরেও বাজিয়া উঠিল মিলনের সুর, এমনকি 'তারাপীঠে'-র সাধক বামাক্ষ্যাপা পর্যন্ত বৈষ্ণবদের অনুকরণে 'তারাদেবী'-কে রথে স্থাপন করিয়া রথোৎসবের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেন—"রথসম্মুখে নৃত্য

করিয়া হরিনাম গাহিয়া ক্ষ্যাপাবামা সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া প্রেমাশ্রুপ্রবাহে দেহ আপ্লুত হওয়ায় গৌরাঙ্গরূপ প্রকাশ করিলেন।"১

বামাক্ষ্যাপার ধর্মমত শূন্যবাদকেই সমর্থন করিতেছে—"মন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সপ্তম চক্রে না উঠিলে ঐরূপ লয় হয় না। বৌদ্ধমতে ঐ অবস্থাই নির্বাণ। ঐ অবস্থার পর, অখণ্ড সত্তায় অখণ্ড জ্ঞান ভাসে। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বে মন-বুদ্ধি-অহং-জ্ঞানের লয় অবস্থাই অন্তঃশ্মশান। এই শ্মশানেই তারা বা ত্রাণকারিণীবিদ্যার স্ফুরণ। ভক্ত এই ব্যাপার গীতোচ্ছ্বাসে সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন—

'শ্মশান ভাল বাসিস বলে মা শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, ধূধূ আগুন জ্বলছে চিতে।
চিতাভস্ম চারিদিতে রেখেছি মা আসিস যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে মা চরণতলে,
নাচ মা শ্যামা তালে তালে হেরি দুটি আঁখি মুদি॥'

যতক্ষণ না সর্ববিধ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত ক্ষুদ্র জ্ঞান ও তজ্জনিত স্মৃতি ও সর্ববিধ কামনা এবং মূলীভূত বাসনা লয় হইয়া মন ঐরূপ শ্মশানে পরিণত হয়, ততক্ষণ সেই তারিণী অর্থাৎ অখণ্ড চিদুপলব্ধি ঘটে না। এই লয়ই শাস্ত্রে তম নামে বিদিত। তাহার পরই বালসূর্য-মণ্ডলে অনন্ত জ্যোতিঃ।

'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'

ঐ অবস্থায় জীব নিষ্কামা শিবশক্তির লীলা দেখিয়া প্রেমে আত্মহারা হন। তখন সকলই প্রেমময়, আনন্দময় ও চিন্ময়। তখন সকলই তারাদর্শন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গ। ব্রহ্মাণ্ডের নিস্তরঙ্গ অতীতাবস্থাই তাদৃশ তরঙ্গের আধার। তন্ত্রের পঞ্চচক্রে পর্যন্তই ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমের লীলা, ষষ্ঠে মনের লয়, সপ্তমে রূপভাবাতীত শূন্য।"২

১-২। বামলীলা—হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৩-১৪, ২২২।

ষট্‌চক্র ব্যতীত আরও একটি সাধনার পথ আছে। এই সাধনার নাম 'লয়যোগ'। এই সাধনার ভিতর দিয়াও শূন্যত্বপ্রাপ্তি ঘটে। "ভগবান বেদব্যাস এই যোগের প্রথম সাধক। লয়যোগ দ্বারা শরীরস্থ নবচক্রে চিত্ত লয় করিয়া মোক্ষ ও ঐশ্বর্য লাভ করেন।

লয়যোগের উদ্দেশ্য—শক্তিদ্বয় পরিচালন পূর্বক মধ্যশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রত্যেক মানবের দেহে তিন প্রকার শক্তি আছে। একটির নাম ঊর্ধ্বশক্তি ও অপরটির নাম অধোশক্তি ও অন্যটি মধ্যশক্তি।

মূলাধার হইতে নাভিচক্র পর্যন্ত অধঃশক্তির স্থান। ইহা ইচ্ছা-শক্তিরূপা ব্রাহ্মীশক্তি। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত মধ্যশক্তির স্থান। ইহা ক্রিয়াশক্তিরূপা বিষ্ণুশক্তি। কণ্ঠ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ঊর্ধ্বশক্তির স্থান। ইহা জ্ঞানশক্তিরূপা রুদ্রশক্তি (মূলাধারে আছে ব্রহ্মগ্রন্থি, মণিপুরে বিষ্ণুগ্রন্থি, কণ্ঠে রুদ্রশক্তি)।

(১) ঊর্ধ্বশক্তি নিঃপাতনের দ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধ্য-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া সাত্ত্বিক প্রবাহ বা আনন্দের প্রাচুর্য্য উপভোগ হয়, এই প্রক্রিয়ায় আসন বা প্রাণায়ামের অপেক্ষা নাই, লয়যোগীর গ্রন্থিগুলি আপনা হইতেই ভেদ হইয়া যায়।

(২) 'মনোলয়ে দ্বৈতনিবৃত্তিঃ'। অনাহত ধ্বনিতে মনসামাধান চিত্তলয়ের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যোনিমুদ্রা অবলম্বনে নাদানুসন্ধান মনলয়ের কারণ। এই নাদ দশবিধ। প্রথমে চিন্, দ্বিতীয়ে চিন্‌চিন্, তৃতীয়ে ঘণ্টানাদ, চতুর্থে শঙ্খ, পঞ্চমে তন্ত্রীনাদ, ষষ্ঠে তালনাদ, সপ্তমে বেণু, অষ্টমে মৃদঙ্গ, নবমে ভেরী, দশমে মেঘনাদ।

এই অনাহত ধ্বনিতে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে মন ক্রমশঃ নিস্তরঙ্গ হয়, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় ব্যাপার তিরোহিত হয় ও চিত্ত নির্বিকার হয়। তখন 'আমি তুমি' ভাব ঘুচিয়া গিয়া একাকারভাবে চিত্ত ডুবিয়া যায়। এই দ্বৈতভাবলোকে অদ্বৈতভাবের স্ফুরণ হয়।

(৩) শাম্ভবী মুদ্রা অভ্যাসেও লয়-অবস্থা আসে। তখন দৃষ্টিশক্তি স্বতঃই নাসার অগ্রভাগ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভ্রূমধ্যে স্থির হয়।

প্রাণবায়ু রেচকপূরকবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে ভ্রূমধ্যে আসিয়া বসিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনও সঙ্কল্প-বিকল্প ত্যাগ করিয়া শূন্যভাবে অবস্থান করে। চক্ষু দুটিও শিবনেত্র হয়। এই প্রকার ভাবনায় বিদ্যুৎতেজ সহিত যে জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। দেবদর্শন ঘটে, তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ হয়। শূন্যরূপ পরমাত্মার অহর্নিশ ধ্যানে যোগীমন চিদাকাশে লীন হয়। তাঁহার খেচরত্ব সিদ্ধি লাভ হয়। তিনি শিবস্বরূপ।" (রামলীলা—গঙ্গোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪৭-৪৮।)

সাধক কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' নামক পুস্তকে 'হংস' নামধেয় মন্ত্রকে অজপা মন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং শূন্য-প্রভু নিরঞ্জনকে কামিনীরূপে কল্পনা করিয়া উপাখ্যানের সাহায্যে ষট্‌চক্রভেদে শূন্যতা-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

"তার মধ্যে প্রকাশ করিব যোগতত্ত্ব।
সমাধি অজপা মন্ত্র ব্রহ্মের মহত্ত্ব॥" (পৃঃ ২)
"প্রকৃতির তিনগুণ গুণে ধরে কায়া।
তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে।
বর্ণিব বৃত্তান্ত সদা ব্রহ্ম দরশনে।" (পৃঃ ১)

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক সত্ত্বরজস্তমোময়ী তিনটি নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া নদীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের মিলনস্থানকে ত্রিবেণী বলা হইয়াছে। এই নাড়ীর বাল্যভাব, মধ্যভাব ও উত্তম ভাবের বর্ণনা—

"জাতিসরমকুলভরম তেয়াগিব দূর পরিহরি লাজ।
বরমিহ প্রাণদান তবহুঁ পুন সাধিব আপন কাজ॥"

(পৃঃ ৯—বাল্যভাব)

"পরিহরি পরিবার কামিনী করিব সার
একে একে সব তেয়াগিব
বিষয় ভরম গেছে গিয়েছে না জেতে আছে
তথাপি না ছাড়িব তাহারে॥"

(পৃঃ ১২—মধ্যভাব)

"জগতে যে গুণ সে সকল গুণ
আপন শরীরে হয়।
স্থানে স্থানে হেরি আপনা পাসরি
সকলি সুন্দরীময়॥" (পৃঃ ১৪—উত্তমাবস্থা)

এই বিবরণে ৭২টি নাড়ী মানবদেহে আছে এবং তাহার মধ্যে দশটি নাড়ীকে প্রধানরূপে প্রতীয়মান বলিয়া কথিত আছে। এই সকল নাড়ীর অবস্থান প্রচলিত ধারানুযায়ী ব্যাখ্যাত হওয়ার পরে দশপ্রকার বায়ুর মানবদেহে অবস্থানের কথা আছে। বিভিন্ন ঋতুতে মানবদেহে বায়ুর বিবরণ—

"অপান সহিত গ্রীষ্ম ঋতুর পয়ান।
ব্যানসহ বসন্ত আইল সেই স্থান॥
সমান মারুত সঙ্গে হেমন্ত প্রকাশ।
প্রাণসহ সুতরাং হেমন্ত করে বাস॥
উদান করিয়া ভর শিশির সঞ্চরে।
শূন্যে থাকি বরষা বরষে সুধাকরে॥" (পৃঃ ৭)

সুতরাং মূলাধারে অপান, স্বাধিষ্ঠানে ব্যান, মণিপুরে সমান, অনাহতে প্রাণ এবং বিশুদ্ধে উদান এই পঞ্চবায়ুর অবস্থান এবং আজ্ঞাচক্র শূন্যময়। এতদ্ব্যতীত নাগবায়ু শারীরিক চেতনা, কূর্মবায়ু দর্শন, কৃকরবায়ু ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দেবদত্ত হাঁচি, হাই ও হাস্য এবং ধনঞ্জয়বায়ু শব্দ উৎপাদন করিয়াই দেহ সঞ্চালনের সহায়তা করিতেছে।

মূলাধারচক্রে দেব ব্রহ্মা ও দেবী ডাকিনীর স্থান অতিক্রম করিয়া কামিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে গমন করিলেন—এই চক্রে দেব বিষ্ণু ও দেবী রাকিণী। তারপর মণিপুর চক্রের দেব রুদ্র ও দেবী লাকিনীর নিকট হইতে এইবার কামিনীর রূপ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইল অর্থাৎ সাধক উত্তমাবস্থায় পৌঁছিলেন এবং অনাহতচক্রে অবস্থিত দেব হংসাভ ঈশ্বর ও দেবী কাকিণীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। বিশুদ্ধচক্রে অবস্থিত দেব সদাশিব ও দেবী শাকিনীর সাক্ষাৎ লাভ করার ফলে অসীম

শূন্যের পথে অগ্রসর হইলেন সাধক। উক্ত পাঁচটি চক্রের ভিতরের সৃষ্টির স্থূলরূপ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—সূক্ষ্মরূপে যথাক্রমে পরিণত হইল—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দরূপে। মূলাধারস্থিত পৃথিবীর লয় স্বাধিষ্ঠানস্থিত জলে, জল লয় হয় মণিপুরস্থিত অগ্নিতে, অগ্নি লয় হয় অনাহতস্থিত বায়ুতে এবং বায়ু লয় হয় বিশুদ্ধস্থিত আকাশে—শূন্যে; সুতরাং সাধক অসীম শূন্যের পথে চলিলেন। পঞ্চাশৎবর্ণমালা আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে পৌঁছিয়া 'হ' ও 'ক্ষ' দুইটি বর্ণে পরিণত হইল। কল্পিতা কামিনী একে একে ছয়চক্র ভেদ করিয়া শূন্যতা উপলব্ধি করিলেন।

সহস্রার—"তাহার উপরে এক কমলের কথা।
শূন্যদেশে শঙ্খিনী তাহাতেও আছে গাঁথা॥
কমল সহস্রদল অধোমুখ তার।
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার॥" পৃঃ ৩০

"আগমকল্পদ্রুমপঞ্চ শাখাদি মতে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে অকথাদি ত্রিগুণ। তন্মধ্যে ত্রিকোণের সমীপে ত্রিবিন্দু। ঐ ত্রিবিন্দুব অধোবিন্দু হকার পুরুষাত্মক এবং উর্ধ্ববিন্দুদ্বয়রূপ বিসর্গ প্রকৃতির সকার। এই পুংপ্রকৃত্যাত্মক হংস ত্রিবিন্দুরূপে প্রকাশিত। তাহার মধ্যে অমাকলা, অমাকলার ক্রোড়ে নির্বাণশক্তি, তাহার মধ্যে শূন্য পরব্রহ্ম।" (পৃঃ ৭ আনা)

"ঐ সহস্রদলপদ্মমধ্যে নিষ্কলঙ্ক নির্মল শশধর অধিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তাহার অমৃতস্বরূপ সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি বিস্তার করিয়া যেন মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছে। এই চন্দ্রমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল এক ত্রিকোণ যন্ত্র রহিয়াছে, তন্মধ্যে দেবগণেরও পূজনীয়া চিন্ময় আত্মা অতীব শূন্যস্থান বিরাজমান আছে"। (ষট্‌চক্র—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—পৃঃ ১৯)

সাধক বামাক্ষ্যাপা 'সহস্রার' বর্ণনা করিয়াছেন—"এই গুরুচক্রের উর্ধ্বে নিরালম্বপুরী বা শূন্যস্থান। এখানেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ হয়।

ইহার পরেই সহস্রারপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর মহাশূন্যে ২০টি দলে সজ্জিত, প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশদলে পঞ্চাশটি মাতৃকাবর্ণ। কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণ চন্দ্রমণ্ডল বা শক্তিমণ্ডল। তিনকোণে হ, ল, ক্ষ বর্ণ আছে ও তিনদিকে সমস্ত স্বর ও ব্যাঞ্জনবর্ণ আছে। এই শক্তিমণ্ডল মধ্যে বিসর্গাকার মণ্ডল। তাহার উপর মধ্যাহ্নকালীন কোটিসূর্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ আর একটি বিন্দু—তাহা বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ শ্বেতবর্ণ। এই বিন্দুই পরম শিব নামে জগৎ উৎপত্তি নাশ করেন—ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই অজ্ঞানতিমির বিনাশ-কারী পরমাত্মা। ইহাকে সাধনবলে প্রত্যক্ষ করাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলে। অ হইতে বিসর্গান্ত ষোড়শ বর্ণযুক্ত ব্রহ্মরেখা প্রজাপতি, ককারাদি তকারান্ত ষোড়শবর্ণযুক্ত পরাৎপর বিষ্ণুরেখা, মকারাদি সকারান্ত ষোড়শবর্ণযুক্ত শিব রেখা, সত্ত্ব-রজ-তমযুক্ত রেখাত্রয় বিন্দুত্রয় হইতে উদ্ভূতা হইয়া যোনি আকারে ভূষিতা। এই বিন্দুত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাত্মক পরমতত্ত্ব, ত্রিকোণ বিন্দুত্রয় হইতে উৎপন্ন। এই ত্রিকোণের মধ্যে মহাশূন্য অবকাশ-গুণাতীতা পরমা প্রকৃতি। আপন আপন সম্প্রদায়ের গুণাতীত জগদ্‌গুরু এই পরাপ্রকৃতির অধীশ্বর হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

পরমশিব ঐ বিন্দু সততগলিত সুধাস্বরূপ। ইহার মধ্যে সমস্ত সুধার আধার গোমূত্রবর্ণা অমানাশক কলা আছে। ইনিই আনন্দ ভৈরবী। ইহার মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার নির্বাণ কামকলা আছেন। এই নির্বাণ কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা, তাহার মধ্যেই পরম নির্বাণ শক্তি আছেন। তাহার পর নিরাকার মহাশূন্য। এই মহাশূন্য নির্বাণতত্ত্বে দিবারাত্র নাই, তম ও প্রকাশভাব নাই, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বিপঞ্চতত্ত্ব নাই। (বামলীলা—গঙ্গোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৫৫-৫৬।)

কমলাকান্তের হৃদয়ে কালীর কোন নির্দিষ্ট রূপ ছিলনা, ইহাই ক্ষণিকত্ববাদ, যার পরিণতি শূন্যত্ব—

> "কেনরে আমার শ্যামা মাকে বলো কালো।
> যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো॥

মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে।
আমি জানিতে (বুঝিতে) না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল ॥
মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশরে ॥"[১]

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত উভয়েই একই ভাবধারাতে অনুপ্রেরিত হইয়া গান রচনা করাতে, সাদৃশ্য দেখা যায়—

"আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিলনা গো মা,
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী (মা) যন্ত্রবলে মোরা চলি।
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি (মা)।
যেমন বলাও তেমনি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি।"[২]

রামপ্রসাদ রচিত গানে ১ম ও ২য় পংক্তিতে—

"সংসার ছিলনা যখন
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?"

প্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সসীম জগতের ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। রূপকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি অরূপের সাধনাতে শূন্যতাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন—

"মন তোমার ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কে তা চিনলে না।
মা আমার জগৎময়ী, জগতে তার নাই তুলনা।
তুমি মাটির মূর্তি গড়ে কি চাও করতে মায়ের উপাসনা।

১-২। সাধক কমলাকান্ত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১৩৪, ১৫৩।

জীবমাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তার পরভাবনা।
তুমি খুশী করতে চাও কি মাকে কেটে একটা ছাগল-ছানা॥
প্রসাদ বলে রে মূঢ় মন, ভক্তিমাত্র উপাসনা।
কর্লে লোক দেখান কালীপূজা, মাতো তোমার ঘুস খাবে না॥"[১]

"কিন্তু রামপ্রসাদের দেবী যেমন চিন্ময়ী, তার পূজাবিধি ও তেমনি মনোগত। রামপ্রসাদ পৌত্তলিকতার স্থূলতাকে অতিক্রম করেছিলেন 'কস্‌মিক' কল্পনার দ্বারা। 'মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমের মাটি দিয়ে।' মৃণ্ময় মূর্তির শূন্যতার অন্তঃসার-শূন্যতাকে এইভাবে বিদ্রূপ করা একপ্রকার দুঃসাহস, কিন্তু অন্তরের গভীর উপলব্ধিতে জননীর বিশ্বরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন বলেই ভুবন-বিশাল বিশ্বব্যাপিনী জগদীশ্বরী তাঁর রূপ কল্পনায় বিব্রত হয়েছিল। সাধনার গভীরতর স্তরে উন্নীত হয়ে আরাধনারও একটি নিজস্ব মনোময় পদ্ধতি আবিষ্কার করে-ছিলেন। চার্বাকের মত আপাতনাস্তিক ঔদ্ধত্যে রামপ্রসাদ প্রচলিত পূজাবিধির অর্থহীন কর্তব্য পালনকে যেন চ্যালেঞ্জ করেছেন—'মন তোমার ভ্রম গেল না।' অথচ সমস্ত শাস্ত্রসম্মত পূজাচারের এই স্থূলভ নিরর্থকতার দায় আপন মনের উপরেই অর্পণ করা হয়েছে। আত্মবিদ্রূপই এই বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতমরূপ, সুতরাং অন্ধসংস্কার ও মূঢ় বিশ্বাস কবির নিষ্ঠুরতম গঞ্জনার উপলক্ষ্য হয়ে সুচতুর নৈঃশব্দে অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভূত করেছে। 'মন তোমার ভ্রম গেল না'—এই পদটি শ্লোকাত্মক উদ্দেশ্যমূলকতায় লক্ষ্যাভিমুখী, পরবর্তী 'মন তোর এত ভাবনা কেনে' পদে যেন প্রচলিত পূজাপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ভক্তের সংশয়মোচনের যুক্তিপূর্ণ প্রয়াস। একটি তীক্ষ্ণবাক্ আর একটি বাক্‌সিদ্ধ। প্রথমটি বিদ্রূপ কঠিন, দ্বিতীয়টি উপদেশাত্মক। কত অনায়াস দুঃসাহসে রামপ্রসাদ এই বিধিবদ্ধ পূজাব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"[২]

বেদবেদান্তদর্শনাদি জাতপাণ্ডিত্যের দুরূহ জ্ঞানের পথে যাহা

১। সাধক রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১৮২।
২। শক্তিগীতি পদাবলী—অরুণকুমার বসু, ১৪শ পর্যায়।

অনুসন্ধেয়, সেই দুর্নিরীক্ষ্য স্বরূপ রামপ্রসাদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ের নিবিড়ানুভূতিদত্ত ভক্তির অপূর্ব পরিণতি জীবনবেদের মাধ্যমে। সাধক কবির গোপন ভবনদ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

"কালী বল মনরে (পাঠান্তরে কালী কালী বল রসনারে)
ও মন ষট্চক্ররথমধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তার রথ চলে দেশ দেশান্তরে॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কচ্চে দিনে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির, নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন কর নারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈসে শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন এইত সময়, মিছেকাল যায় (যত) ডাকতে পারছ অক্ষরে।" [১]

ছয়টি চক্রের সহিত যুক্ত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—নাড়ীত্রয়ের ভিতর দিয়া সাধনা করিতে করিতে নাদতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে এবং চিত্ত-বিলয়ে সাধনা সিদ্ধি হয়। মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যানবলে সচেতন করিয়া সুষুম্না নারীর অভ্যন্তরস্থ 'বজ্রাখ্যা' নাড়ী এবং তদভ্যন্তরেস্থিতা 'চিত্রিনী' নাড়ীকে অবলম্বন করিতে হইবে। তারপর ছয়টি পদ্ম ও তিনটি শিবকে ভেদ করিয়া সহস্রদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলনে শূন্যতাপ্রাপ্তি ঘটিবে।

"রামপ্রসাদ কি চাহিয়াছিলেন? চাহিয়াছিলেন বিদেহ মুক্তি (bodiless liberation) লাভ করিয়া মায়ার নিগড় হইতে মুক্তি। এই মুক্তি লাভ করিয়া জীব যখন সচ্চিদানন্দময়স্বরূপ হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে ঈশ্বরের কোন সত্তা থাকে না। জীব ও পরমাত্মা সম্পূর্ণ অভিন্ন। রামপ্রসাদ মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন—

১। সাধক রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১২, ১১৮।

"বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ও শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
একঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলেজুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যায় স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে যায় মিশায়ে॥"[১]

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত—উভয়েই শেষ পর্যন্ত কোন মূর্ত সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—

"ধাতুপাষাণ মাটিমূর্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥"

এখানে পাতঞ্জলদর্শনের সূত্র "যথাভিমতধ্যানাদ্বা"-র সমর্থন দেখা যায়:

"কমলাকান্তের মতে শূন্যতাই প্রকৃত তত্ত্ব, এই তত্ত্বের বাহিরে যে সকল ভাবধারা বিরাজিত তাহা সমস্তই ভ্রম। নানারকম রূপ কল্পনা সাধকের মনে শুধু ভ্রান্তি সৃষ্টি করে—

'কালি! সত জাগিয়ে ঘুমাওগো।
আমি কমনে তোমাকে জাগাইব॥
তুমি সুমতি কুমতি পুরুষ প্রকৃতি
তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও।
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে।
কারে ভ্রান্তিরূপেতে ভ্রমাও॥
কারে দেহ যন্ত্র সাধনা মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও।
কমলাকান্তে নিতান্ত অনুগতে
নামরসে বিরামও॥'[২]

"যোগীগণের পরম সংবিৎ ভাববিষয়ক নয়, আবার অভাব বিষয়কও নয়—এইরূপ মধ্যমা প্রতিপত্তি হয়। এইভাবে তাঁরা নির্বাপিত অগ্নির মত সমস্ত বেদবর্জিত শূন্যদশাবর্জিত শূন্যতাপ্রাপ্ত হন। যোগীর

১। সাধক রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১৪৭।
২। সাধক কমলাকান্ত— ঐ , পৃঃ ১৩৪।

এই দশাই পাতঞ্জলদর্শনে নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিবলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"[১]

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মকে নিরাকার ও শূন্য বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত—'মহাত্মা রামমোহন রায়' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি—"একই সময়ে পরমেশ্বরের আকারের ভাব ও অভাব অর্থাৎ আকার আছে ও আকার নাই তর্ক-শাস্ত্রানুসারে (Logical Principle of Non-contradiction) ইহা অসম্ভব।" (পৃঃ ১৫৫)

"ভাব সেই একে।
জল স্থল শূন্যে যে সমান থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার।
যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে॥"

(ব্রহ্মসঙ্গীত—পৃঃ ২৮৩)

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামঠাকুরের বাণীতেও শূন্যবাদের সমর্থন পাওয়া যায়—"কুণ্ডলিনী কি? কুণ্ডস্থিত বা কুণ্ডাশ্রিত শক্তি। কুণ্ড মানে আধার, শক্তি যখন আধারে আছে বা অবলম্বন করিয়া আছে—উহা কুণ্ডলিনী। উহা শক্তির শূন্য অবস্থা। যখন শক্তি শিবকে বা শূন্যকে অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ নিরাশ্রয় বা নিরালম্ব হইবে, ওখানে আর আশ্রয় নাই—'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশরক্ষ'। দ্বিদল মানে দুইপক্ষ, উহা কেন্দ্র—ওখান হইতে দুই দিকেই পাওয়া যায়—উপরে অব্যক্ত, নিম্নে দৃশ্য।"

"যাকে শ্বাস-প্রশ্বাস বলা হয় বস্তুতঃ তাহা ধীর গতি বা সূক্ষ্ম গতি। উহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়—উহাই সৎসঙ্গ, উহারই মাহাত্ম্যে শূন্যে স্থিত হওয়া যায়।"[২]

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মতে শূন্যই সৃষ্টির স্বাভাবিক অবস্থা—বাঁশীর যদি আবরণ থাকে—তবে বাজেনা, আবরণ ও আকৃতি মানুষের মনে সৃষ্টি করে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের আবরণ দূর হইলেই

১। শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি—দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৭।
২। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামঠাকুর—মৃণালকান্তি সরকার, পৃঃ ১৭৫-৭৬।

আসে শূন্যত্ব—"নানা অহঙ্কারে আর মোহে ফোঁকরগুলি বন্ধ হয়ে আছে। তাই আর বাজছেনা একটুকুও, ছিদ্র যদি শূন্য না হয়, বাজবে কি করে? দরজা যদি শূন্য না হয় তবে আসবে কি করে সে অতিথি পথিক?

তাই শূন্য করে রাখ তোর বাঁশী, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি। পূর্ণ করা সোজা, শূন্য করাই তপস্যা।"[১]

"ভক্তির উদ্দেশ্য যদি মুক্তিই হয়, তাহা হইলে শূন্যবাদ অবলম্বন করিতেই হইবে অর্থাৎ ভক্তির পরিণতি মুক্তি, নির্বাণ বা শূন্যত্ব অর্থাৎ ভক্তির জন্য সাকার, মুক্তির জন্য নিরাকার।"[২]

"শিবকালী বলে একটি বালকের নাম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ঠাকুর —আদিমধ্যান্তশূন্য শিব, ভবভয়শমনীকালী। বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথ, কাশীশ্বরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা।"[৩]

'সমাধিস্থ হলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়; সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি?—মুখে বলার শক্তি থাকেনা। লুনের ছবি (লবণ-পুত্তলিকা) লবন মাপতে গিছল।"

"কি জান যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি মহাসমুদ্র, কূল কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থলে বরফ রয়েছে; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। আবার সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়; —যেমন জল তেমনি জল—ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ—দিয়ে গেলে সাকার-রূপ আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার, জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।"[৫]

"বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয়, এ দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায়না, নাস্তিও বলা যায়না। তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যে।"[৬]

১-২। পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ (৩য় খণ্ড)—অচিন্ত্যকুমার সেন, পৃঃ ২৫, ৩৯।

৩। পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ (৪র্থ খণ্ড)—অচিন্ত্যকুমার সেন, পৃঃ ৮৫।

৪-৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতম্ (৩য় ভাগ)—পৃঃ ৮, ২৬, ৩৪।

রামকৃষ্ণের মতে ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। সমাধিতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও সাধকের প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকেনা। ভক্তি ও জ্ঞান—এই উভয়ের উপলব্ধি সাকার ও নিরাকারকে ব্যাখ্যা করেন এবং বরফ ও জলের সহিত তুলনা করেন। ভক্তির সাকার-রূপ বরফ জ্ঞান-সূর্য্যের তাপে গলিয়া যায়। এইরূপে সাকার ও নিরাকার সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিলে মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যত্বকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অস্তিত্বও নয় নাস্তিত্বও নয়—এইমত প্রকাশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে কবি ঈশ্বর গুপ্তই প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়াছেন, তাই তাঁহার আবির্ভাব তাৎপর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নবীনযুগের উন্মেষসাধক এবং মধ্যযুগের সর্বশেষ প্রতিনিধি—উভয় যুগসাধনার নবপ্রজাপতি। অবশ্য তাঁহার কিছু কিছু উগ্র আদি রসাত্মক ভাবকে অশ্লীলতা আখ্যা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাঁহার রচনা ছিল শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বাহিরে, তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন প্রকৃতির স্বরূপ—নগ্ন সৌন্দর্য। তিনি দেখিয়াছিলেন বিশ্বের শূন্যময় মূর্তি—যাহার মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃতি-ঘটিত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, তদ্দৃষ্ট প্রকৃতির স্বরূপ ভগদেশে সৃষ্টিকারিণী, স্তনযুগলে বিশ্বধাত্রী ও আস্যে প্রলয়কারিণী।

গৌতমবুদ্ধ সাধনান্তে ঘোষণা করিয়াছিলেন "হে গৃহকারক! তোমার স্বরূপ বুঝিয়াছি, তোমার বা আমার কোনই অস্তিত্ব নাই। দেহ-ঘরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যত্বের উপলব্ধি হয় এবং তৃষ্ণা দূর হইলে সমস্ত দুঃখ দূর হয়—জন্ম রহিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তও কবিতাতে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন—

"মঙ্গাবেদী ভেঙ্গে গেলে ধ্বংস সব হবে।
অংশ গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা হবে?
যখন ঘরামী এসে ঘর গেল গড়ে।
প্রকৃতি দিয়াছিল এই যায় পড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে ঢুকলাম একা।
এখন সে ঘরামীর কোথা পাই দেখা॥
ঘরামীর ঘর কোথা জানিনারে ভাই।
মিছা মিছা এথা সেথা খুঁজিয়া বেড়াই॥

*　　*　　*　　*

যাক যবে এঘর না রয় না রয়
আর যেন এঘরে ঢুকিতে না হয়॥" (দেহঘর)

সন্ন্যাসী ও দণ্ডীদের উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহাদের তপস্যা নিরর্থক বলিয়াছেন—

প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতেভূতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল বল এ জগতে মুক্তি কারে কয়॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থে বিশ্বামিত্র শূন্য হইতে যে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে—"বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, সেইদিন প্রথমতঃ ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন।" "এইরূপে সৌরজগৎ হইতে সৌরজগৎ, তাহার পর বহু সৌরজগৎ পার হওয়া নির্বাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংঘ, নিঃশব্দ, অতর্ক্য, অপ্রকল্প্য শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন, উহা অনন্ত, অনাদি গাঢ়, সুগভীর, অকূল, অতল, অসংখ্য, অপার আকৃতিহীন ভীমপারাবারবৎ। আর নক্ষত্রাদি নাই, ক্রমে ক্রমে তাহারা দূরতর হইতে লাগিল। আলোক ও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র মানুষবলে উঠিতেছেন না, তিনি যোগবলে উঠিতেছেন। সুতরাং এই কল্পনারও অগম্য স্থানে তাঁহার ভীতির সঞ্চার হইলনা বহুদূরে তিনি এই অগাধ অনন্ত মধ্যে যাইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোন অলক্ষ্যকেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্তক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণু রাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এই তাঁহার গন্তব্য-নীহারিকা বোধ হওয়ায়, তাহার সম্মুখে অতি দূরে আপন গতি রোধ করিলেন।

২

বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন,—অগাধ, অনন্ত ও শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি এই সকল নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশি মধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতি ক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জল-জন্তু সমূহ জলোন্মন্থনে ভীত হইয়া কাচস্বচ্ছ তড়াগের তলদেশে ত্রস্তভাবে কোন নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ড সমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রভাবিত হইয়া একস্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামত নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণাগতি সমুৎপাদন করিলেন। প্রত্যেক নীহারিকা আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণাগতি মুহূর্তে মুহূর্তে বর্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ, খর্ব খর্ব, নিখর্ব নিখর্ব, পরার্ধ পরার্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল, ততই পরমাণুসমূহ নিকটবর্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল। পরার্ধক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া চিরান্ধকার অনন্তগর্ভগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্তদিক্‌প্রসারী আলোক পরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে দেখিলেন, এ আলোক উত্তম হইয়াছে। তাঁহার সৌরজগতের নূতন সূর্য উত্তম হইয়াছে। কোটিকল্পেও ঐ অগ্নি নির্বাণ হইবেনা।” (হরপ্রসাদ রচনাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬-৪৮।)

এইরূপে সূর্যসহ নূতন জগৎ সৃষ্টি হইলে বুধ, শুক্র ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন এবং তিনদিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌরজগতের অনুরূপ সৃষ্টি

হইলে দেখা গেল আমাদের সূর্য ও পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্ট সূর্য ও পৃথিবী কোটি গুণ বড় হইয়াছে। তাহার বায়ু, জল, তৃণ, পশু, পক্ষী, মানুষ, বন, পর্বত, প্রভৃতি সৃষ্টি করা হইল। এই নূতন জগতে দুঃখ-দুর্দশা ছিল না, যুক্তিই ছিল একমাত্র উপাস্য দেবতা। সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। কিন্তু যখন বিশ্বামিত্রের নিজ রাজধানী কান্যকুব্জ নামক নগরকে তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে উঠাইয়া আনিতে গেলেন, তখন বিশ্বামিত্রের তপোবল শেষ হইল এবং ব্রহ্মার সহিত বিরোধের সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে তাঁহার সৃষ্টি শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র আপন সৃষ্টির বায়ু শূন্যপথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মার স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা আসিলে বলিলেন—আমার বায়ু শূন্যপথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দেও। ব্রহ্মা বলিলেন—সেই তপোবল তোমার নাই, আর তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দিবারও ক্ষমতা নাই। তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে গেলেন—পারিলেন না। তখন ক্রোধে অস্থির হইয়া গদা তুলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—যেইভাবে আছ, সেইভাবেই থাক, নূতন কার্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে। বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন, পরে গদা তুলিলেন। গদা তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার মহাবেগে গদা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাটল ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এই জন্য লক্ষ্য করিতেছেন আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নীহারিকা রূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকা সমূহ যে যেইদিক হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সে সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত গর্ভগহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনই

ক্ষীণালোকময় রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সমস্ত নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্তমধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিম্ব জলের' ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া গেল। যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে ভরা ভরা দেখা যাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে যে নূতন মনুষ্যের সুখ সাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মানুষও সব আবার অগঠিত পদার্থরাশি মধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড় পর্বত, সৌধ প্রাকার রাজপথ সমেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিত পদার্থরাশি রূপে পরিণত হইল। যে সমাজ বন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোট বড় ছিল না, যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য, তাহাও অনন্তগর্ভে নিহিত হইল।" (হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮)

তপোবলে শূন্য হইতেই সৃষ্টি হয় এবং তপোবলের অভাবে আবার শূন্যই সৃষ্টি বিলীন হয়—ইহার অপূর্ব বর্ণনা এই রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বিষ্ণু ও শিবকে উপাস্য দেবতা হিসাবে দেখাইয়াছেন, এমন কি জগদ্ধাত্রীর মূর্তিও দেখাইয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কালী' মূর্তিকে প্রাধান্য দিয়াছে—"কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা —এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।" বন্দেমাতরম্, গানের ভিতরেও দেশ মাতৃকার নিরাকাররূপ ও মহাকালের লীলাকে একসঙ্গে মিশাইয়া একটি ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে।

দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় রচিত 'শক্তি দর্শন ও শাক্ত কবি' গ্রন্থে কালীকে শূন্যত্বের প্রতীক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে রামপ্রসাদ রচিত দুইটি গানের উল্লেখ করা হইয়াছে—'মন তোমার ভ্রম গেল না।' 'মায়ের মূর্তি গড়তে চাই/মনের ভ্রমের মাটি দিয়ে।' "খড়্গধারিণী শশিসূর্যাগ্নিনেত্রা মুণ্ডমালী শক্তিকে মাটিতে রূপ দিতে

চাইনে, অনাদি ভ্রম দূরীভূত করে শূন্য রূপা সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছান প্রয়োজন।" (পৃঃ ১৬৭)

'জ্ঞানী গুরু' নামক গ্রন্থে নিগমানন্দ কর্তৃক 'আনন্দমঠের' ভাবধারার ব্যাখ্যা—

"সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিপুরুষ মূর্তিহীন, কেবল এক জ্যোতিঃ মাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদ নাদবিন্দুরূপে প্রকাশমান হন। নাদ ও বিন্দু সগুণ শিবশক্তি।" (পৃঃ ৪৮)

"বিষ্ণুমূর্তি—মহত্তত্ত্ব বা প্রকটচৈতন্য, এ দেশ চতুর্ভুজধারী নারায়ণ, অনন্ত বায়ুরাশি নীলবর্ণ দেখায়। ইনিও অনন্ত, তাই ইনি নীলবর্ণ। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, সৃষ্টির মূলীভূত জগৎকেন্দ্র নারায়ণের নাভিপদ্ম—একথা পূর্বে বলিয়াছি। নারায়ণের হস্তস্থিত পদ্মই সৃষ্টি ক্রিয়ার, গদা লয়ক্রিয়ার, শঙ্খ স্থিতিক্রিয়ার এবং চক্র (যাহা পলে পলে পরিবর্তিত) অদৃষ্ট ক্রিয়ার প্রতিমা। সূর্যগ্রহনক্ষত্রাদি তাঁহার অলঙ্কার-স্বরূপ। বিষ্ণুর দুই স্ত্রী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী আনন্দ ও সরস্বতী জ্ঞান বা চিৎস্বরূপা। ইনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তাই নাম বিষ্ণু।

এই মহত্তত্ত্বের স্ত্রীরূপ ভগবতী মূর্তি। ইহাই ভগবানের শক্তি-শরীর, দক্ষিণে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য সমষ্টি আনন্দরূপা লক্ষ্মী, বামে নির্মল জ্ঞানরূপা শুদ্ধসত্ত্বা চিৎশক্তি সরস্বতী, উভয়পার্শ্বে সর্বসিদ্ধিপ্রদ গণেশ ও দেবশক্তিরূপধারী কার্তিক।

কালীমূর্তি—সাংখ্যদর্শনের সগুণ ঈশ্বর বা প্রকৃতিপুরুষের প্রতিমা। সাংখ্যের মতে পুরুষ জড়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। তাই শিব শবাকারে পতিত, প্রকৃতি তাহাতে স্থির হইয়া জগৎব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন।" (পৃঃ ৪৯)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ধর্মীয় সংস্কার, রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা এবং সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির কোন অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় নাই—সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে সৃষ্টির মাঝে ক্ষণিকত্ব

ও আদিমধ্যঅন্তহীন শূন্যত্ব। আশাদাস 'বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"সত্য চিরস্থির শাশ্বত বস্তু নয়। যুগে যুগে অবস্থাভেদে তা পরিবর্তনশীল। আজ যা মানুষের কাছে সত্য বলিয়া দেখা দিয়েছে, আগামীকালের মানুষের কাছে তা আর সত্য থাকবে না। আবার অতীতে যা সত্য ছিল, আজকের মানুষ তাকে পিছনে ফেলে এসেছে। মানব জীবনের শেষপ্রশ্ন —সত্যের স্বরূপ কি? তা কি নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় অথবা চিরচঞ্চল গতিশীল? শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'-এ এই সমস্যা অতি গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে।"

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে সতীশ ও হরেন্দ্র যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন যে, ভারতের জ্ঞান ও প্রাচীনতত্ত্বই ভারতের প্রাণ, তখন কমল উত্তর করিলেন—"মানুষ যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা-প্রতিষ্ঠায়? নাইবা হলো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয়ত হবে। তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নরনারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন এই নবীন তুর্কীর দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষপরম্পরাগত পুরাণো পথটাকে সত্য জেনে আকড়ে ধরে ছিল, ততদিন হয়েছে তার বারংবার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে, তার সমস্ত আবর্জনা ভেসে গেছে, আজ তাকে উপহাস করে কার সাধ্য? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই দিয়েছিল তাকে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল এই বুঝি চিরন্তন—সত্য।" পৃঃ ২৮৯

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' দেখা যায় যে, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের মঙ্গল-সাধনের জন্য বিপ্লবের পথে চলিতে হইবে—কিন্তু এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তার উপর চাপাইয়া না দিয়া ধর্মীয় তত্ত্বের সঙ্গে বিপ্লবের একটা সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'পথেরদাবী'-তে বিপ্লবীর জীবন হইতে ধর্মীয় সংস্কারকে দূরে সরাইয়া দিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের সৃষ্টিকর্তার দোহাই দিয়া যে অত্যাচার চলে, তাহার বিরুদ্ধে সদম্ভ বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছে। ঈশ্বরবাদ বা দেবতাবাদ বিপ্লবের পথে বিরাট

বাধা। মানুষ জীবন ও সৃষ্টির সর্বস্তরে বাহ্যদৃষ্টিতে সন্ধান পায় আকৃতি ও প্রকৃতি (form and spirit)। এইরূপ বাহ্যের উপাদান দুইটিই মানুষকে মায়াপথে আবদ্ধ করিয়া রাখে—রূপজগতে মানুষ এই দুইটিকে সত্য বলিয়া মনে করাতে এই গোলোকধাঁধাঁ তাহাকে মূলতত্ত্ব অর্থাৎ অরূপ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে। শূন্যবাদকে অবলম্বন না করিলে মানুষের জীবনে পূর্ণ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না, বিশ্বের অশান্তি দূরীকরণের পথ বিপ্লবের ভিতর দিয়া আসিবে—ইহা একমাত্র শূন্যবাদীই উপলব্ধি করিতে পারে—তাই বিপ্লবী কখনও ঈশ্বর, দেবতা বা অদৃষ্টের দোহাই দেন না। 'পথের দাবী'তে বিপ্লবীর জীবন এইভাবেই চিত্রিত করা হইয়াছে—বিপ্লবী সব্যসাচী সম্বন্ধে গোয়েন্দা নিমাইবাবুর উক্তি—"ইহার বিরুদ্ধে কোন চার্জও নাই, অথচ যে চার্জও আছে, তাহা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর এবং পলিটিকেল বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক বুঝাইবেনা—তিনি রাজবিদ্রোহী।" সুমিত্রার বর্ণনা—"এদের না আছে দয়ামায়া, না আছে কোন ঘরদোর। এরা যে পথের মানুষ, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসাবের সঙ্গে এদের মিলেনা।" সব্যসাচী সম্বন্ধে লেখকের বর্ণনা—"কেবল আশ্চর্য সেই রোগামুখের অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি.......অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে......ইহার কোন্ অতল জলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।"

ভারতীকে সুমিত্রা বলিতেছে "ওই ওর যথার্থ স্বরূপ, দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই—এই পাষাণমূর্তি আমি চিনি ভারতী।"

বিপ্লব সম্বন্ধে শশীকে ও ভারতীকে সব্যসাচীর নিজস্ব উক্তি—"বিপ্লব কথা শুধু রক্তারক্তিই নয়—বিপ্লব মানে অত্যন্ত আমূল পরিবর্তন। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন-ধর্মসংস্কার, সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক।"

"—কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই—পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যে পরিহাস।"

যখন একে একে সমস্ত রকম বিপ্লবসংস্থাগুলি বিলীন হইয়া

যাইতেছিল, তখন সব্যসাচী বুঝিতে পারিলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন-শোষণ আর তাহার সঙ্গে প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি যে আনুগত্যরূপ প্রাচীর মানুষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে—তাই পরবর্তী কালে নূতন শক্তি লইয়া আবার আসিবে বিপ্লব—যখন মানুষ ঈশ্বর, দেবতা ও অদৃষ্টের শক্তিকে বিসর্জন দিয়া নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। সুতরাং আবার বিপ্লবের উদ্দেশ্যে শূন্যের পথে যাত্রা করিলেন চিরবিপ্লবী সব্যসাচী—"সেই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পংহীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে এবং অপরে বিরাট পাগড়ীর নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে, যথাসম্ভব নিজের মাথাটাকে বাঁচাইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছে"—

"নিমিষমাত্র। নিমিষমাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।"

ধর্মীয় সংস্কার সম্বন্ধে সব্যসাচীর উক্তি—"যে ধর্ম তারা নিজেরা মানত না, যে দেবতাদের পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিল না, তাদের দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদমস্তক যুক্তিহীন বিধিনিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে"।

"ভারতী ভীত হইয়া কহিল, যে ধর্মকে আমি ভালবাসি, বিশ্বাস করি তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল, দাদা?"

ডাক্তার (সব্যসাচী) বলিলেন—"বলি, কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবের এতবড় শত্রু আর নাই"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভিতর দিয়া আস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের দ্বন্দ্ব চলিতে চলিতে শেষপর্যন্ত নাস্তিত্ব সমর্থিত শূন্যবাদই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, শুধু তাহাই নহে—একদিকে নাস্তিত্বের ভিতরে নীতিবোধ এবং অপরদিকে ভক্তিবাদ সমর্থিত লীলারসের ভিতরে নীতিবোধের অভাব প্রকাশিত হইয়াছে। নাস্তিক জগমোহনের অনুগামী ছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ এবং নাস্তিত্বের আদর্শ ছিল নিঃস্বার্থভাবে লোকের মঙ্গল সাধন, যাহার ভিতরে পুণ্য, পুরস্কার বা দেবতার অনুগ্রহের কোন বালাই ছিল না। তিনি শচীশকে বলিলেন—"দেখ,

বাবা! আমরা নাস্তিক। সেই স্তরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। কিছুকেই মানি না বলিয়াই নিজেকে মানিবার জোর বেশি।”

কিন্তু জ্যেঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর শচীশের ভিতরে একটা দুর্বলতা দেখা দিল এবং সেইজন্য শচীশ লীলানন্দের দলে ভিড়িল—“সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবল বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, এত শূন্য—এত শূন্য কখনও হইতে পারে না, সত্য নাই এমন ভয়ঙ্কর ফাঁকা কোথাও নাই,—একভাবে যাহা ‘না’ আর একভাবে তাহা যদি ‘হাঁ’ হয়, তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।” শ্রীবিলাসের নিকট লীলারসের সম্বন্ধে শচীশের যুক্তি—“সে যে ছিল ডাঙ্গার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যেঠামহাশয় আমার হাত পা-কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এযে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাইত গুরু আমাকে এমন করিয়া চারিদিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন—আমি পা-টিপিয়া পার হইতেছি”।

দামিনীর প্রেমকেও শচীশ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে প্রেম একটা কালো ক্ষুধা—অল্পে অল্পে মানুষকে গ্রাস করে। লীলারস সম্বন্ধে দামিনী বলিয়াছেন—“তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কি তাহা তো আজ দেখিলে? না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান, তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, সরম নাই। এই সর্বনেশে নিষ্ঠুর রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কি উপায় তোমরা করিয়াছ?”

শেষ পর্যন্ত রূপের ভিতরে রসভোগের পথে সত্যের অভাব দেখিতে পাইয়া শচীশের ভিতরে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রসের উপভোগে রূপের ভিতর দিয়া মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে অসীমের পথে—অরূপের পথে—শূন্যতার পথে—

"আমরা শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের সেই অরূপের পথে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে আমরা বদ্ধ, তাই আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

"ওগো প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব চিরকাল ধরিয়া। বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোন বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমার বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, তোমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুবিলাম।"

"অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার,—এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।"

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দেবযান' নামক উপন্যাসের ভিতরে শূন্যময় পরলোকের এক মনোহর বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার ভিত্তিস্বরূপ শাস্ত্রোক্ত সপ্তলোক (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য) হইলেও লেখক যেরূপ অপূর্ব কল্পনা, নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাধারা ও ধীশক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

এই উপন্যাস জীবন ও জগৎ নিয়া একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেছে যে, বাসনার বিপাকে মন কতকগুলি প্রতিভাস রচনা করে এবং অবিদ্যাই এই বাসনার মূল। অবিদ্যাজনিত চাঞ্চল্য হেতু মন কালস্থান, জ্ঞাতাজ্ঞেয় এবং গ্রাহ্য গ্রাহকতার দ্বৈতরূপ কল্পনা করে, এই দ্বৈত কল্পনা উদকচন্দ্রের মত। কিন্তু যদি অদ্বৈত বোধ জন্মে, তবেই ঘটে নির্বাণপ্রাপ্তি বা মহাসুখোপলব্ধি। স্থূলদেহের অবসানের সঙ্গে একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধিযুক্ত লিঙ্গদেহ অবশিষ্ট থাকে "সপ্তদশৈকংলিঙ্গম্" (সাংখ্যসূত্র ৩/৯)। যেমন পাচক রাজার ভোগের নিমিত্ত পাকগৃহে ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করে, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরও পুরুষের (আত্মার) ভোগের নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকের গতি নির্ধারণ করে —"পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবৎ রাজ্ঞঃ"—(সাংখ্য সূত্র ৩/১৬)। যাহার যেমন কর্ম, সে সেইরূপ লিঙ্গদেহকে অনুসরণ

করে। সুতরাং ইহলোকের একমাত্র সত্য ও সুন্দর প্রেমই শূন্যলোকে শান্তির পথ সৃষ্টি করিতে পারে। যতীন ও পুষ্পের ভিতরে যে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেই প্রেমের যে নির্দিষ্ট স্থান ছিল কেওটার গঙ্গার ঘাট, পরলোকে তাহাদের মানস সৃষ্টি ছিল সেই শান্তিময় স্থান— পুষ্প বলিল—"পৃথিবীতে কেওটার গঙ্গার ঘাটের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু ছিল না। এখানে এসে কল্পনায় তাই সৃষ্টি করেছি"।

"একটি তরুণ দেবতা পুষ্পকে বলিতেছেন—তৃষ্ণাই পুনর্জন্ম বহন করায়। ভুবর্লোকে এদের ভাল লাগে না, সেখানে পৃথিবীর স্থূল বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না—সুতরাং ওরা চাইছে আবার দেহ ধরতে।" "উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান পথে উচ্চতরলোকে নিয়ে যায়। স্বঃ, জন, মহঃ, তপঃ ও সত্যলোকের কথা বলেছেন ভারতবর্ষের লোকেরা। এক কথায় সেখানে থাকে উচ্চতর জীবাত্মা।" পরলোকের একটি নারী যতীন ও পুষ্পকে বলিয়াছেন—"নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে, পুরুষে পারে না, নারী পাপের পথেও নিয়ে যায়। কারণ চিত্ত নদী উভয়তোমুখী – বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়।"

মানুষের মৃত্যুর পরে চিত্তলয় না হওয়া পর্যন্ত শূন্যতাবোধ জন্মে না, তাই যুগের পর যুগ ধরিয়াও বিদেহী আত্মা কোন স্থায়িত্বের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় না—শুধু ছুটিয়া বেড়ায়। এক বিদেহী আত্মার উক্তি "এতকাল ধরে বেগবান বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুততর গতিতে শূন্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সম্প্রতি নক্ষত্রের, গ্রহের, নানা জগতের ও বিভিন্ন লোকের গোলোকধাঁধার অরণ্যে দিশেহারা হয়ে এখানে শক্তিহীন, অবসন্ন ও বিমূঢ় অবস্থায় এসে পৌঁছেছি।"

পরলোকেও মায়ার আকর্ষণ আছে, শুধু রূপের ভিতরেই যাহারা প্রেমকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, অরূপ শূন্যত্বের আস্বাদন হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। ভগবদ্ভক্তির বাৎসল্যরূপে অর্থাৎ পৌত্তলিক গোপাল সেবার মধ্যে মায়ার আবরণে আনন্দময় বৈষ্ণব আচার্য রঘুনাথ দাস উচ্চআত্মা হইলে নির্বাণ বা মুক্তির আস্বাদন হইতে বঞ্চিত। যখন তিনি যতীন

ও পুষ্পের সঙ্গে আলোচনারত, তখন "মন্দির থেকে চঞ্চল মধুর কণ্ঠে বলে উঠল—ওখানে বকবক না করে, এখানে এসে একবার আমাকে জল খাইয়ে যাওনা বাপু। তেষ্টায় মলুম।"

যতীনের জিজ্ঞাসানুসারে একটি শূন্য জগতের সঙ্গী ধ্যান ধারণার সম্বন্ধে বলেন—"আমরা ধ্যান ধারণার দ্বারা জন, তপঃ ও সত্যলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আদান প্রদান চালাই। তাদের অদৃশ্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

—তাঁরাও কি আমাদের কাছে অদৃশ্য?

—সম্পূর্ণ। বিনা ধ্যান ধারণায় তাঁদের মত উচ্চজীবদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব নয়। আমাদের চোখে তাঁরা অত্যন্ত অদৃশ্য।

—তাঁদেরও ঊর্ধ্ব লোক আছে?

—আছে, অনেক আছে। সত্যলোকের ঊর্ধ্বতন স্তরের জীবেরাও ঐ লোকের নিম্নতর স্তরের জীবদের নিকট অদৃশ্য। তার ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক, তার ঊর্ধ্বে সর্বলোকাতীত পরব্রহ্মলোক বা গোলোক। তারও ঊর্ধ্বে নির্গুণ ব্রহ্মলোক—কিন্তু সেখানকার খবর কেহ দিতে পারে না—কেউ জানে না। এসব লোকের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—সাধারণ জীবেরা এসব লোকের খবর রাখেনা, তাদের কোন আবশ্যকও নেই এসবে।" এই বিবরণের ভিতর দিয়া শূন্যবাদোক্ত—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্যর সুর বাজিয়া উঠিয়াছে।

কবি বিহারীলালের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাব্যজগতে একটা নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটিল। বিহারীলাল আধুনিক গীতি কবিতার স্রষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উত্তর সাধক একথা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না। ইহার পূর্বে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতি কবিগণ যে খণ্ড কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—তাহা বস্তুপ্রধান, ভাবপ্রধান নহে, অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় কিছু কিছু দার্শনিক চিন্তাধারা আছে—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বিহারীলালের ভিতরে রোমাণ্টিক অস্পষ্টতা ও অনির্বচনীয়তা একান্ত হইয়া কবিকে শূন্যতার পথে পরিচালিত করিয়াছে এবং কবি যেন এক অনন্ত সৌন্দর্যশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। আদ্যাসুন্দরী সারদা যেন কবির দিকে হাস্যরাশি বিতরণ করিতে থাকেন এবং কবির মনে কখনও একটা অস্পষ্ট শূন্যতার আবির্ভাব ঘটে, আবার কখনও বা কুহকিনী রূপময়ী সৌন্দর্যের ছায়া ভাসিতে থাকে—

"যেন তারে হেরি হেরি,
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি,
রূপসী চাঁদের মালা ঘুরিয়া বেড়ায়।"

"ঐ যে আপন অন্তরে একটি ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বকীয় ভাবমন্ত্রের সাধনা—আধুনিক গীতিকাব্যে কবি বিহারীলালই তাহার প্রবর্তক, ঠিক এই ধরনের সাধনপদ্ধতি, আর কোথাও—কি ভারতে, কি য়ুরোপে—বাস্তব কবি জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না।"[1]

বিশ্বসৌন্দর্যের কোন স্পষ্টরূপ কবিচিত্তে প্রতিভাত হয় নাই, শুধু ভাবের ভিতর দিয়াই একটা সৌন্দর্যের অনুপ্রেরণা কবির হৃদয়ে আবির্ভূত এবং সেই শূন্যময়ী কবিপ্রতিভার নামই 'সরস্বতী'। শূন্যজগতের সেই কল্পনাপ্রসূত অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার যখনই অস্পষ্ট হইয়া উঠে, তখনই কবির প্রাণে নামিয়া আসে বিষাদের ধারা—**Romantic discontentment** :—

"হারায়েছি হারায়েছিরে সাধের স্বপনের ললনা।
মানস মরালী মোর কোথা গেল এল না।
কমল কাননে বালা
করে কত ফুল খেলা
আহা তার মালা গাঁথা হল না।
প্রিয় ফুল তরুগণ,
সুধাকর সমীরণ,
বল, বল, ফিরে কি আর পাব না?
কেন এল চেতনা!"

১। কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, মোহিতলাল মজুমদার, ১খণ্ড—পৃঃ ১৩

শূন্যপ্রসূত ব্যক্তিহৃদয়ের আকুতি খাঁটি সৌন্দর্য বিধুরতার স্বরূপে পরিণত হইয়া সারদার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—

"নাহি সূর্য চন্দ্র তারা
অনল হিল্লোল ধারা,
বিচিত্র বিদ্যুৎদাম দ্যুতি ঝলমল।
তিমিরে নিমগ্ন ভব
নীরব নিস্তব্ধ সব
মরুৎরাশি করে কোলাহল।"
"কায়াহীন মহাছায়া
বিশ্ববিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা রজনী রূপিণী।"

'সাধের আসনে' কবি তাঁহার কাব্য জগতের ধ্যানের বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতেছেন উপনিষদের ভাষায়—

"সেই দেশে তোমাদের বাস
সূর্য যেথা যেতে পায় ত্রাস।
বিচিত্র সে সৃষ্টি কার্য,
উদার স্বপন রাজ্য
সর্বদা পূর্ণিমা রাতি
চিরপূর্ণ চন্দ্রভাতি।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' (প্রভাত সঙ্গীত) কবিতার ভিতরে শূন্যতত্ত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। এই শূন্যতাকে বৌদ্ধ শূন্যবাদের অনুকরণে শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্যকে ব্রহ্মার উপাসনার ভিতর দিয়া—দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য ও মহাশূন্য নামে বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
সহসা আনন্দ সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদি দেব খুলিলেন নয়ান।"

গুরুদাস ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলাকাব্যে শিব'-এ (পৃঃ ১৭৭) এই কবিতার ব্যাখ্যা—"মহাশূন্যে ধ্যানরত ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল বেদগান। জন্ম হল আনন্দ ও প্রেম। বিষ্ণুর শঙ্খনাদে ধরা দিল উল্লাস, ছন্দিত হলো সৌন্দর্য। এই ভাবে কেটে গেল যুগান্তর। তারপর একদিন এল শ্রান্তি-অশ্রান্তি, বিক্ষোপ-বিলাস—আর নিয়মের পাঠ নয় 'সাধ গেছে খেলা করিবার' কামনা হল প্রার্থনা—'গাও দেব মরণসঙ্গীত, পাব মোরা নূতন জীবন।' জগতের আর্তনাদে মহাদেব জেগে উঠলেন—

'প্রলয়পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া—
জগতের আদি অন্ত থর থর থর থর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।'

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সমস্ত বন্ধন, গ্রহতারকারা মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে, ছন্দবেভুল জগৎ মেতে উঠল ধ্বংসের উন্মাদ আনন্দে, সৃষ্টির আদিতে ছিল অনন্ত অন্ধকার ; অন্তিমে রইল অসীম হুতাশন।

"অনন্ত আকাশ গ্রাসি অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিল মহাধ্যান।"

প্রলয়ের পটভূমিকায় রচিত কবিতা দুটিতে আধুনিক গীতিকবি তত্ত্বকথাকে পরিণত করিয়াছেন আত্মকথায়। প্রথমটিতে শিব ও শ্যামা সাংখ্যের তত্ত্ব, তন্ত্রের দেবতা শবরূপী মহাকাল নিস্পন্দযোগী, নৃত্যপরা মহাকালী স্পন্দিত চৈতন্য, স্থির সমুদ্রে অস্থির তরঙ্গ। কবির কাছে এই প্রতিমা প্রেমের পরিপ্রকাশ ; দুজনে মিলে দর্শনের সমগ্রতা, সৃষ্টি-প্রলয়ের নিত্যঅনিত্যের যুগলরূপ। আবার কবি যখন শিবের সঙ্গে অভেদ, তখন তিনি প্রেমিক ধ্যানী, দেবী তাঁর হৃদয়লগ্না। দ্বিতীয় কবিতায় শিব একক, ত্রিদেব অন্যতম, লয়ের বিধাতা, কালের অধীশ্বর। তিনি যতিপাতনের অবকাশে ছন্দকে দুলিয়েছেন, নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করেন ধ্বংস মাধ্যমে, মৃত্যুর আঘাতে জীবনকে দেন গতিশক্তিপূর্ণতা

ও সুন্দরতা। তিনি ধ্যান করেন প্রলয়ের প্রস্তুতিতে, লয় করেন নটরাজ মূর্তিতে, প্রলয়ান্তে আবার ধ্যানে বসেন নব সৃষ্টির উল্লাসে। মৃত্যু মাধ্যমে উল্লসিত হয় অমৃত।"

মোহিতলাল মজুমদার রচিত 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' (পৃঃ ১৯)—"কবি এখানে ধ্বংসের রুদ্ররূপ বর্ণনা করিতেছেন—তাহা সুন্দর না হইলেও সৃষ্টির পরিণাম তাহাই। ঐ ধ্বংসকেও বরণ করিতে হইবে, নহিলে নবসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিবে না।"

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সাধক কমলাকান্ত'-এ তান্ত্রিক ব্যাখ্যা—"তন্ত্র বলেন 'মাতৃভাবে গৃহীত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই আদ্যা শক্তি'। শক্তি, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রবি, চন্দ্র ও গ্রহগণ সকলেই শক্তির রূপ, যিনি এই নিখিল শক্তির রূপ দেখিতে পারেন না, তিনি তান্ত্রিক আদ্যা শক্তির রূপ বুঝিতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় তান্ত্রিক আদ্যাশক্তির অপূর্ব অনুভূতির ফলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব সকলের যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, তেমন বৈজ্ঞানিক মতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য,' 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'—কাব্যত্রয়ের ভিতরে যেন চিন্তাধারায় একটি ক্রমবিবর্তন চলিতেছে, একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতার সঙ্গে কবিজীবনের একটি আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে। "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাষায়—'নৈবেদ্যের' সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবধারা হচ্ছে সোপাধিক ঈশ্বরের মধ্যে নিরুপাধিক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, বন্ধনমুক্ত নির্বিশেষ সাত্ত্বিক সত্তার উপলব্ধি, নিরালম্বব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার সেই সনাতন বৈদান্তিক অভীপ্সা (স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান) নৈবেদ্যের মধ্যে কে দেখতে পায় না?"[১]

"তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ,
অপার সঞ্চারক্ষেত্র সেথা শুভ্রবাস।

১। রবীন্দ্র সাগরসঙ্গমে, বিভু মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৩

দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কোন বাণী।"

(নীড় ও আকাশ—নৈবেদ্য)

এইরূপে অসীম শূন্যতার অনুপ্রেরণাতে তিনি বাহ্যরূপের অন্তরালে পার্থিব জগতের ভিতরে যে গুহ্যরূপ ও অশরীরী তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, সেই নিঃসীম সত্যের সন্ধানে 'খেয়া' নৌকায় পাড়ি দিলেন। রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া শূন্য গগনে আলোক রশ্মির সন্ধান পাইলেন। দিনের আলো শেষ হইল, রহস্যব্যাকুল হৃদয়ে কবি 'বেলা শেষের শেষ খেয়া'র জন্য খেয়াঘাটে প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাত্রির অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়া কবি অভিযানে অগ্রসর—জানা না-জানার ও পাওয়া না-পাওয়ার রহস্যময় অনুভূতির ভিতরে কবি সুপ্তিতে অরূপস্পর্শ লাভ করেন, আবার জাগরণে অর্থাৎ বাহ্যিক চেতনাতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছেন। এই অবস্থার ভিতর দিয়া কবি অধ্যাত্মালোকের সন্ধান পাইয়াছেন—রূপলোকের ঊর্ধ্বে 'সবপেয়েছির দেশে' পৌঁছিয়াছেন, যেখানে সবকিছুই আছে, আবার সব কিছুই নাই অর্থাৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের বাইরে

"পা ছড়িয়ে বোসরে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায় ভরা আকাশতলে
সব পেয়েছির দেশে।

(সব পেয়েছির দেশ—খেয়া)

"রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার একটি মাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন হইবার পালা।"[১] "নৈবেদ্যে যাহা কেবল 'যেন' ছিল, যাহা আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার বস্তু ছিল, খেয়ায় কবি তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু সে সন্ধান খুব স্পষ্ট নয়। স্বপ্নের মধ্যে আভাস-ইঙ্গিতে কবি জীবনদেবতার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু যেটুকু পরিচয়

১। রবীন্দ্র সরণী, প্রমথনাথ বিশী ভূমিকা।

পাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি দেবতাকে বরবধূ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। 'নৈবেদ্য' হইতে 'গীতাঞ্জলিতে' পৌঁছিতে 'খেয়া' মধ্যপথ"।[১]

রবীন্দ্রনাথ যে সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার রূপও আছে, আবার অরূপও বলা যায়, প্রকাশ থাকিলেও নির্বাণের মত, কায়াও আছে, কায়ার অস্তিত্বও নাই, আলো আছে, কিন্তু ছায়া নাই—

"সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর॥
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।"

(সীমার প্রকাশ—গীতাঞ্জলি)

"রবীন্দ্রনাথের কবিমন সীমা ও অসীমে বিপরীত কোটিতে আহত হইয়া ঘড়ির গোলকের মত দুলিতে থাকে, আর এইভাবে দুলিতে দুলিতে সে অগ্রসর হইয়া যায়—কোথায় যায় ভাল করিয়া নিজেও সে জানে না, তবে আভাসে সে জানে 'হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোন খানে'। কোন্ খানে? হয়ত সীমা ও অসীম মিলিত হইয়াছে সে রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়লোকে।"[২]

সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, শূন্য ও আকাশ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব জ্ঞাপক দ্বন্দ্বের কোন প্রকার মীমাংসা করিতে না পারিয়া উপনিষদের ভিতরে কবি এই তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন অর্থাৎ একত্বের ভিতরেই শূন্যত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন এবং 'প্রণব' (ওঁ) ধ্বনির অর্থ প্রণিধান করিলেন—

"হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

১। রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে, বিশু মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২২০

২। রবীন্দ্র সরণী—প্রমথনাথ বিশী, ১৬৬

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া"
(গীতাঞ্জলি—ভারততীর্থ)

এইখানে কবিত্বের ভিতর দিয়া ঋষিত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়—"ঋষির কার্যের ন্যায় কবির কার্যের ফলও যেন উদ্দীপনা। যে সৌন্দর্যবোধ তোমার আমার সকলের অন্তরে অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহা প্রকৃত কবির সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। —ঋষি ও কবি উভয়ের কার্য এত সন্নিকট যে, ঋষি এক সময় কবি এবং কবি এক সময়ে ঋষি। ঋষি সসীম জগতের অন্তরালে অসীম জ্ঞান ও শক্তি দেখেন, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে এক জ্ঞানবস্তুর আভা দেখিতে পান, কবি সৃষ্টিজগতের সর্বত্র সৌন্দর্য ও প্রেম দেখিয়া থাকে।। এই কারণেই দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালের অর্থাৎ লৌকিক ও পারমার্থিকদের মধ্যে বর্তমান সুস্পষ্ট প্রাচীর যতদিন উত্থিত হয় নাই, ততদিন ঋষিত্ব ও কবিত্ব একসঙ্গে মিলিয়াছিল। প্রত্যেক ঋষিই কবি এবং প্রত্যেক কবিই ঋষি ছিলেন"।[১]

গণিতশাস্ত্রের সূত্রে দেখা যায় - x = 1

এই সূত্র লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, শূন্যত্বই একত্ব এবং একত্বই শূন্যত্ব—$1^1 = 1$ আবার $1^0 = 1$ $\therefore$ 1=0 অথবা 0=1.

ঋষিত্বের ও কবিত্বের স্বপ্নে বিভোর কবির মন ভাবজগতে সতত সঞ্চরণশীল—কখনও রূপের পশ্চাতে সৌন্দর্যের সন্ধানে ধাবমান, কখনও রূপ জগতের সৌন্দর্যের অসারত্বের অবসাদে কবিহৃদয় অসীমের সন্ধানে ছুটিতে থাকে। তাই কবি বহুত্বের ভিতরে দেখিতে পান একত্ব এবং একত্বের ভিতর উপলব্ধি করেন শূন্যত্ব

জগৎ ও জীবনকে জানিবার দুইটি পথ—জাগতিক দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। একটির সীমা আছে, অন্যটি অসীম—মন ও বুদ্ধির সহায়তায় দেখা ও উচ্চতম চৈতন্যের সাহায্যে দেখা। মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইলে সমস্ত বৃত্তি একমুখীন অবস্থায় বিক্ষেপশূন্য, শান্ত

১। রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে, বিশু মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২২০

ও সমাহিত হয়—ইহা অধ্যাত্মদৃষ্টি। এই শূন্যতার ভিতরে যেন একটি নিরলস অখণ্ড রাগিণী রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে এমন একটি দিব্য চেতনা, যাহার স্পন্দনে অনন্ত কোটি প্রাণবুদ্বুদ মুহূর্তে প্রকাশ পাইতেছে, আবার মুহূর্তে বিলীন হইতেছে—

"যে শুনেছে সেই অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয় তরণী—
জানে না আপন জানে না ধরণী,
সংসার কোলাহল।"

(পুরস্কার—সোনার তরী)

"বিশ্বে শুধু রূপ, তেমনি রসবোধশূন্য একটি বিচ্ছিন্ন সুর, সুরের সহিত সুরের বৈচিত্র্য সংঘাত। সে বিভীষিকায় হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে বিশুষ্ক হইয়া উঠে। সাধনার ভিতর দিয়া মানুষ যখন সকল রূপকে অরূপের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া দেখিতে সমর্থ হয়, তখন জগতের অমৃত রূপটি স্বতই ফুটিয়া উঠে, মুক্তির বোধে মানুষ চিরকালের জন্য বাঁচিয়া যায়।"[১]

সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, দেশকাল ও দেশকালাতীত, চিরস্থির ও চির-গতির যুগ্মসাধনার ফলে যে উপলব্ধির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—ভাব ও বস্তু, প্রয়োজন ও মুক্তলীলা, বর্ণনাত্মক ও আধ্যাত্মিক—এই উভয় লোকের সম্বন্ধ। তাই আরম্ভ হইয়াছে কবির 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'—

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।
বলো কোন্ পারে ভিড়াবে তোমার সোনার তরী।"

শূন্যের পথে যাত্রা করিয়াছেন কবি, আজও সত্তার সন্ধান মিলে নাই—মিলনের তরে প্রাণ আকুল—

"কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।"

১। রবীন্দ্র পরিচয়, মনোরঞ্জন জানা, পৃঃ ১৫

ইতিমধ্যে শূন্যের ভিতরে কবি প্রেমের সন্ধান পাইয়াছেন, সৃষ্টিকে প্রেমের রূপান্তর রূপে দেখিতেছেন। রূপের ভিতর দিয়া প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে রূপ ও প্রেম অরূপে পরিণত হয়। অনন্ত শূন্যে আবার আরম্ভ হয় 'নিরুদ্দেশের যাত্রা'। শূন্যের ভিতর আরম্ভ হয় প্রেমের মন্ত্রজপ. অনন্তকাল ব্যাপিয়া মহাকাশের এই ভাব ও রূপের খেলা চলিতেছে. মানসসুন্দরীর সন্ধান পাইতেছেন—

"এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি।" (মানসসুন্দরী)

"মহাশূন্য হইতে আলোর ধারা দুকূলপ্লাবী বন্যার মত যে অবিশ্রান্ত ধারায় নামিয়া আসিতে থাকে, আর তাহারই সঙ্গীতে সঙ্গীতে বিচিত্র রূপতরঙ্গরেখা অন্তহীন হইয়া ফুটিয়া উঠে, তেমনি কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে প্রাণের স্রোত নিত্য নামিয়া আসিতেছে আর তাহারই সঙ্ঘর্ষণে চতুর্দিকে সংখ্যাতীত সত্তার মহান উল্লাস বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সৃষ্টিতে কোন্ আদিম যুগে প্রাণের এই লীলা শুরু হইয়াছিল?

প্রাণের এই লীলায় মৃত্যু আছে, সত্তার বিনষ্টি আছে। কিন্তু এই মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুর শূন্যতা পূর্ণ করিয়া নিত্য নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটিতেছে। মৃত্যু যদি না থাকিত, রূপ যদি গতিহারা হইত, তবে মুহূর্তের মধ্যে বস্তুর পাষাণপিণ্ডিতলে প্রাণ মহান আর্তনাদ তুলিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইত। রূপ নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াই তো অরূপের অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করিতে পারে। রূপ স্থির থাকিলে অরূপের অনির্বচনীয়তা হারাইয়া মুহূর্তে কালো হইয়া যাইত।"

"রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশি মৃত্যুর রন্ধ্রে সেইমতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।"[১]

১। রবীন্দ্র পরিচয়, মনোরঞ্জন জানা, পৃঃ ৮৯৮

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা'-তে রাজা কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

"যে প্রভু বিশেষরূপে বিশেষস্থানে বিশেষদ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশের সকল কালের, আপনার অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" (পৃঃ ১৩৫)

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে রাজার গলায় দিলে মালা—তারপর সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে—পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে বিষম অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি পাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমাদের যা কিছু সৃষ্টি করছে, তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি, তবে শেষকথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।" (পৃঃ ১৩৪)

সৃষ্টি ও স্রষ্টার নিত্য সম্বন্ধটি প্রেম। প্রেমের আস্বাদন ঘটে মানবিক ভিত্তিভূমি হইতে মানবীয় রসে এবং এই রস সম্ভোগের প্রবৃত্তি ও আস্বাদন অনুসারে তাহা বিচিত্র গতি প্রাপ্ত হয়। প্রেমের বন্ধনেই তত্ত্বের স্বরূপ আচ্ছাদিত এবং প্রেমের সার্থকতার ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। 'বলাকা' কাব্যে 'ছবি' নামক কবিতাতে দেখা যায় যে, অন্ধকারের ভিতর দিয়াই ঘটে তত্ত্বোপলব্ধি—

"তোমারে পেয়েছি কোন প্রাতে,
তারপর হারায়েছি রাতে।
তারপর অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও তুমি ছবি, নও তুমি ছবি।"

রাণী সুদর্শনা অন্ধকারে রাজার বাহ্যিক রূপ দেখিতে না পাইলেও তিনি বিচিত্রের মধ্যে, বহুত্বের মধ্যে রাজার রূপ অনুভব

করিতেন। ঋতুর পরিবর্তনের মধ্যে রাজার রূপের পরিবর্তন ঘটিত এবং প্রত্যেকটি রূপকে রাণী অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন। নববর্ষের মেঘময়রূপ, শরতের শুভ্ররূপ এবং বসন্তকালের বাসন্তী সৌন্দর্যের মাঝে সুদর্শনা দেখিতে পাইতেন স্বরূপতত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই রাণী অরূপ শূন্যমূর্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। রাজা বলিতেছেন—"এত বিচিত্র রূপ দেখেছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে একটা বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মত না হয়?"

মায়াময় জগতে জীব কোন একটা বিশেষ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইলে মায়াময় রূপকে প্রত্যাখ্যান করে, তাই সুদর্শনা রাজার মহাশক্তিশালী বিশ্বরূপের পরিবর্তে সুবর্ণের বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হন—রানীর উক্তি "তোমার মুখের উপর আগুনের ছায়া লেগেছিল—আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে, সেই আকাশপথের মত তুমি কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।" বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু তিরপিত নাহি ভেল।"

রবীন্দ্রনাথও সেই সুরে সুর মিলাইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনের অসীমরূপ প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহারই নাম সৃষ্টি। মানুষ মায়া-জগতে রূপের পূজারী, শুধু তাহাই নহে, একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়াই সে জগতে আবদ্ধ থাকে এবং সেই বিশিষ্ট রূপকে অবলম্বন করিতে না পারিলে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। রাজবেশী সুবর্ণের মুখ দিয়াও এই তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছিল—"সাধারণ লোকের জন্য সত্য হোক, মিথ্যা হোক—একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে।"

পিতৃগৃহ হইতে প্রত্যাগমনের পর রাজার সহিত সুদর্শনার মিলন ঘটিলে, তিনি হৃদয় দিয়া রাজার অস্তিত্বকে ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিলেন। সেই অরূপের সহিত কোন রূপের তুলনা দেওয়া যায় না—

"রাজা—তোমার মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা—যদি থাকতো, তবে সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আমার রূপ দেখতে পাও। সে আমার কিছু নয়, সে তোমার।"

এই অনুপম অরূপ শূন্যত্বের উপলব্ধি ঘটে প্রেমে। সুদর্শনা মধুর প্রেমের পথে সুরঙ্গমার বুদ্ধিপরিচালনায় উহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঠাকুর্দা বিশ্বপ্রেমের বলে এবং কাঞ্চীরাজ অস্তিত্বহীনতার গবেষণার ভিতর দিয়া এই প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী' কবিতার ভিতরে বিদ্রোহের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। ভাবচেতনাময় গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভোগবাদ এবং সন্ন্যাসজীবনের ত্যাগের আদর্শ—এই দুইটি চরম বিস্ময়কর, শূন্য হইতে সৃষ্ট এই জগৎ। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যের ভিতরে অবস্থিত মধ্যপন্থা অবলম্বনে শূন্যতে প্রতিষ্ঠা লাভ বা নির্বাণই সুখময় অবস্থা—

"জন্ম যদি হয়ে থাকে অন্ধকার শূন্য হতে লভি এই কায়া,
ব্যর্থ কর অদৃষ্টের মায়া।

নামহীন ধামহীন পরিচয় বহিয়া পশ্চাতে,
সম্মুখে সে বিসর্জন অন্তহীন তামিস্রার রাতে,—
দণ্ড দুই দেহ ধরি' পূর্ণ অবতার,
সুখ দুঃখ পুণ্য পাপে যথা অধিকার।
—তৃপ্তি নাই তবু তাহে? হা অভাগ্য আত্মঘাতী কাল ক্রীড়নক
মূর্খ মানবক!"

"কারে চেয়ে ঠেলে দাও প্রসাদ পরমায়, হে চিরভিখারী?
আনন্দের ক্ষণ অধিকারী।
মহাশূন্যে ফিরে যেতে একি তোর প্রাণান্ত প্রয়াস।
সে যে তোর নিত্য সত্তা, সে যে তোর অন্তিম আবাস।"

(মোহিতলাল কাব্যসম্ভার—পৃঃ ১২৫, ১২৬)

'স্মরগরল' কাব্যের অন্তর্গত 'নারীস্তোত্র' কবিতার ভিতরে কবি

নারীকে প্রকৃতির প্রতীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, শূন্যরূপা প্রকৃতির বিভিন্নশক্তি নারীদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ধূমাবতী, কমলা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যাও নারীদের ভিতর দিয়াই প্রকৃতি পরিবেশন করিয়াছে। তাই নারীকে চিরপ্রহেলিকা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—যাহার রহস্যের সন্ধান আজও কেহ পায় নাই—

"সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী—কালস্রোতে কমলাসনা—
মুহূর্তে খণ্ডিত রূপ মোর মুগ্ধ নয়নের আগে;
হরিণু সে বিশ্বধাত্রী, লবে করে তাবি উপাসনা.
জন্মমৃত্যু বাঁধা আছে পায়ে তার অন্ধ অনুরাগে।
সে যে চির উদাসিনী, তবু তার নয়ন পরাগে
কামনার মধুগন্ধ, সেইদীপে এদিকে থাকিত
সুন্দরের—মূর্তি যার আপনারো কামরূপে জাগে।
প্রকৃতির প্রাণরূপা স্বতস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী ওগো, নিত্যাশুদ্ধা—নহে সতী নহে সে অসতী।"

দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় রচিত 'শক্তিদর্শন ও শাক্তকবি' পুস্তক হইতে উক্ত বিবৃতির সমর্থনে উদ্ধৃত—

"মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি;
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে রহাস পত্যা বিহরসে।" (আনন্দ লহরী—৯)

"হে ভগবতি! তুমি মূলাধারচক্রেস্থিত পৃথিবীতত্ত্ব, মণিপুর-চক্রেস্থিত জলতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানচক্রেস্থিত বহ্নিতত্ত্ব, হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহত-চক্রে অবস্থিত বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধচক্রে অবস্থিত আকাশতত্ত্ব সকল কুলপথ (সুষুম্না) ভেদ করে সহস্রদলপদ্মে পতি পরমশিবের সঙ্গে একান্তে বিহার কর।" (পৃঃ ২৬৮)

তাই কবি এখানে মহাকালের বক্ষে পদ্মোপরি প্রকৃতির প্রাণরূপা

নারীকে সৃষ্টির মানসলক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কবির মতে নিত্যশুদ্ধা স্বচ্ছন্দস্বৈরিণী প্রকৃতির প্রতীক নারীর সতীত্ব বিচার ভ্রমমাত্র।

আধুনিক সাহিত্যে অবধূত রচিত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এর ভিতরে দেখা যায় যে, সমস্ত রকম দেবদেবীর মূর্তির উপাসনা ও নানাবিধ তীর্থ দর্শনের ভিতরেও মানুষ কোন রকম আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে অথবা উপলব্ধির দৃঢ়তা সম্পাদনে অক্ষম হইয়া শূন্যতাকেই মহা আনন্দময় বলিয়া বিশ্বাস করে।

"ভাব ও অভাব—দুইটি জিনিষের ভিতরে ভাব ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল আর অভাব চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়—

'ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতম্'।

কি করছি?

আবার সেই রোগে ধরেছে—ভাববৃত্তি, দূর দূর ঝাড়ু মার ঐ ভাববৃত্তির মুখে। নীলকণ্ঠের পরিচয় দিতে গিয়ে ভাববৃত্তিরোগে পেয়ে বসল। ভুলেই মেরে দিয়েছি—নীলকণ্ঠ মহাশূন্যতার প্রতীক।"

(পৃঃ ২৯২)

ঊর্ধ্ব অধঃ সমস্তই মহাশূন্যতায় পূর্ণ হয়ে গেল, আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল, তখন অনুভব করিলেন নীলকণ্ঠের তত্ত্ব, আনন্দ ও শূন্যতার সমন্বয়। তাই উপসংহারেও ইহাকেই প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি (পৃঃ ২৯৪)

"আর ঐ কালী হচ্ছেন মহাকালের শক্তি। মহাকালের বুকে যখন শক্তির খেলা শুরু হল, যতক্ষণ ঐ শক্তির খেলা চলল, মহাকালের বুকে ততক্ষণ সৃষ্টিটা চলল। যেদিন থামল ঐ মহাশক্তির খেলা, সেদিন সব শেষ, পড়ে রইল সেই মহাকাল, যে কালের আদি নেই, অন্ত নেই।

আমাদের উপাস্য দেবতা হল মহাকাল, বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা মহাশূন্যতা।

মহাকাল আর মহাশূন্যতার তফাৎটা কোথায়?

আমাদের মহাকালকে উপলব্ধি করতে হলে প্রজ্ঞাশক্তির সাধনা করতে হবে। মহাশক্তি কালী সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ। মহাশূন্যতাতে প্রজ্ঞাশক্তির সাধনা করতে করতে সাধক এবং প্রজ্ঞাশক্তি এক হয়ে যাবে।

সাধক হল বুদ্ধ, তিনি জানতে চাচ্ছেন। যা জানতে চাচ্ছেন তার নাম প্রজ্ঞা। জানবার জন্য যে শক্তির সাধনা করছেন, তার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা, জানা হওয়ার পরে যা হয়ে থাকে, তা হল ধ্যানী বুদ্ধ, জানবার আগে যা থাকেন, তার নাম বোধিসত্ত্ব। ধ্যানী বোধিসত্ত্বের মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে প্রেম ও সমবেদনা। ধ্যানী বুদ্ধ প্রেম ও সমবেদনার ঊর্ধ্বে। ধ্যানী বুদ্ধ মহাশূন্যতার মূর্ত প্রতীক, সাক্ষাৎ মহাকাল, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—তিনটি গুণ, তার নাগাল পাওয়া যায় না।" (পৃঃ ২৪৭)

বেদ সমর্থিত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টির উৎসস্বরূপ প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক বিষয়াবলম্বনে প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষের ভিতরে তিনটি কর্মগত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সাত্ত্বিক গুণবিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ও দার্শনিক শ্রেণীর নাম ছিল 'ব্রাহ্মণ', রাজসিক গুণসম্পন্ন যুদ্ধপ্রিয় ও শাসনকার্যে সমর্থ শ্রেণী ছিল 'ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত এবং তামসিক গুণশালী কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্যে দক্ষ শ্রেণীর পরিচয় ছিল 'বৈশ্য' নামে। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ও পারিবারিক স্বার্থের খাতিরে এই শ্রেণীভেদের ভিতরে যে জটিলতার সৃষ্টি হইল, তাহা পরিহার করার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে তিনটি জন্মগত জাতিভেদ সৃষ্টি হইল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রত্যেক সন্তানই সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হইলেন না। সুতরাং রাজসিক গুণশালী ব্রাহ্মণ সন্তানগণ নেতৃত্ব ও জিঘাংসাবৃত্তির প্রেরণায় পবিত্র বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুবলি, নরবলি, প্রভৃতি প্রবর্তন

করেন এবং তামসিক গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান ও শক্তির অভাবে ভক্তিবাদকে গ্রহণ করিলেন এবং বৃক্ষ, পাথর ও দেবতার মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থাকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরবাদ ও দেবতাবাদকে অবলম্বন করিয়া দেবার্চনার ব্যবসায় প্রবর্তন করিলেন। এমতাবস্থায় সাত্ত্বিক গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণসন্তানগণ সমাজ বা রাষ্ট্রে বিশেষ পাত্তা না পাইয়া অরণ্যে বসিয়া ধ্যানধারণাতে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করিলেন—যাহা ভারতের চিরন্তন গৌরব। এতদ্ব্যতীত সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক নামক ষড়দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইল এবং এই ছয়টি দর্শনের ভিতরেই পরোক্ষভাবে প্রকৃত সত্য 'শূন্যত্বকে' প্রচার করা হইয়াছে। যেহেতু চার্বাক নামক দার্শনিক ঈশ্বরবাদ ও দেবতাবাদের বিরুদ্ধে ও ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাই ষড়দর্শনের ঋষিরা প্রত্যক্ষভাবে 'শূন্যত্বের' প্রচার করেন নাই—দার্শনিক চিরকালই সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বলিস্বরূপ, ইউরোপেও দার্শনিক সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

আজ ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক 'সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরবাদ, দেবতাবাদ, ধর্মীয়সংস্কার ও অদৃষ্টের দোহাই দিয়া যে দেশে জাতির আপাদমস্তক যুক্তিহীন বিধিনিষেধের সহস্রপাকে বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই দেশে গণতান্ত্রিক 'সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সুতরাং ষড়দর্শনের (সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক) পরে ভারতে 'শূন্যবাদ' নামক 'নূতন দর্শন' বাংলা সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বনে বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত হইল। এই দর্শন শুধু ভারতবর্ষে নহে—সমগ্র জগতে একদিন গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ বিরাজিত থাকিবে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
১	পাদটীকা	বাংলা সাহিত্যের	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের
৩	পাদটীকা	শশীভূষণ	শশিভূষণ
১২	২৩	সংত্তেব	সদেব
২০	২৬	শূণ্যবাদ	শূন্যবাদ
২১	৫	বহ্মুত্ব	বহুত্ব
৩১	১৭	লোকবৎলীল	লোকবৎলীলা,
৩২	১২	ঈশ্বরে	ঈশ্বরঃ
৪০	৬	জিঙ্গলা	পিঙ্গলা
৫২	২৮	ভুসুকপাদ	ভুসুকুপাদঃ
৫৫	১৮	তজন্ননো	তজ্জন্মনো
৫৯	২৩	বিপর্যয়াত্তুষ্টি	বিপর্যয়াত্তুষ্টি
৬৪	১৪	পানে	সানে
৭২	১৩	Vareity	Vaucity
৭৪	২৪	গুন্তরীপাল	গুণ্ডরীপাদ
৭৫	২	দীন্দ্রিয়	দ্বীন্দ্রিয়
৮১	১৯	ভাপ্তি	তান্তি
৮৩	২৩	পঞ্চসন্ধ	পঞ্চস্কন্ধ
৮৬	৪	চতুর্ধানন্দ	চতুর্থানন্দ
৯১	১২	মহার	মহীধর
১১১	পাদটীকা ২	মূলপ্রকৃতির্বিকৃতির্ম	মূলপ্রকৃতিবিকৃতির্মহতাদ্যা
১১৮	২০	ভাষে	ভাবে
১৩১	২১	জ্ঞানাধিসমা	জ্ঞানাধিগমা
১৩১	৮	নিমন্তক	নিমন্ত্রণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি		শুদ্ধ
১৩৫	৫	সহস্রের	সহস্রারে
১৫১	১০	সার	যার
১৬৩	১৩	দেবদেবা	দেবদেবী
১৮৮	২৩	পঞ্চাশ	পঞ্চদশ
১৯০	১৯	ভ্রষ্টুঃ	স্রষ্টুঃ
২০৭	১৫	নিসংখ	নিঃসঙ্গ
২১৭	২৭	হইলে	হইলেও
২২৫	১৬	x°	$(x^{\circ} - 1)$

নির্ঘণ্ট

ওঁ—১১, ১৩৫, ১৫৭, ১৬৩, ১৮১ ২২৭

অগ্নি—২

অতিশূন্য—২৪, ২৫, ২৮, ৮৪, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১৪২, ২১৮, ২২০

অদ্বয়—৪২, ১২৩

অথর্ববেদ—১, ১২৬

অথর্বাঙ্গিরস—১

অদ্বয়বজ্র—১৬, ৩৫

অদ্বৈত—৮, ৩১

অবধূতি—৬৬, ৬৭, ৬৮, ৯৮, ১১৫

অবিদ্যা—৬, ৪৮

অন্তরস্থায়ী—৫৮

অবধূত—২৩২

অনাহত—৪১, ১৩৫, ১৭০, ১৯৪৭ ১৯৬

অব্যক্ত—১০

অভূতপরিকল্প—২৫

অশ্বঘোষ—১০

অশক্তি—৫৮, ৫৯

অসম্প্রজ্ঞাত—২০৩

অষ্টাঙ্গযোগ—১২, ২৮, ৪৪, ৬১

অষ্টধাতু—১৪১

অষ্টশক্তি—১০৯, ১১২

অহঙ্কার—৫১

অসৎবাদ—৩৩

আজ্ঞাচক্র—৩১, ৪১, ৩৫, ১৭০, ১৯৬

আদ্যচক্র—১৭০

আদ্যাশক্তি—১, ৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৮

আদিনাথ—১৬৫

আধ্যাত্মিক—৬, ১১, ৯৩

আধি দৈবিক—৬, ১১, ৯৪

আধি ভৌতিক—৬, ১১, ৯৩

আনন্দমঠ—২১১

আলোক—২৫

আলোকাভাস—২৫, ৯৯, ১০৮

আলোক জ্ঞান—১৪, ১৫

আলোকোপলব্ধি—১৫ ১০৮,

আলয় বিজ্ঞান—১৪, ১৯, ২০

আসন—৬৩, ১৬৬

ইড়া—৪০, ৪১, ১৩৬, ১৩৯, ১৯৫, ২০১

ঈশ্বর গুপ্ত—২০৬

উপনিষৎ—৪, ১২, ৪৭

উপায়—৮, ১৯, ৮৪, ১০০, ১৩৭

উল্‌কাই—১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৮৭

কঠোপানিষৎ—৪৭

কনাদ—১২

কপিল—৫৪, ৫৭, ৫৮, ৮৫

করুণা—৫, ৮, ৩৫, ১০৯

কঙ্কনপাদ—১২৩, ১২৪

কাল—৪৯

কালচক্রযান—৩৭

কায়সাধনা—৩৯

কুক্কুরীপাদ—১৬৫, ১২৮

কুম্ভক—৬৫, ১৪৫
কাহ্নপাদ—৬১, ৭৬, ৮১, ৮৯, ১১৭
কোলিংদের সূত্র—৫৭
কৈবল্য—৫৩, ১২৩
কৃষ্ণাচার্যপাদ—৯৫, ১১৩, ১৩৩
কমলাকান্ত—১৯৫
কূর্মমূর্ত্তি—১৭৮
কূর্মচক্র—১৭৯
কুণ্ডলিনী—২, ৩, ১৩৮, ২০১ ২০৩
কেনোপনিষৎ—২
গুণেরমানুষ—১৪৭
গৌতম বুদ্ধ—৫, ১৪, ১৫, ১৮, ১১৬
গ্রাহ্য গ্রাহক—২৫, ৪৮, ৬৫
গ্রন্থিভেদ—১৬৭, ১৬৮, ১৬৯
চমন—৫০
চণ্ডীদাস—১৩৫
চাটিল—৫৪, ৫৭, ৫৮
চিত্রিণী—১৪৪, ২০১
চতুর্থানন্দ—১২৩
ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৪, ১২
জন—২৯ ৩৯
জবরুত—১৪৯
জালন্ধরীপাদ—১২৪
জৈমিনি—৩১
জ্ঞানমুদ্রা—৯৭, ৯৮
তথতা—১৬, ১৭, ১১৩
তপঃ—২৯, ৩০, ১৬৯
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—৫০
ত্রিকায়—১৫
ত্রয়বিংশতিতত্ত্ব—১০
দশভূমি—৭
দাম্রিক—১০৫, ১০৬
দাদূ—১৩২
দেবযান—৩৮, ২১৬
দ্বৈত—৩১
ধমন—৫০
ধর্মচক্র—৩, ১৭, ৮১
ধর্মপুরাণ—১৭৬
ধর্মমঙ্গল—১৭৬
ধারণা—৭৫, ৮৩, ৮৪, ৮৫
ধ্যান—৮৪, ১৬৬
নবচক্র—১৬৯
নাগার্জ্জুন—৯, ১২, ২১, ৭৮, ৮৯
নাড়ীভেদ—২, ৯,
নাছুত—১৫
নিয়ম—৬২, ১৬৬
নৈরামণি—৩, ১০১, ১২৫
নির্মাণচক্র—৩, ১৫, ৮১
পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব—১১, ৩৪
পরকীয়া—১৭১, ১৭৪, ১৯০
পঞ্চমবেদ—১৫৭, ১৬৩, ১৬৪
পঞ্চস্কন্ধ—১৫, ১১৭
পঞ্চঘাট—১২২
পরতন্ত্র—২৫
পরিনিষ্পন্ন—২৫
পাতঞ্জল—৪, ৬, ১১, ২৭, ৩৮, ৬১, ৭২, ৯৯, ১০৮, ১৯০
পিঙ্গলা—৪০, ৪১, ১৩৬, ১৩৯, ১৮৩, ১৯৯, ২০১
পিতৃযান—৩৮

পুরুষ—১৬, ৩৪, ৫৬
পূরক—৬৫, ১৪৫
প্রকৃতি—২, ৬, ১০, ১১, ১৯, ৩৪, ৫৩, ৯৩, ১৫৪, ১৭৮, ১৮৪
প্রতীত্যসমুৎপাদ—১৩, ২২, ২৬, ৩৬, ৫৫, ৫৭, ৯৯
প্রজ্ঞা—৪, ৮, ১৯, ২৫, ৪৮, ৮৩, ৯৭, ১০৭
প্রত্যাহার—৭১, ৭৩, ৮৫, ১৬৬
প্রাণায়াম—৬১, ১৬৬
বঙ্কিমচন্দ্র—২১০
বজ্রযান—৪, ১৪, ৩২, ১৪৭
বিহারী-লাল—২১৮
বিশুদ্ধচক্র—৪১, ১৩৫, ১৭০, ১৯৬
বাণক্রিয়া—১৩৮
বামাক্ষ্যাপা—১৯৩
বায়ুভেদ—১৬৯,
বিরুআপাদ—৬৮
বিবর্ত্ত বিলাস—১৪৯
বীণাপাদ—১১৪, ১১৫
বোধিচিত্ত—৫, ৭, ৮, ৫৩, ৬৩, ৭৮, ৮৩
বোধিসত্ত্ব—৭, ৮, ১৫
বুদ্ধমূর্ত্তিপূজা—৩৮
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১৪, ১৪৭
বৈভাসিক—১৮, ২০
ব্রহ্মা—১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৭৭
বিষ্ণু—১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৭৭
ব্রহ্মহুংকার—৮২
ব্যক্ত—১০
বৈসম্বরী চক্র—১৭০
ভাত্রপাদ—১১৬
মহীসাংখিক—১৫
মহলোক—২৯, ১৬৯
মহীধর—৯১, ৯৩,
মণিপুর—৪১, ১৩৫, ১৭০, ১৯৬
মাসকুত—১৫০
মাধ্যমিক—৯, ১৩, ১৮, ১৯, ২০, ২৬
মূলাধার—২, ৮, ৪১, ১৩৫, ১৭০, ১৮৯ ১৯৪, ১৯৬
মোহিতলাল—২৩০
মুণ্ডকোপনিষৎ—৩০
মোহতরু—৫৪, ৫৫, ৫৬
যজুঃ—১, ১৬৪
যম—৬১, ১৬৬
যুগনদ্ধ—৪২, ৯৭, ১৪০, ১৪৪
যোগাচার—১৮, ১৯
রবীন্দ্রনাথ—২১৪, ২২০, ২২৪
রজোবীজ—১৪৭
রসনা—৫৪, ৬৫, ১১৫
রামপ্রসাদ—১৯৯
রামঠাকুর—২০৩
রামমোহন—২০৩
রেচক—৫৪, ৬৫ ১১৫
লয়যোগ—১৯৪
ললনা—৫৪, ৫, ১১৫
ললিতবিস্তর—১৭
লাহুত—১৪৯
লুইপাদ - ৪৬, ৪৮
শবরপাদ—১২৪
শরৎচন্দ্র—২১১

শূন্য—২৪, ১৩২, ১৯৩, ১৯৭, ২১৮ ২২০
শান্তিপাদ—৯১, ৯৩
শিব—১৫৯, ১৮৫, ১৮৬
সর্বশূন্য—২৩, ২৪, ৩৫, ১৩২, ২১৮, ২২০
সর্বদর্শনসংগ্রহ—১৮
সদ্ধর্মলঙ্কাবতারসূত্রম্—১৭, ৩৮
সম্ভোগচক্র—৩, ১৫, ৮৯, ৯০, ১২৫, ১৪৩,
সত্য—২৯, ৩০
সপ্তমচক্র—১৯৩
সহস্রার—৩, ৩০, ৪০, ১৩৫, ১৮৯, ১৯৭
সমাধি—৪৬, ১০০, ১৬৬, ১০৫
সরহপাদ—৬৩
সাম—১
সাংখ্য—৪, ৬, ৯, ১১, ৪৪, ৫৯, ৬০
সুষুম্না—৪০, ১৩৬, ১৩৯, ১৮২, ১৯৫ ২০১
সৌন্দরানন্দ—৫৫
স্বঃ—১৯, ৩০, ৩৪
স্বাধিষ্ঠান—২৬, ৪৭, ৫৫, ১৩৫, ১৭০, ১৯৬
ষট্‌চক্র—৪১, ১৭৪, ১৯৩
হাউত—১৪৯
হাড়মালা—১৬৬
হুঙ্কার—১৬৩, ১৬৫।

—•—